স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী তেজেশ্বরানন্দ প্রণীত

॥ স্বামী বিবেকানন্দ ॥

স্বামী সোমেশ্বরানন্দ

প্রকাশক :
শ্রীবিজয়কুমার সিংহ
৫৪, কলেজ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর :
শ্রীভবানী প্রসাদ দে
প্রিণ্টার্স ডিও প্রেসিয়াস্
১৫, পঞ্চানন ঘোষ লেন,
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ-শিল্পী :
দি আইডিয়াল এড্‌ভার্টাইজিং এজেন্সী
৫৪, কলেজ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ :
স্বামীজির জন্মতিথি
৩রা মাঘ, ১৩৬৯
১৭ই জানুয়ারী, ১৯৬৩

মূল্য : তিন টাকা

উৎসর্গ

যাঁহার শুভ-প্রেরণায় বহুদিন পূর্বে জীবনগতি
পরিবর্তিত হইয়াছিল সেই একান্ত শুভানুধ্যায়ী
শ্রীযুক্ত অনন্তলাল বণিকের
করকমলে—
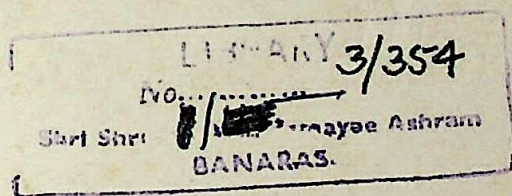
নিবেদন

স্বামীজি মহারাজের এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করিবার কঠিন দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। যথাসাধ্য যত্ন লওয়া সত্ত্বেও মুদ্রাকর-প্রমাদ-জনিত ভুল-ভ্রান্তি কিছু কিছু রহিয়া গিয়াছে। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য পাঠক-পাঠিকার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিতেছি।

আশাকরি গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তকের ন্যায় এই পুস্তকখানিও জনসমাজে আদৃত হইবে।

—প্রকাশক
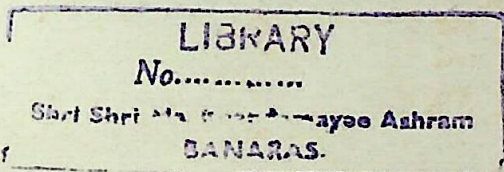
গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক

১। কথাপ্রসঙ্গে স্বামী অভেদানন্দ

২। দেবমানব শ্রীরামকৃষ্ণ

৩। বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ

সূচীপত্র
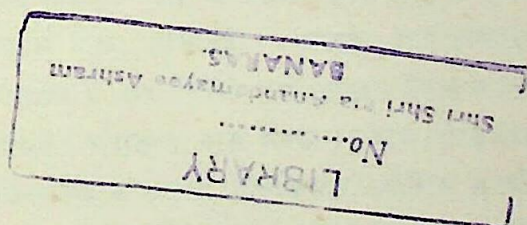
ভূমিকা

জীবন (প্রাণ-ক্রিয়া) থাকিলেই চরিতম্ (আচরণ) অবশ্যই থাকিবে। কিন্তু তাহা হইলেও সকল ব্যক্তির জীবন-চরিত আলোচনার আবশ্যকতা অনুভূত হয় না। কারণ অধিকাংশ মানুষের জীবন প্রাণের (Life) প্রাথমিক প্রয়োজন (Primary requirement) মিটাইবার জন্যই ব্যয়িত হয় এবং ইহা কিছু অস্বাভাবিকও নহে।

'তৎ' পরাগতি অর্থাৎ অচিন্তনীয় দ্রুত এজন, সুতরাং পরস্পর আপেক্ষিক দেশকাল এবং গতির অভিব্যক্তিশূন্য। 'তৎ'এর দ্বৈতয়িক মাত্রাও প্রায় 'তৎ'-রূপ, সুতরাং অব্যাকৃতা সংজ্ঞায় অভিহিতা। ইনি 'তৎ'এর অপর পঞ্চমাত্রার (তন্মাত্রার) সংখ্যা ও বিন্যাসের বিভিন্নতা করিয়া ব্যাকৃতা হন। এতৎ-ক্রমে মৌলিক কণিকাদি এবং মৌলিক ও যৌগিক পদার্থাদির উদ্ভব হয়। এতৎ-অবধি ব্যাকৃতি-শক্তি অপরা প্রকৃতি নামে অভিহিতা। ইনি অধিকতর ও উন্নততর ব্যাকৃতির পাদপীঠ। ইহা হইতেই বিশিষ্ট অধিষ্ঠান-বশতঃ প্রাণ-শক্তির আবির্ভাব হয় (অবশ্য এখনও পরীক্ষাগারে তৎ-দেশ-কাল বিশিষ্ট অধিষ্ঠান কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করিয়া প্রাণের উদ্ভব প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয় নাই)। এই প্রাণশক্তি অনন্ত-ব্যাকৃতি-সাধন-ক্ষম বলিয়া পরা-প্রকৃতি নামে অভিহিতা। যেহেতু প্রাণ অব্যাকৃতা প্রকৃতির (আদ্যাশক্তির) এক বিশিষ্ট রূপ, সুতরাং উহার ধ্বংস হইতে পারে না, রূপান্তর (অব্যক্ত বা ব্যক্ত অবস্থা) হইতে পারে মাত্র।

অভিব্যক্তিমুখে প্রাণই স্বশক্তিবলে মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ-সমূহের সাহায্যে অধিষ্ঠান ও প্রয়োজন-অনুসারে এককোষী হইতে বহুকোষী জীবদেহ (Forms of life) গঠন করে এবং প্রাণক্রিয়া নিষ্পন্ন করে।

প্রাণের আদ্য প্রবৃত্তি (Primary impulse) হইতেছে চিক্রমিষা (Urge for continuance)। ইহার জন্য প্রয়োজন

খাদ্যগ্রহণ ও আত্ম-সংরক্ষণ (Self-protection) এবং ইহা হইতেই উদ্‌ভূত হইয়াছে আনুষঙ্গিক নবীকরণ-প্রবৃত্তি (Urge for Self-renewal) যাহার ফলে প্রাণ পরপর্যায়ে (Next generation) সঞ্চারিত হয়।

প্রাণের দ্বৈতয়িক প্রবৃত্তি (Secondary impulse) হইতেছে বুভুক্ষা (Urge for enjoyment by appropriation or misappropriation) এবং তৎ-সহভাবী ও তৎ-সহযোগী বুভুৎসা (Urge for understanding objects and persons, and their relations)।

প্রাণের তার্তয়িক প্রবৃত্তি (Tertiary impulse) হইতেছে বিবিদিষা (Urge for knowing causes and finally the ultimate cause)।

সর্ব-জীবের পক্ষেই প্রাণের আদ্য প্রবৃত্তির চরিতার্থতা (Satisfaction) অপরিহার্য। কিন্তু দ্বৈতয়িক এবং তার্তয়িক প্রবৃত্তির চরিতার্থতা মাত্র মনুষ্য-ক্ষেত্রেই সম্ভব। এই প্রবৃত্তি-দ্বয়ের চরিতার্থতার জন্যই প্রাণ একাদশ ইন্দ্রিয় (Organ)-সমন্বিত দেহ গঠন করিয়াছে। মানব দেহের সমস্ত শক্তিই (বাকশক্তি, মননশক্তি প্রভৃতি) প্রাণ-শক্তিরই বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র।

মনুষ্যেতর প্রাণীসমূহে প্রধানতঃ প্রাণের আদ্য প্রবৃত্তি ক্রিয়াশীল। সুতরাং তাহাদের জীবন যান্ত্রিক এবং গতানুগতিক।

অধিকাংশ মনুষ্যের মধ্যে প্রাণের আদ্য এবং দ্বৈতয়িক প্রবৃত্তি ক্রিয়াশীল। আদ্য প্রবৃত্তি প্রবল হইলে জীবন নিম্নস্তরীয় প্রণীসমূহের ন্যায় যান্ত্রিক ও গতানুগতিক হয়। দ্বৈতয়িক প্রবৃত্তি প্রবল হইলে যান্ত্রিকতা এবং গতানুগতিকতা হ্রাস প্রাপ্ত হইতে থাকে। দ্বৈতয়িক প্রবৃত্তির ক্রিয়াক্ষেত্র (Field of action) বহুবিস্তৃত। ইহার আরম্ভ হইতেই স্বতন্ত্রতা (Individuality) ফুটিয়া উঠিতে থাকে, অহং বোধ দৃঢ় হইতে থাকে, চেষ্টা প্রভৃতি মানস-শক্তির বিকাশ

হইতে থাকে। এই প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া প্রথমাংশ-অভিমুখী (বুভুক্ষা-অভিমুখী) হইলে মানুষ আসুরিকভাব-সম্পন্ন হইয়া উগ্র-কর্ম-পরায়ণ এবং সম্পদ্‌কামী হইয়া উঠে, আর দ্বিতীয় অংশাভিমুখী (বুভুৎসা-অভিমুখী) হইলে মানুষ দৈবীভাব-সম্পন্ন, সৎকর্মপরায়ণ, চিন্তাশীল এবং কিয়ৎ-পরিমাণ ত্যাগধর্মী হইয়া উঠে। এই ক্ষেত্রেই বুদ্ধিবৃত্তির (Discriminating intelligence) উন্মেষ হয়, কার্য হইতে কারণের দিকে দৃষ্টি পড়ে এবং বুভুক্ষা-জাত শক্তি-সমূহের প্রতিশক্তিগুলি জাগিয়া উঠে। এক কথায় মনোময় কোষ পুষ্ট হইয়া উঠে। এই ক্ষেত্রের অন্তেস্থিত ব্যক্তিরাই ভাবুক, কবি, দার্শনিক, উদ্‌ভাবক, বিজ্ঞানী, শিক্ষক, মঙ্গলকর্মী প্রভৃতিরূপে মানবসমাজে নেতৃত্ব করেন এবং মানব-জ্ঞানের সীমাকে সম্প্রসারিত করেন।

তার্তায়ক প্রবৃত্তির ক্রিয়া ক্ষেত্রও বহুবিস্তৃত। ইহার আরম্ভ হইতেই মানুষের বিবিদিষা জাগিয়া উঠে এবং প্রতিশক্তিগুলি অধিকতর সবল হয়। ইহার ক্রিয়া প্রবল হইলে মন অব্যবহিত কারণ আবিষ্কারে সন্তুষ্ট থাকিতে চাহে না। প্রবল বেগে মন গভীর হইতে গভীরতর কারণের দিকে প্রধাবিত হয়। এই অবস্থার নামই বিবেক-উদয়। কিন্তু প্রথমাবস্থায় দ্বৈতয়িক ও তার্তয়িক প্রবৃত্তির মিশ্রক্রিয়া ঘটিতে থাকে বলিয়া মন উঠা-নামা করিতে থাকে। ইহাকেই সাধক-অবস্থা বা আরুরুক্ষ অবস্থা বলা হয়। অভ্যাসের ফলে দ্বৈতয়িক প্রবৃত্তি ক্ষীণ ও তার্তয়িক প্রবৃত্তি প্রবল হয়। এই অবস্থাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বা যোগারূঢ় অবস্থা বলা হয়।

উদিত-বিবেক ব্যক্তি নিত্য নূতন তত্ত্বের সম্মুখীন হন। ফলে দৃষ্টিভঙ্গির এবং আচরণের ক্রম-পরিবর্তন হইতে থাকে। সেই কারণে এইরূপ ব্যক্তির জীবন-গতি অনুসরণ করা কষ্টসাধ্য।

সময়ের ক্রম-অনুসারে আচরণ বিবৃত বা লিপিবদ্ধ করাই জীবন চরিত নহে। কারণ আচরণ, কায়িক বা বাচনিক যাহাই হউক না

কেন, উহা কার্য মাত্র। যে কারণ হইতে ঐ কার্যের উদ্‌ভব সেই কারণ নির্ণয় করিতে না পারিলে আচরণ অনুধাবন করা অসম্ভব।

আধ্যাত্মিক অগ্রগতি হইতে থাকে বলিয়া উদিত-বিবেক ব্যক্তির পূর্বাপর আচরণের মধ্যে অসঙ্গতি অবশ্যম্ভাবীভাবে দেখা দেয়। কারণ অনুসন্ধান না করিলে এই পূর্বাপর অসঙ্গতির সামঞ্জস্য বিধান করা যায় না। কথার যাদু এবং ভাবের আবেগ সৃষ্টি করিয়া এইরূপ অসঙ্গতির সামঞ্জস্য বিধান করিবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু উহা অলীক বলিয়া শ্রোতা বা পাঠকের কোন মঙ্গল সাধন করিতে পারে না।

স্বামী বিবেকানন্দ স্বার্থক-নামা, অর্থাৎ উদিত-বিবেক আধ্যাত্মিক অগ্রগতিসম্পন্ন মহাসাধক। সুতরাং তাঁহার পরবর্তী আচরণ পূর্ববর্তী আচরণ হইতে ভিন্ন হইবে ইহাই স্বাভাবিক। ইহাতে আধ্যাত্মিক ক্রম-বিকাশের প্রতিফলন সূচিত হয়। স্বামীজির এই ক্রম-বিকাশের ধারা অনুসরণ করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি।

স্বামী বিবেকানন্দকে দেখিবার সৌভাগ্য হয় নাই। তাঁহার আচরণাদি সময়-অনুক্রমে পূর্বসূরিগণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এইগুলি উপাদান হিসাবে লইতে হইয়াছে। সুতরাং অনিবার্যভাবে কিছু ভাবাবেগও উপস্থিত হইয়াছে। এই ত্রুটি মার্জনীয়।

ক্রমবিকাশ সর্বত্র একই পদ্ধতিতে নিষ্পন্ন হয়। সুতরাং পদ্ধতির স্বরূপ বুঝিতে পারিলে নিজের পক্ষেও উহার প্রয়োগ হইতে পারে। স্বামীজির জীবনগতি অনুসরণ করিতে গিয়া এই কথাই বার বার মনে হইয়াছে। আর মনে হইতেছে—"রাজেন্দ্র-সঙ্গমে দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে" তদ্রূপ সেই মহাজীবনের গতি-ধ্যানের সৌভাগ্যলাভে এই অকিঞ্চনও কৃতার্থ হইয়াছে।

১৭ই জানুয়ারী, ১৯৬৩

—লেখক।
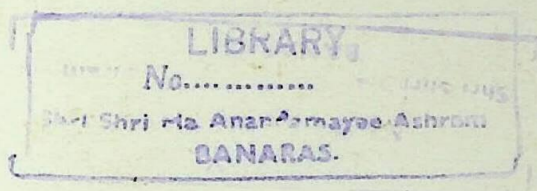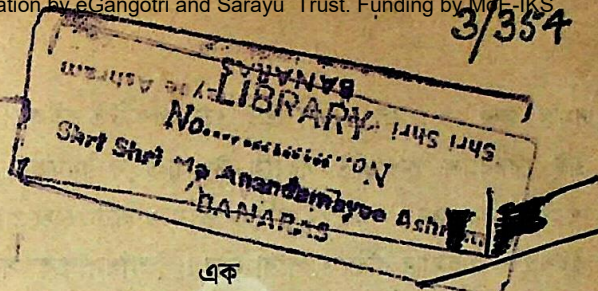
এক

॥ প্রয়োজনীয়তা ॥

মানবদরদী স্বামী বিবেকানন্দের সম্বন্ধে আলোচনার প্রারম্ভে সর্বপ্রথম ইহাই মনে হয় বিবেকানন্দ কে? কার সৃষ্টি? কোন সে দেবতা, যিনি এমনতর চরিত্র গঠন করিতে পারেন—যাঁহার পাদস্পর্শে এমন অভূতপূর্ব আত্মত্যাগীর সৃষ্টি! তাঁহাকে জানিবার বাসনা স্বাভাবিক ভাবেই মনে উদিত হয়। স্বামীজি মহারাজ বলিতেন, "বেদমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণ।" এই বেদই বা কি, যাহা শ্রীরামকৃষ্ণে মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল? বেদ সমগ্র বেদানুগ হিন্দুনামধারী মানবজাতির ধর্ম বা জ্ঞান সমষ্টি। এই জ্ঞানরাশিই মানুষের মধ্যে অজ্ঞেয় অবস্থায় নিত্যকাল বর্তমান রহিয়াছে। এইজন্যই বেদকে নিত্য ও অপৌরুষেয় বলা হয়। আমরা ঐ জ্ঞানরাশিকে ঈশ্বর, পরব্রহ্ম, পরমাত্মা বলিয়া অভ্রান্তভাবে সৃষ্টির সকল জ্ঞেয়-অজ্ঞেয় পদার্থের উর্দ্ধে অবস্থিত অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব বলিয়া বুঝিয়া লই। হিন্দু মাত্রেই এই বেদরাশিকে ঈশ্বরের শরীর বা প্রতিরূপ বলিয়াই গ্রহণ করেন এবং ঈশ্বর যেমন নিত্য, তাঁহার এই জ্ঞানরাশিও তদ্রূপ নিত্য বলিয়া জানেন। সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর হইতেই এই বেদের সৃষ্টি এবং ঋষিগণের ধ্যানগম্য হইয়া জগতে প্রচারিত। বেদের মন্ত্র হইতেই বুঝিতে পারা যায়, বেদ চতুষ্টয় পরমেশ্বর হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। "এই পরমপুরুষের বদনতুল্য অথর্ববেদ, লোমসম সামবেদ, হৃদয়-সদৃশ যজুর্বেদ এবং প্রাণতুল্য ঋক্‌বেদ্।" —এইরূপ মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে। আবার অন্যত্রও দেখিতে পাওয়া যায়, "সেই সর্বহুত যজ্ঞেশ্বর হইতে ঋক্ ও সাম উৎপন্ন হইয়াছে,

সমস্ত ছন্দ ও যজুঃ তাঁহা হইতেই প্রকটিত হইয়াছে।" ঋষিগণ এই বেদরাশি অনুভূতি সহায়ে উপলব্ধি করিয়াছেন, দিব্য শ্রবণে শ্রবণ করিয়াছেন। বেদের মহিমা ঋষি চরিত্রে ওতপ্রোতভাবে প্রকট হইয়াছে এইমাত্র বলিতে পারা যায়। আধ্যাত্মিক সকল অনুভূতির সমষ্টিই হইল বেদ—শ্রবণ করিয়াছেন বলিয়াই শ্রুতি। এই চতুর্বেদ দুই ভাগে বিভক্ত—কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। কর্মকাণ্ড জ্ঞানমার্গে পৌঁছাইবার সোপানাবলী বিশেষ। জ্ঞানকাণ্ড উপনিষদ বা বেদান্ত নামে খ্যাত। কর্মকাণ্ডের অনুশীলন দ্বারা আমরা পরব্রহ্মস্বরূপ ব্রহ্মকেই উপলব্ধি করিয়া "ব্রহ্ম-স্থিতি" অবস্থা প্রাপ্ত হই। এই উভয়তত্ত্ব যাঁহার জীবনে উপলব্ধি আকারে অনুভূত হইয়া সমন্বয় ঘটাইয়াছে তাঁহাকেই বলা যায় বেদমূর্তি। এই অনন্ত জ্ঞানরাশি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে উপলব্ধ হইয়া সারাবিশ্বে পরিব্যাপ্ত হওয়াতে তাঁহার আবির্ভাবের সার্থকতা।

বাংলা দেশের একটি নিভৃত পল্লী কামারপুকুর আজ প্রায় সমগ্র পৃথিবীর সভ্য সমাজে পরিচিতি লাভ করিয়াছে। কারণ অবশ্যই আছে,—তাহা শ্রীরামকৃষ্ণরূপে ভগবানের দেহ ধারণ। উক্ত গ্রামটি তাঁহারই দেব-শরীর ধারণে সার্থক। এই দেবমানব শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম, জীবন এবং সাধনা অপূর্বভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া ধর্মেতিহাসের এক অক্ষয় সম্পদরূপে মানবজাতির কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত হইয়াছে। সাধারণ পাঠশালার অধীতবিদ্য হইয়াও অসাধারণ পাণ্ডিত্য, অতুলনীয় ব্যুৎপত্তি এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টি লইয়া তিনি ধর্মের অতি গূঢ় তত্ত্ব সকল সর্বসাধারণের বোধযোগ্য করিয়া বিভিন্ন উদাহরণ সহায়ে বুঝাইয়া দিতেন। প্রাচীন এবং আধুনিক সকলপ্রকারের কৃতবিদ্য পণ্ডিত-মণ্ডলী তাঁহার অপূর্ব ধর্মব্যাখ্যা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। বেদান্তের অনন্ত ভাবরাশি তাঁহার দিব্য উপলব্ধি সহায়ে প্রতিটি আচরণের মধ্য দিয়া প্রকটিত হইত। সাকার-নিরাকার, দ্বৈত-অদ্বৈত সকল প্রকারের অনুভূতি লাভ

করিয়া মানবজাতির সঙ্কীর্ণ অজ্ঞতামিশ্র বুদ্ধির তীব্র প্রতিবাদ স্বরূপ, ব্রহ্মের জ্ঞেয়-অজ্ঞেয় বিরাট শক্তির লীলা সকল বস্তুর পশ্চাতে যে নিত্য বর্তমান তাহা প্রমাণিত করিলেন।

যে সাধনসহায়ে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ হইয়াছেন, তাহার কতটুকু মানুষের বোধগম্য? এবং কতটুকুই বা কল্পনা করিতে সমর্থ? আর কল্পনাটাই কি সবকিছু যে তাহার উদ্ভট বিচার বিশ্লেষণে যথার্থ তত্ত্ব বুঝিয়া লইব? তাঁহারই ভাষায় "ছটাক বুদ্ধি" লইয়া কি ঈশ্বরের অনন্তভাবের পরিমাপ করা সম্ভব? তবে কি আমরা এই সকল ভাগবত চরিত্র আলোচনা করিতে বিরত থাকিব? তাহা নহে, বরং তাঁহারই সুন্দর একটি উপমা সহায়ে আমরা আত্মস্থ হইব—"নুনের পুতুল" সমুদ্রের জলরাশির পরিমাপ করিতে অগ্রসর হইয়া তৎস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া নিজের পৃথক সত্বাই লোপ করিয়া একীভূত হইয়া গেল। আমরাও ঈশ্বরাবতারগণের পূতজীবন চরিত্র অনুধ্যান করিয়া "নুনের পুতুলের ন্যায়" অসীম সমুদ্ররূপ ঈশ্বরের অতল ভাবসমুদ্রে সমাহিত হইতে পারিলে অগৌরবের ক্ষোভ কিছুমাত্র নাই। সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে জানিতে বুঝিতে অগ্রসর হইয়া নিজে সত্যস্বরূপে পরিণত হইলে মানবজাতি পরমশ্রদ্ধায় ভক্তিপূত চিত্তে অবতার-চরিত্র অনুকরণে সফলকাম হইবে এবং ইহাই চরম ও পরম সার্থকতা। ভারতের শাশ্বত বেদরাশির মূর্ত প্রতীক শ্রীরামকৃষ্ণ বাংলাদেশের তথা ভারতবর্ষের অন্ধতামিস্র জড়বাদের তীব্র প্রতিবাদ-স্বরূপ। শত শত শতাব্দীর পুঞ্জীভূত দুঃখ বেদনার আবর্জনা যখন বিশ্ব-বাসীর জ্ঞান-সূর্যকে অবলুপ্ত-প্রায় করিয়া তুলিল, সেই সঙ্কট মুহূর্তে 'রাহুর' করাল গ্রাস হইতে জীব-জগতের মুক্তির নিমিত্ত সর্বজাতির মর্মবেদনা হৃদয়ে ধারণ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যদেহ ধারণ পূর্বক আবির্ভাব। কালপ্রভাবে মলিনতা প্রাপ্ত ধর্মে, রাষ্ট্রে, সমাজ জীবন যখন ন্যায়নীতি হইতে বিচ্যুত বিধ্বস্ত, তখনই অমিতগুণ সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব লইয়া মানবজাতির সর্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনায়

ঈশ্বরাবতারগণ পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত হইয়া জনগনকে যথার্থ পথে ও মতে পরিচালিত করেন ইহাই শাস্ত্রসম্মত। ধর্মে কুসংস্কার ও পরানুকরণ, রাষ্ট্রে দাসসুলভ হীনবৃত্তি, সমাজে গর্ববোধ ও উচ্ছৃঙ্খলতা, শিক্ষায় জড়বাদসর্বস্ব-বিদ্যা ইত্যাদি কারণে মানুষ যখন শ্রেয় ও প্রেয় হইতে বিচ্যুত, বিপথগামী, জাতীয় মূলভিত্তি যে ধর্ম—তাহা হইতে দূরে বহুদূরে অপসৃত হইয়া মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত হয়, তখনই সতত বিবদমান জাতিকে সংহত ও সংযত করিবার জন্য শ্রীভগবানের শুভ আবির্ভাব। সেই প্রয়োজনবশতঃ ইংরেজী ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী, বুধবার শ্রীগদাধর চট্টোপাধ্যায়রূপে শ্রীরামকৃষ্ণের ধরাধামে আবির্ভাব ঘটে। তিনি ঊনপঞ্চাশ বৎসর মানবশরীরে বর্তমান থাকিয়া জীবজগতের অশেষ কল্যাণে কলিকাতার নিকটবর্তী দক্ষিণেশ্বর নামক স্থানে কঠোর ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া লীলা সংবরণ করেন। তাঁহারই শ্রেষ্ঠ উত্তর-সাধক স্বামী বিবেকানন্দ।

শ্রীজওহরলাল নেহেরু স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে বলিতে গিয়া একটি সুন্দর মন্তব্য করিয়াছেন—"আপনারা স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা ও গ্রন্থাবলী পাঠ করিলে বিস্ময়কর এই দেখিতে পাইবেন যে, ঐ গুলি পুরাতন নয়। উহা ৫৬ বৎসরের পূর্বতন হইলেও আজও নূতন। কারণ তিনি যাহা লিখিয়াছেন বা বলিয়াছেন, তাহাতে আমাদের ও পৃথিবীর সমস্যা সমূহের অনেক মূলতত্ত্ব বিশ্লেষিত হইয়াছে। এই জন্যই ইহা পুরাতন হয় নাই। আপনারা এখন পাঠ করিলেও ইহাকে নূতন মনে করিবেন।" সত্যই স্বামীজি আমাদের সম্মুখে এমন এক নবীন বলিষ্ঠ জীবনাদর্শ তুলিয়া ধরিয়াছেন যাহা নিত্য নূতন ভাবে জাতীয় জীবনে প্রেরণা যোগাইবে এবং এইখানেই তাঁহার জীবনী ও বাণী আলোচনার অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা তথা সার্থকতা। পৃথিবীতে সত্যই এমন সব মানুষ কখনও কখনও আবির্ভূত হন, যাঁহার প্রভায় জগৎ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে এবং যিনি নিজে প্রকাশমান হইয়া অপরের

মধ্যেও আলোর শিখা প্রজ্জ্বলিত করিয়া তুলিতে সমর্থ হন। তিনি এমন একটি আদর্শ স্থাপন করেন যাহা সুদীর্ঘকাল মানুষকে মহৎ হইতে মহত্তর তত্ত্বের প্রেরণা যোগায়, যাহা ক্ষুদ্রতার গণ্ডী হইতে মুক্ত করিয়া মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে বৃহতের সেবায় এবং এইরূপে তাহাকে সান্ত হইতে অনন্তের দিকে লইয়া যায়। তাঁহাদের প্রতি পদক্ষেপ মানুষের কল্যাণের পথ প্রস্তুত করিয়া আপন মহিমায় অগ্রসর হয়। যে পথ তাঁহারা রচনা করেন, সে পথে অনন্তকাল মানুষ চলিবার প্রেরণা লাভ করিয়া ধন্য হয়। এ সকল দেব চরিত্র মানব মাত্রই স্মরণযোগ্য—তাঁহাদের বিস্মৃতিতে জাতীয় জীবন-সম্পদের অবলুপ্তি ঘটে। জীবন সাহিত্যের প্রভাবে মানবচরিত্র অনেকখানি বিকশিত হইয়া উঠাই সম্ভব। সমাজ-জীবনে তাঁহাদের প্রভাব অলোকসামান্য।

মানুষ সমাজ জীবন ব্যতীত বাঁচিতে পারেনা, তাই মানুষে মানুষে নিবিড়ভাবে সামাজিক জীবন সম্বন্ধায়িত হইয়া গড়িয়া উঠে। সেই জন্যই মানুষের জন্য মানুষের সর্বাধিক দরদ। রাজা হইতে দীন দরিদ্র প্রজাটি পর্যন্ত সকলের সহিত অন্তরের যোগ হওয়া চাই, তবেই মানুষ সভ্য মানুষের দাবী লইয়া বাঁচিয়া থাকিবে। মানব দরদী বিবেকানন্দের ভাবভাষাই রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠেও ধ্বনিত হইয়াছিল, "মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয়সম্বন্ধ স্থাপনই চিরকাল ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান চেষ্টা ছিল। দূর আত্মীয়ের সঙ্গেও সম্বন্ধ রাখিতে হইবে, সন্তানেরা বয়স্ক হইলেও সম্বন্ধ শিথিল হইবে না, গ্রামস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গেও বর্ণ ও অবস্থা নির্বিচারে যথাযোগ্য আত্মীয় সম্বন্ধ রক্ষা করিতে হইবে; গুরু-পুরোহিত, অতিথি-ভিক্ষুক, ভূস্বামী প্রজাভৃত্য সকলের সঙ্গেই যথোচিত সম্বন্ধ বাঁধা রহিয়াছে। এগুলি কেবলমাত্র শাস্ত্রবিহিত নৈতিক সম্বন্ধ নহে এগুলি হৃদয়ের সম্বন্ধ।" বাস্তবিক এই হৃদয়ের সম্বন্ধই ভারতীয় প্রতিটি নরনারীর সামাজিক জীবনের প্রধান যোগসূত্র। মানবতার দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া মানুষের সেবাই

নারায়ণের সেবা, বিরাটের পূজা। হিন্দুধর্মের অন্তর্নিবিষ্ট যে সত্য তাহা হইল সর্বভূতে আত্মদর্শন বা ব্রহ্মানুভূতি। বেদান্তানুগত সমস্ত শাস্ত্রই জীব মাত্রকেই ব্রহ্ম বা তদংশ বলিয়া গ্রহণ করে। যদিও ইহা সাধনার অতি উচ্চ অবস্থা না হইলে জ্ঞাত হওয়া যায় না, তবুও ইহাই চিরন্তন সত্য। এই কারণেই কি শাক্ত কি বৈষ্ণব সকলেই জীব সেবারূপ ব্রত অনুষ্ঠানে তৎপর হন। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং বহু ক্ষেত্রে ধর্মাচরণের মধ্য দিয়া এই নরনারায়ণের সেবা করিয়া ব্রহ্মবুদ্ধির মর্যাদা প্রদান করিয়াছেন। জীব মাত্রেই যদি ব্রহ্ম, তাহা হইলে অপরকে স্বীয় আত্মরূপে দর্শন করাই যুক্তিযুক্ত। এই অনুভূতির দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই স্বামীজি বলিলেন—"ব্রহ্ম হ'তে কীট পরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময়।" ঈশ্বর সর্বভূতে বিরাজিত রহিয়াছেন। জীবকে নারায়ণ জ্ঞান করিয়া সেবাপূজা দ্বারা নিজেরই ব্রহ্মবুদ্ধি উপলব্ধি হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অপরের কল্যাণের সহিত নিজের পরম কল্যাণ সাধিত হইয়া সাধক কৃতার্থ হন। ইহাই নিষ্কাম কর্মযোগ। ইহাই "নরনারায়ণ" সেবা বা পূজা। স্বামীজি যেমন বলিতেন, "ইহারাই তোমার ঈশ্বর।" শ্রীরামকৃষ্ণদেব হইতে তিনি যে নারায়ণবোধে জীবসেবারূপ অত্যুজ্জ্বল আদর্শ উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা সারাজীবন কর্মে ও আচরণের মধ্য দিয়া প্রচার-পূর্বক এক নূতন ভাবধারা স্থাপন করিয়াছেন। এ বিষয়ে শ্রদ্ধেয় স্বামী সুন্দরানন্দ মহারাজ একটি সুন্দর চিত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—"বর্তমানে বিশ্বময় এক মানুষ অপর মানুষকে, এক জাতি অপর জাতিকে নিতান্ত নির্মমভাবে ধ্বংসের কবলে নিক্ষেপ করিয়াও ভোগ স্বার্থ চরিতার্থ করিতেছে। এযুগে মানুষের হাতে মানুষের লাঞ্ছনা, মানবতার অবমাননা, মানুষের প্রতি মানুষের হীন দৃষ্টি এবং প্রভুত্বব্যঞ্জক ও অপমান অসম্মান সূচক ব্যবহার চরমে উঠিয়াছে! মানুষের

প্রতি জিঘাংসায় মানুষ বনের হিংস্র জন্তুকেও অতিক্রম করিয়াছে।" এই দুঃসময়ে মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্য সম্বন্ধে, মর্যাদা ও জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকলকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে আচার্য বিবেকানন্দের অবদান অভূতপূর্ব। সমগ্র জাতিকে তিনি আহ্বান করিয়া বলিলেন, "হে বীর সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে ডাকিয়া বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর। ভারতের সমাজ আমার শিশু শয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী, বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।" ভারতের প্রতিটি ধূলিকণা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিটি জীবজন্তুকে তিনি আন্তরিক ভালবাসিতেন। ভারতের সর্বপ্রকার দুর্বলতা দূরীকরণে তিনি সমগ্র শক্তি নিয়োগ করিয়া নিজকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু স্বামীজির সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে গিয়া বলিয়াছেন, "সাধারণ অর্থে রাজনীতিজ্ঞ বলিতে যাহা বুঝায় তিনি তাহা ছিলেন না বটে, তথাপি আমি মনে করি, তিনি ভারতের বর্তমান জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম মহান প্রবর্তক ছিলেন। পরবর্তীকালে যে বহুসংখ্যক ব্যক্তি এই আন্দোলনে কমবেশী সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন, তাঁহারা স্বামী বিবেকানন্দ হইতেই অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে আধুনিক ভারতকে অত্যন্ত প্রভাবান্বিত করিয়াছেন।" ধর্মে রাষ্ট্রে, শিক্ষায় দীক্ষায় আমরা যখন গ্লানি বহন করিয়া শ্রান্ত-ক্লান্ত তখনই যুগ-প্রয়োজন সাধনে অগ্রণী হইয়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাব।

ঋষি শ্রীঅরবিন্দও স্বামীজি সম্বন্ধে উক্তি করিতে গিয়া বলিয়াছেন, "ভারতের বিরাট প্রাণপুরুষ বলিয়া যদি কাহাকেও স্বীকার করা

যায়, তবে তিনি একমাত্র বিবেকানন্দ—নরকেশরী বিবেকানন্দ। আমরা দেখিতেছি তাঁহার প্রভাব ভারত-আত্মাকে আলোড়িত করিতেছে। আমরা বলিব বিবেকানন্দ এখনও বাঁচিয়া আছেন, তাঁহার দেশবাসীর আত্মায়, দেশবাসী সন্তানদের আত্মায়!"

স্বামী বিবেকানন্দের সম্বন্ধে বহু মণীষীর উদ্ধৃতি সংগ্রহ করা কঠিন নহে। আমরা বলিব অপরের মতামতের উপর তাঁহার জীবনের গৌরব গরিমা কিছুমাত্র নির্ভরশীল নহে। তিনি নিজের মহত্ত্বে, নিজের প্রতিভায় মানব হৃদয়ে স্থায়ী আসন অধিকার করিয়া লইয়াছেন। প্রকাশশীল সূর্যই সূর্যের প্রকাশ স্বরূপ। বিবেকানন্দের প্রতিভায় বিবেকানন্দ সদাদীপ্ত। আমরা কেবল ইহাই বলিতে পারি এমন বীরত্বের, আত্মশক্তির ও পৌরুষের সম্মিলনে জাতীয় কর্ণধার ভারতবর্ষ কেন পৃথিবী প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইল। আমরা আরও বলিব, "মহৎকে ভোলাই হইল সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য—ব্যক্তির ও জাতির পক্ষে।" আমাদের যেন তদ্রূপ দুর্ভাগ্য কখনও উপস্থিত না হয়।

পূর্ব পূর্ব অবতারগণের ভাবরাশি শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্য দিয়া বিবেকানন্দ রূপায়িত হইয়া জাতীয় জীবনে মহাশক্তির চেতনা সঞ্চারিত হইয়াছিল। একদা বরাহনগর মঠে কঠোর তপস্যায় এবং বিভিন্ন শাস্ত্রসমুদ্র মন্থনে যে অমৃত উঠিয়াছিল, তাহাই পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ সন্তানগণ মানব সমাজে বিতরণ করিয়াছিলেন। তাই বলিতেছিলাম, দক্ষিণেশ্বর পঞ্চবটীমূলে একদিন যে বিরজা-হোমের অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল এবং তাহা হইতে জীবসেবারূপ যে ভাব বিকশিত হইল, সেই আদর্শ প্রচারই বীর বিবেকানন্দের জীবনব্রত।

যে কোন আদর্শ ভাবধারাকে রূপায়িত করিতে হইলে সংযত চরিত্র বলের উপর তাহার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। কোন বৃক্ষশিশুকেও প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে যেমন উর্বর ভূমিখণ্ডের আবশ্যক

তেমনই আদর্শভাব উপযুক্ত হৃদয়েই ফুলে ফলে সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। শ্রীশ্রীঠাকুর স্বামীজি মহারাজের মধ্যে মহৎ কার্য সকলের বীজ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন বলিয়াই সকলের মধ্যে তাঁহার স্থান উচ্চে নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন। তাঁহার সুযোগ্য গুরু ভ্রাতা শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী (মহাপুরুষ মহারাজ) স্বামীজি প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "স্বামী বিবেকানন্দ যে এই শক্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম পুরুষ, ইহা ঠাকুরের মুখে শুনিয়াছি, নিজেরাও অনুভব করিয়াছি।" মানব জাতির প্রয়োজন সাধনের জন্যই বিবেকানন্দের সৃষ্টি। তাই তিনি নিজেই ব্যক্ত করিয়াছেন "যদি সেই মূর্তিপূজক ব্রাহ্মণের পদধূলি না পাইতাম, তবে আমি কোথায় থাকিতাম!"

* *

*

দুই

॥ স্বামীজির ছোটবেলা ॥

আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে আমাদের এই ভারতবর্ষে একজন পরিপূর্ণ মানব মনুষ্যত্বের দাবী লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন যাঁহার হৃদয়বত্তার গভীরতা আজিও নির্ণয় করা সম্ভব হয় নাই। তাঁহার বিশাল বোধিদ্রুমতলে আশ্রয়ের জন্য শান্তির জন্য আশায় দেশ-বিদেশের জনমানব ভারতকে মহাতীর্থ ভূমিতে পরিণত করিয়াছে—ইনি শ্রীবুদ্ধ। তাঁহার অমৃতবাণী হৃদয়ে বহন করিয়া আর এক মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, যিনি সত্যের দিব্যালোকে বলিতে পারিয়াছিলেন—"মহামানবের শরণ লও, ধর্মের শরণ লও, সঙ্ঘের শরণ লও।" তিনি যুগপ্রবর্তক স্বামী বিবেকানন্দ।

পৃথিবীতে এমন কতগুলি ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন যাঁহাদের চরিত্রের প্রতিটি আচরণ লোক কল্যাণে অনুষ্ঠিত হইয়া সমাজের তথা দেশের শ্রদ্ধাপূজা আকর্ষণ করিয়া লয় এবং তাঁহারা মানবহৃদয়ে চিরকালের জন্য মহাপুরুষ নামে নমস্য হইয়া অবস্থান করেন। বীরভক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষ নিজের ভাষায় লিখিয়াছেন, "যদি জানিতাম জগতে এমন লোকও জন্মান যিনি নিমেষমাত্রে সকল পাপকে পুণ্যে পরিণত করিতে পারেন, তাহা হইলে আরও কিছু পাপ করিয়া লইতাম।" সত্যই এইরূপ পতিতপাবন শ্রীভগবান মনুষ্যশরীর ধারণ করিয়াই শ্রীবুদ্ধ শ্রীশঙ্কর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যরূপে দেবমানবে চিরাচরিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন এবং তাঁহাদের দিব্যালোকের প্রভায় মানুষের চলার পথ আলোকিত হইয়া অনন্তকালের জন্য ঈশ্বর বেদীতে পূজা পাইয়া চলিয়াছেন।

মানুষ মন বুদ্ধি বা বিবেকবিচারের দ্বারা যতদূর অগ্রসর হইতে পারে তদ্দ্বারা এই সকল মহাপুরুষগণের চরিত্র জানিতে বুঝিতে চেষ্টার ত্রুটি করে নাই এবং সম্যক বুঝিতে না পারিলেও এই বুঝা না বুঝার মধ্য দিয়াই নিজের মনের উৎকর্ষতা লাভ করিয়া আত্মোন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। মহাপুরুষদিগের চরিত্র বর্ণনার ইহাই সার্থকতা। ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতি অতি দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বটিকে বুদ্ধির দ্বারা বিচার-বিশ্লেষণ করিতে মানুষের চেষ্টার অন্ত নাই। মানব জাতির ইতিহাস অনুধাবন করিলে সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়, যখনই সমাজের বিভিন্নস্তরে শৃঙ্খলার অভাব ঘটিয়াছে তখনই ঈশ্বরেচ্ছায় অভিনব শক্তিতে শক্তিমান হইয়া এক এক জন মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতেও যখন সারাবিশ্বে ধর্মে, রাষ্ট্রে, সমাজে ধ্বংসের বীজ বিস্তারলাভ করিয়াছিল তখনই শ্রীরামকৃষ্ণ—বিবেকানন্দের অভ্যুদয় এবং ঐ যুগসন্ধিক্ষণে বিভিন্নদেশে, সমাজের বিভিন্নস্তরে অমিত শক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষগণের আবির্ভাবও দেখা যায়। অপর কোন যুগেই এতগুলি মহাপুরুষের একত্র সমাবেশ হয় নাই। ইহা হইতেই অনুমিত হয় যে এবারকার মানবের বিলুপ্তপ্রায় শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য তেমনই প্রবল আন্দোলনের প্রয়োজন হইয়াছিল এবং এই সকল মহাপুরুষগণের প্রবল আন্দোলনের ফলেই আজ ভারতবর্ষ ধর্ম ও রাষ্ট্রে স্বাধীনতা পাইয়া নিজদিগকে বিশ্বের দরবারে উপস্থিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। এতসব মহাপুরুষ ভারত-প্রাণতন্ত্রীকে আন্দোলিত না করিলে হয়ত আমাদিগের শক্তির জাগরণ দীর্ঘকালের জন্য অবরুদ্ধই থাকিয়া যাইত। এই সকল মহাপুরুষগণের মধ্যেই আমাদিগের জাতীয় জীবনের সুপ্ত ও গুপ্ত শক্তিসমূহ প্রবলাকারে প্রকাশ পায়। মানব জাতির কল্যাণে এই সকল আদর্শ মহাপুরুষগণ সর্বকালেই মহাশক্তির জীবন্ত বিগ্রহরূপে আমাদিগকে জাতীয় প্রেরণা যোগাইতে থাকেন।

ভারতবর্ষ ত্যাগ ও সেবার জন্মভূমি। সেই ত্যাগ ও সেবার মূর্ত প্রতীক স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম হইয়াছিল ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী শ্রীনরেন্দ্রনাথ রূপে। সেদিন মহাপুণ্য দিন। তাঁহার ত্যাগ, তাঁহার তপস্যা তাঁহার সেবা এককালে সমস্ত জগতে মহাআন্দোলন সৃষ্টি করিয়া ছিল, আজিও আমরা তাঁহার বাণী মর্মে মর্মে অনুধাবন করিতে সমর্থ হই নাই।

স্বামীজি মহারাজকে প্রচার করিবার জন্যই স্বামীজির প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ করিতেছি ইহা নহে। তাঁহার মহিমা সুপ্রতিষ্ঠিত, উহা প্রচারের অপেক্ষা রাখে না। আমরা তাঁহার জীবন ও বাণী যতই অনুধাবন করিব ততই নূতন নূতন উদ্‌ভাবনী শক্তিতে নিজেরাই উদ্‌ভাসিত হইব। এই দিক দিয়াও তৎ প্রসঙ্গ আলোচনা সমাজের পক্ষে নিতান্তই আবশ্যক। বিশেষতঃ "বহুজন সুখায়, বহুজন হিতায়," এই মহাবাণী যে ত্যাগও তপস্যাপুত মহাতেজ-বীর্য সম্পন্ন পুরুষে মূর্তি-পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার স্বল্প পরিসর কর্ম জীবনে (১৮৯২—১৯০২ খৃঃ অঃ) সমগ্র পৃথিবীকে অপূর্ব প্রভায় উদ্‌ভাসিত করিয়াছিল—সেই জীবন-বেদ সম্যক বুঝিবার দিন আগত না হইলেও ধ্যাননিবিষ্ট চিত্তে ভাবিবার প্রয়োজন অবশ্যই আছে।

প্রত্যেক মহাপুরুষের জীবন বা জন্ম বৃত্তান্ত কিছু না কিছু বৈচিত্রের মধ্যে সংঘটিত দেখিতে পাওয়া যায়। আলোচ্য স্বামীজির আবির্ভাবের পূর্বে তাঁহার গর্ভধারিণী জননীকে বেশকিছু তপঃশ্চারণ করিতে হইয়াছিল। কথিত আছে "বিদূষী মহিলা দিগের গর্ভেই মহাপুরুষ জন্মায়।" জননী ভূবনেশ্বরী দেবী সন্তান কামনায় কাশীর বীরেশ্বর নামক শিবের নিকট প্রার্থনায় সফলকাম হন সম্ভবতঃ সেই জন্যই পুত্রের নাম বীরেশ্বর রাখিয়া ছিলেন। কালে এই বীরেশ্বরই নরেন্দ্রনাথ নামে পরিচিত হন। জন্ম হইতেই বিশেষ কতগুলি আত্মিক শক্তি বালক নরেন্দ্রনাথে

প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যাইত যাহা সচরাচর কোন ব্যক্তি বিশেষেও দেখিতে পাওয়া যায় না।

পরবর্তী জীবনে স্বামীজি নিজেই বলিয়া ছিলেন, যেমন "আজীবন নিদ্রা যাইব বলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেই ভ্রূমধ্য-ভাগে এক অপূর্ব জ্যোতির্বিন্দু দেখিতে পাইতাম এবং একমনে উহার নানারূপ পরিবর্তন লক্ষ্য করিতাম। উহা দেখিবার সুবিধা হইবে বলিয়া লোকে যেভাবে ভূমিতে মস্তক স্পর্শ করিয়া প্রণাম করে, আমি সেই ভাবে শয্যায় শয়ন করিতাম। ঐ অপূর্ব বিন্দু নানা বর্ণে পরিবর্তিত ও বর্ধিত হইয়া ক্রমে বিম্বাকারে পরিণত হইত এবং পরিশেষে ফাটিয়া যাইয়া আপাদ-মস্তক শুভ্র-তরল জ্যোতিতে আবৃত করিয়া ফেলিত। ঐরূপ হইবামাত্র চেতনা লুপ্ত হইয়া নিদ্রাভিভূত হইতাম। আমি জানিতাম, ঐরূপেই সকলে নিদ্রা যায়। বহুকাল পর্যন্ত ঐরূপ ধারণা ছিল। বড় হইয়া যখন ধ্যানাভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলাম তখন চক্ষু মুদ্রিত করিলেই ঐ জ্যোতির্বিন্দু প্রথমেই সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইত এবং উহাতেই চিত্ত একাগ্র করিতাম। ইত্যাদি।"—আবার বালক বয়সেই জাতিস্মরের ন্যায় স্থান বা ব্যক্তি-বিশেষকে দেখিলেই তাঁহার পূর্বস্মৃতি সকলের উদয় হইত। বাল্য জীবনে বালকদের মধ্যে আমরা যে সকল উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় পাই, বালক নরেন্দ্রনাথে কিন্তু তাহার বৈলক্ষণ্য পরিলক্ষিত হইত। অপরাপর বালকদের ন্যায় বালক সুলভ চাপল্য থকিলেও নরেন্দ্রনাথে বড় হইবার স্পৃহা—নেতা হইবার স্পৃহা, খেলাধুলার ও সংঘ পরিচালনার ক্ষমতা সর্বদা লক্ষিত হইত। শৈশবে অশ্ব চালিত শকট সহিসদের দেখিয়া তাঁহার মনে উদিত হইত যে, ইহারা কিরূপ কৌশলে এবং বীরত্বের সহিত ইচ্ছামত অশ্ব চালায় ও গন্তব্য স্থানে শকট উপস্থিত করে এবং বল্গা দ্বারা পশু শক্তিকে নিজ শক্তি দ্বারা আয়ত্ব করিয়া ইচ্ছানুরূপ পরিচালনায় গর্ব বোধ

করে! এই পশু শক্তিকে বশে রাখিয়া যদৃচ্ছাক্রমে কাজে লাগাইবার প্রবৃত্তি মানবজীবনের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। পরবর্তীকালে এই পশুশক্তি হইতে মানুষকে ত্রাণ করিয়া যথার্থ পথে পরিচালনার প্রবৃত্তি আবাল্যে মহান কর্মেরই সূচনা বলিতে পারা যায়। আবার যে বয়সে দাম্পত্য জীবনের কিছু মাত্র অভিজ্ঞতা কল্পনা করাও সম্ভব নহে সেই সময়েই নরেন্দ্রনাথের বিবাহ-বিতৃষ্ণা অদ্‌ভূত বলিয়াই মনে হয়। কথিত আছে তিনি বালক বয়সে শ্রীরামচন্দ্রের একটি মৃন্ময়ী মূর্তি সংগ্রহ করিয়া পূজাবেদীতে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন জানিতে পারিলেন যে তিনি বিবাহিত তখনই একান্ত প্রিয় মূর্তিটিকে চিরতরে বিসর্জন দিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিলেন না। এই বিবাহ-বিতৃষ্ণা বালক নরেন্দ্রনাথকে কতদূর প্রভাবান্বিত করিয়াছিল তাহা বুঝিতে আমাদের মোটেই কষ্ট হয় না। ভাবী আকুমার ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসীর যে বীজ তাঁহাতে সুপ্ত ছিল পরবর্তী জীবনে তাহা সম্যক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। শৈশবে নানা লোকাচার দেশাচার বিষয়েও তাঁহার উদার ও যুক্তিপূর্ণ প্রশ্নাবলীতে হতবাক্ হইতে হয়। জাতিভেদের প্রশ্নে পিতা যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি করিতেছ? তাহার উত্তরে নির্ভীক সরল নরেন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন—প্রতিটি হুঁকোতে ধূমপান করিয়া পরীক্ষা করিলাম জাতিত্বের বিচ্যুতি ঘটে কিনা। এমন নির্ভীক, এমন স্পষ্ট উক্তি অপর কোন বালকে আমরা দেখিতে পাই কি? আবার অদ্‌ভূত স্মৃতিধর এই বালক মাত্র পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রম কালেই কঠিন মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের সমগ্র সূত্রগুলি আয়ত্ব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং ষষ্ঠ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে রামায়ণের ঘটনা-বহুল অধ্যায়গুলি কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। কোন পাঠ বা কোন ঘটনা তাঁহাকে চেষ্টা করিয়া আয়ত্ব করিবার প্রয়োজন হইত না—একবার মাত্র শ্রবণে বা

পাঠেই তাহা কণ্ঠস্থ হইয়া যাইত। এই অদ্ভুত স্মৃতি-শক্তির বিকাশ আজীবন তাঁহার মধ্যে পরিলক্ষিত হইয়াছে।

যে বয়সে বালক বালসুলভ চাঞ্চল্য অবলম্বনে খেলিয়া বেড়ায়, সে বয়সে নরেন্দ্রনাথকে আমরা দেখিতে পাই প্রতিবেশী সমবয়সীদের সহিত ঈশ্বর ধ্যানে তন্ময় হইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত করিতে। ইহা যে তাঁহার পরবর্তী জীবনের ধ্যান-তন্ময়তার নিদর্শন তদ্‌বিষয়ে সন্দেহ নাই। শুনিতে পাওয়া যায় যে বালক নরেন্দ্রনাথ একদিন যখন সমবয়সী বন্ধুদের সহিত ধ্যান অভ্যাস করিতেছিলেন তখন একটি বিষধর সর্প তাঁহার সম্মুখে ফণা বিস্তার করিয়া অবস্থান করিতেছিল। তাঁহার বন্ধুগণ এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া কোলাহল করিলে গৃহের বয়স্কগণ উপস্থিত হইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়েন। কিন্তু বালক নরেন্দ্রনাথ এত গভীর তন্ময়তায় নিবিষ্ট ছিলেন যে, ইহার কিছুই জানিতে পারেন নাই। বলাবাহুল্য সকলের কোলাহলে অবশ্যই সর্পটি অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার এই ধ্যান-তন্ময়তা স্থির চিত্তেরই লক্ষণ এবং এই ধ্যান-নিষ্ঠতা তাঁহার জন্মগত সংস্কার বলিতে পারা যায়। নতুবা চারি-পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম বিশিষ্ট বালকে ঈশ্বর ধ্যানানুরাগ সত্যই বিচিত্র।

বালক নরেন্দ্রনাথের প্রতিটি প্রচেষ্টা, প্রতিটি কার্যানুষ্ঠান অত্যন্ত আন্তরিকতা ও দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি কাহারও কোন কথা সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করিলেও নিজের প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারা তাহা যাচাই করিতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করিতেন না। এই প্রবণতাই যে বালক নরেন্দ্রনাথকে নীতি, যুক্তি ও শাস্ত্র পরায়ণ করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। উত্তর-কালে যখন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সান্নিধ্যে উপস্থিত হন, তখনও প্রথম সাক্ষাৎ হইতেই তাঁহার প্রতিটি কথা যাচাই না করিয়া গ্রহণ তাঁহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিল। কোন ধর্মমত বা দার্শনিক তত্ত্বই নিজে প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতিরেকে

গ্রহণ করিতেন না। বাল্যকালে মায়ের মুখে শোনা রামায়ণ মহাভারতের বিবিধ উপাখ্যান তাঁহার মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল এবং চরিত্রকে আবাল্য মার্জিত ও উচ্চাদর্শে প্রভাবিত করিয়াছিল।

বিদ্যাভ্যাস কালেই নরেন্দ্রনাথকে দলপতি সাজিয়া সহপাঠীদের পরিচালনায় তৎপর দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ বয়সেই তাঁহার মধ্যে এমন একটা প্রতিভা-দীপ্ত নেতৃত্ব প্রকাশ পাইত যে, অপর যে কেহই তাঁহার আদেশ বিনা প্রতিবাদে মানিয়া লইতে বাধ্য হইত।

অতি অল্প বয়সেই নরেন্দ্রনাথের অসীম সাহসিকতাও বিভিন্ন আচরণের মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিত, মাত্র অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে প্রতিবেশীদিগের সহিত নৌকাযোগে কলিকাতার দক্ষিণাঞ্চলে পশুশালা দর্শনে গমন করিয়াছিলেন এবং ফিরিবার কালে তাঁহাদেরই সহযাত্রী একজন অসুস্থ হইয়া নৌকামধ্যে বমন করিয়া ফেলেন। এই কারণে নৌকার মাঝিদিগের সহিত কলহ আরম্ভ হইয়া যখন চরমে উঠিবার উপক্রম হইতেছিল, তখন বিপদ হইতে আত্মরক্ষার উপায় চিন্তা করিতে করিতে বালক নরেন্দ্রনাথ নৌকা হইতে কৌশলে অবতরণ করিয়া অনতিদূরে দুইটি ফিরিঙ্গী সাহেবকে দেখিতে পাইয়া তাহাদের নিকট ছুটিয়া গেলেন ও তাঁর স্বভাব সুলভ ভাষায় এই বিপদের কথা জানাইয়া ঘটনাস্থলে তাহাদের লইয়া আসিলেন। তাহারাও অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া দৃঢ় কণ্ঠে মাঝিদিগকে আদেশ করিয়াছিল যাহাতে সকল আরোহীকে ছাড়িয়া দেয়। বলাবাহুল্য মাঝিরাও ভীতচিত্তে আরোহীদের তীরে নামাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিল।

আর একবার একটি বৃটিশ রণতরী পরিদর্শন মানসে বালক নরেন্দ্রনাথ অনুমতি পত্র পাইবার জন্য আবেদন পত্র লিখিয়া অফিসের বড় সাহেবের নিকট উপস্থিত হন। কিন্তু তথায়

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত অপর কাহারও প্রবেশাধিকার অসম্ভব ছিল। বালক বিশেষ সাহস অবলম্বন করিয়া বড় সাহেবের শয়ন কক্ষের মধ্যদিয়া বিপরীত দিক হইতে সকলের অলক্ষ্যে সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হন এবং অনুমতি-পত্র প্রাপ্ত হইয়া সদর দরজা দিয়াই বীরত্বের সহিত নির্গত হইয়া আসিলেন।

পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া এবং বংশের ধারা মানুষের চরিত্রে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে সন্দেহ নাই। নরেন্দ্রনাথেও তাঁহার বংশের শিক্ষা এবং সদ্‌গুণ সকল মূর্তিপরিগ্রহ করিয়াছিল। পিতামহ সন্ন্যাস জীবন অবলম্বন করিয়া তীর্থবাসী হইয়াছিলেন! নিজ পিতা বিশ্বনাথ দত্ত মহাশয় ন্যায়-নিষ্ঠা ও বিদ্যানুরাগে বিশেষভাবে ভূষিত ছিলেন। তাঁহাদের উভয়ের উদার ও মহৎ গুণসকল বালক নরেন্দ্রনাথে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। পিতার একান্ত সাহচর্যগুণে ও তাঁহার সহিত অবাধ আলোচনা এবং নিঃসংকোচ মেলামেশার ফলে এবং তদীয় শিক্ষা-কৌশলে বালক নরেন্দ্রনাথের মধ্যে ভাবী বিবেকানন্দের সূচনা হইয়াছিল সন্দেহ নাই। উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার জ্ঞান-সম্পদ, তেজস্বিতা, চারিত্রিক গুণ সকলও বালক নরেন্দ্রনাথে প্রতিফলিত হইয়াছিল। তিনি তাহা হইতে পরবর্তী জীবনেও কিছুমাত্র চ্যুত হন নাই। আমরা সাধারণতঃ পারিবারিক জীবনে দেখিতে পাই যে, পিতা-মাতা ছেলে মেয়েদের অন্যায়ের জন্য শাসন করেন, শাস্তিও প্রদান করেন, কিন্তু যে উপায়ে তাহাদের চরিত্রে সদ্‌গুণাবলী বিকসিত করা যায় সেই কৌশলটুকু না জানার ফলেই শাসিত বালক বা বালিকার মনে অন্যায়বোধ কোনকালে জাগরিত হয় না যাহার ফলে তাহাদের চরিত্রে পুনরায় পূর্ববর্তী দোষসকল আবির্ভূত হয়। কেবলমাত্র ভীতিসঞ্চার বা শাসন অনুশাসনের দ্বারা সন্তানের চরিত্রে সদ্‌গুণসমূহের বিকাশ বা তাহার প্রতিভার উন্মেষ, কোনও বিষয়েই সুফল পাওয়া সম্ভব নহে; বরং উহা বিপরীত ফলই প্রসব করে। সন্তান যদি

পিতামাতার নিকট অকপট নিঃসংকোচ না হইয়া উঠে তবে কোন শিক্ষাই সন্তানে সংক্রামিত হওয়া দুরূহ। পিতামাতার শিক্ষার গুণে প্রতিভা প্রদীপ্ত হওয়ার ফলেই মাত্র ষোড়শ বর্ষ বয়সে রাজা রামমোহন রায় সমাজ ও ধর্ম সংস্কারের জন্য লেখনী ধারণ করেন, ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র সেনও মাত্র একুশ বৎসর বয়সে ইংরাজীতে উত্তম বক্তৃতা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং নরেন্দ্রনাথও ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম কালেই ইংরাজীতে সুললিত ভাষায় বক্তৃতা করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।

উচ্চ-বিদ্যালয়ের অধ্যয়ন যোগ্যতার সহিত শেষ করিয়া নরেন্দ্রনাথ কলেজে প্রবিষ্ট হইলেন। সেখানেও এই দৃঢ়-সংকল্পযুক্ত বালক সমভাবেই সহপাঠী ও কতৃপক্ষের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। তিনি এই বয়সেই বক্তৃতায়, সংগীতে, তর্কপ্রতিযোগিতায় এবং দলগঠন ও পরিচালনায় প্রভূত শক্তির পরিচয় দিয়া শিক্ষায়তনে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। অন্যায়ের সহিত আপোষ তাঁহার চরিত্র-বহির্ভূত ছিল। নিজে ভাল মন্দ যাচাই করিয়া তবে ভাব গ্রহণ করিতে প্রয়াস পাইতেন; আবার সহপাঠীদের মধ্যে কোন দুর্বলতা দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহা সংশোধনের চেষ্টা পাইতেন। তাঁহার তেজোদীপ্ত শরীর-মন এবং ব্যক্তিত্ব-পূর্ণ প্রতিভা তাঁহার প্রতিবেশী, সহপাঠী ও শিক্ষক সকলকেই সমভাবে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করিত। এই কলেজ-জীবনেই তিনি বিভিন্ন প্রকারে নিজের শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্র প্রসারিত করিতে ত্রুটি করেন নাই। কলেজে দৈনন্দিন পাঠ সমাপ্ত করিতে এই মেধাবী তীক্ষ্ণবুদ্ধি বালকের অতি অল্প সময় ব্যয়িত হইত। অবশিষ্ট সময় তিনি দেশবিদেশের মনিষীদের রচিত বিখ্যাত গ্রন্থাদি অতি মনোযোগের সহিত আয়ত্ত করিতেন এবং কলেজের চিন্তাশীল বন্ধুবর্গের সহিত বিভিন্ন ধর্মও দর্শনাদির সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আলোচনায় তৎপর থাকিতেন। এ বিষয়ে দার্শনিক ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মাধ্যমে কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়। বাস্তবিক এই সময় নরেন্দ্র-

নাথের জ্ঞানপিপাসা যেমন বর্ধিত হইয়াছিল তেমনই বিভিন্ন সংস্কারক শ্রেণীর নেতাগণ কর্তৃক প্রচারিত ধর্মমত ও সত্যানুভূতি নরেন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করিয়াছিল সন্দেহ নাই। তৎকালীন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র প্রমুখ ব্যক্তিগণের প্রবর্তিত ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত থাকিয়া অভিনিবিষ্ট চিত্তে তাঁহাদের বক্তৃতাদি শ্রবণ করিতেন এবং তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সত্যানুভূতি সম্বন্ধে প্রশ্নাদি করিয়া যথার্থ তত্ত্ব জানিবার চেষ্টা করিতেন। অনেকেই তাঁহার সহিত যুক্তি তর্কের অবতারণা করিয়া তাঁহাকে মূল-তত্ত্ব বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন কিন্তু কেহই তাঁহাকে তৃপ্ত করিতে পারেন নাই বলিতে পারা যায়। নরেন্দ্রনাথ যখন দেখিলেন যে, আচার্য বা ধর্মজাযকগণ তাঁহার সহজ সরল প্রশ্ন—"মহাশয় আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন ?" -জিজ্ঞাসিত হইলে কেহই নিশ্চয়াত্মক কোন উত্তর দিতে পারেন না, তখন তাঁহাদের উপদেশের কার্যকারিতা সম্বন্ধে তাঁহার মনে সংশয় উপস্থিত হইল। কিন্তু ইহাতে তাঁহার সত্যানুসন্ধিৎসা নিরস্ত না হইয়া তীব্রতর হইয়া উঠিল এবং অস্থির চিত্ত যখন যথার্থ তত্ত্ব লাভের জন্য একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল, তখন যেন ঈশ্বর-কৃপায়ই প্রতিবেশী এক আত্মীয়-গৃহে তাঁহার ঈপ্সিত আচার্যদেব গুরু শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন করেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের সেইদিন তাঁহার জীবনের এক মহৎ-দিন।

সংসারের স্বার্থ ও ভোগ-সর্বস্ব মতবাদ তাঁহাকে তৃপ্তি দিতে পারিল না। তিনি স্থির করিলেন সংসারের সকল প্রকার আপাতমধুর প্রলোভন তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হইবে এবং কার্যতঃ তাহাই করিয়া বসিলেন। আপন চরিত্র-বলে দৃঢ়পদে জীবনের লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে বিন্দুমাত্র চঞ্চলতা প্রকাশ পাইল না—শত বিপর্যয়ের মধ্যেও দৃঢ়-সংকল্প। সত্যলাভের জন্য তীব্র আকাঙ্খা ও অজানার প্রবল আকর্ষণ তাঁহাকে ঘর ছাড়ার

প্রেরণা দিয়াছিল। প্রতিকুল সাংসারিক অবস্থা ঐ প্রেরণাকে শক্তিশালী করিয়াছিল মাত্র। উহা তাঁহার সংসার ত্যাগের মুখ্য হেতু হইতে পারে না, কারণ দেখা যায় যে তাঁহার অপেক্ষা অধিকতর প্রতিকূল সাংসারিক অবস্থায় পতিত হইয়াও সাধারণতঃ কেহ সংসার ত্যাগ করে না, পরন্তু প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম কয়িয়া হয় জয়ী হয়, না হয় অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য স্থাপন করে। সংসারে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে গেলে যে সকল শারীরিক ও মানসিক শক্তি ও গুণের আবশ্যক হয় তাহা তাঁহার মধ্যে প্রয়োজন-অতিরিক্ত পরিমাণেই বিদ্যমান ছিল। ভয়শূন্যতা ও তেজস্বিতা ছিল তাঁহার চরিত্রের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সুতরাং প্রতিকূল সাংসারিক অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামের সূচনাতেই ভীতিগ্রস্ত হইয়া পলায়নপর হইয়াছিলেন এরূপ কল্পনা করা অসঙ্গত। পরবর্তী জীবনে ভগিনী নিবেদিতাকে প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছিলেন, "তুমি যাই ভাব না কেন আমারও এরকম একটা স্মৃতি আছে! যখন আমার বয়স দু'বৎসর, তখন আমি আমাদের সহিসের সঙ্গে ছাই মাখা কৌপিন পরা বৈরাগী সেজে খেলা কর্‌তাম। আর যদি কোন সাধু ভিক্ষা কর্‌তে আস্‌ত, তাহলে বাড়ীর লোকে আমাকে ওপরতলায় দোর বন্ধ করে রাখ্‌ত, পাছে আমি তাকে খুব বেশী দিয়ে ফেলি। আমি প্রাণে অনুভব কর্‌তাম যে, আমিও কখন সাধু ছিলাম, কোন অপরাধ বশতঃ শিবের কাছ থেকে বিতাড়িত হয়েছি।"

* *

*

তিন

॥ শ্রীরামকৃষ্ণ সান্নিধ্যে ॥

প্রভু যীশুখৃষ্টের বাণী যুগবতার শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনেও বিশেষভাবে মূর্ত হইয়াছিল। এমন কি তাঁহার অনেক উপদেশ খৃষ্টের উপদেশের সহিত একই সুরে বাঁধা। যীশু বলিয়াছিলেন, "তোমার যাহা কিছু আছে সব ত্যাগ করিয়া আমার অনুসরণ কর।" আর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "তোমরা আমার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ কর।" পরবর্তী জীবনে তাঁহার প্রিয় সন্তানদের মধ্যে আমরা এই ত্যাগ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন সর্বতোভাবে অহংশূন্য ছিলেন, তদ্রূপ তাঁহার শিষ্যদেরও সর্বদাই অহংশূন্য হইবার জন্য বলিতেন। যথার্থ অহং-শূন্য হইতে পারিলেই মানুষের মধ্যে সুপ্ত শুদ্ধ মানবচৈতন্য প্রকাশিত হইয়া তাহার ব্যক্তিগত জীবনকে দিব্য প্রভায় উদ্ভাসিত করিয়া তোলে।

ভারতবর্ষ অনন্তকাল হইতেই ধর্মের জন্মভূমি। এই ধর্মের ভূমিতে কি ধনী, কি দরিদ্র, কি রাজা-মহারাজা সকলেই আত্মত্যাগের পতাকা অম্লান-বদনে বহন করিয়া আসিয়াছেন। এখানে এমন সব মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহাদের সংস্পর্শে বিবেকানন্দ প্রভৃতির ন্যায় ত্যাগী সর্বকালে সৃষ্ট হইয়া পতিত জাতির আত্ম-চেতনার উদ্বোধন করিয়াছেন। যখনই যখনই ধর্মে রাষ্ট্রে বা সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে অধর্মের গ্লানি সহস্রমুখে জাতিকে মৃত্যু-কবলিত করিতে প্রয়াস পায়, তখনই দেবমানব কোন না কোন স্থানে সমস্ত জাতীয় সত্তাকে একত্রিত করিয়া মহাশক্তিধর পুরুষরূপে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই মহাশক্তিধর শ্রেষ্ঠ

জ্যোতিষ্ক স্বরূপ। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে স্বামীজি মহারাজ বলিয়াছিলেন, "পৃথিবীতে এইরূপ শক্তিমান পুরুষ কয়েক সহস্র বৎসর আবির্ভূত হন নাই।" তাঁহারই হাতেগড়া স্বনাম-ধন্য, বিশ্ববরেণ্য, মানবপ্রেমিক এই বিবেকানন্দ।

ঊনবিংশ শতাব্দী যেমন অধঃপতিত যুগ, তেমনই এই শতাব্দীই আবার বহু সংখ্যক প্রতিভাবান মনীষীর সৃষ্টি করিয়া জাতির শতাব্দীর পর শতাব্দী সঞ্চিত পুঞ্জীভূত দাসমনোবৃত্তি, ধর্মবিমুখতা, বিদূরিত করিয়া জাতিকে নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। এই যুগ-সন্ধিক্ষণে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রমুখ দেবমানব ভারতবর্ষ তথা বিশ্বজগৎকে পবিত্র করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রভাব সমস্ত জগৎ স্থিরচিত্তে অনুধাবন করিয়া ধন্য হইয়াছে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু সত্যই বলিয়াছেন "ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে অনেকগুলি বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন ব্যক্তি আবির্ভূত হন এবং সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে ভারতের অন্যান্য অংশ-গুলিকে প্ররোচনা দান করেন এবং এঁদেরই চেষ্টায় পরিশেষে নব জাতীয় আন্দোলন রূপ পরিগ্রহণ করে।" কলেজের অধ্যয়ন এফ, এ, পর্যন্ত সমাপ্ত করিয়াই নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে মাত্র কয়েক ঘণ্টার পরিচিত শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। মানুষের মনে অলব্ধ বস্তুলাভের জন্য যখন তীব্র বাসনা বা ব্যাকুলতা উপস্থিত হয় তখনই কোন না কোন সূত্রকে অবলম্বন করিয়া ঈপ্সিত বস্তুর সহিত যোগাযোগ ঘটিয়া যায়। নরেন্দ্রনাথেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত এই সাক্ষাৎকার তাঁহার মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল, যাহার ফলে দক্ষিণেশ্বরের এই আপন ভোলা পরমহংস মহাশয়ের স্মৃতি মন হইতে কিছুতেই মুছিতে পারিলেন না। তাঁহার কেবলই মনে হইত, এই ব্যক্তিতে যে সকল আচরণ পরিলক্ষিত হইতেছে তাহার মধ্যে কোন কপটতা বা ছলনা দেখিতে পাওয়া যায় না।

অথচ ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কথা, আচরণ ও উপলব্ধি মানব জীবনে এমন প্রবলভাবে প্রত্যক্ষীভূত হয়, ইহাও নরেন্দ্রনাথ সহসা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। কাজেই তিনি নিজের সূক্ষ্মবুদ্ধি ও শাস্ত্রজ্ঞান সহায়ে শ্রীরামকৃষ্ণের চরিত্র ও আচরণ সম্বন্ধে স্বীয় অন্তর্দ্বন্দ্বের একটা মীমাংসা খুঁজিতে সর্বদা চেষ্টিত থাকিতেন। পরমহংসের সহজ সরল ব্যবহার, অনন্য-সাধারণ ত্যাগ তপস্যা নরেন্দ্রনাথকে তাঁহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধান্বিত করিয়া তুলিয়াছিল। এসকল কারণেই সম্ভবতঃ দক্ষিণেশ্বরের এই অভূতপূর্ব মানুষটির কথা তিনি ভাবিতে বাধ্য হইতেন। বিভিন্ন ভাবধারায় বিক্ষিপ্ত-চিত্ত এই কলেজের যুবকটি যেমন পরমহংসের আচরণ নির্বিচারে মানিয়া লইতে পারিতেন না, তেমনই পরমহংসদেবও নরেন্দ্রনাথের আচরণ ও কার্যাবলী বিশেষ মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিতে ত্রুটি করিতেন না। প্রথম দর্শনেই তাঁহাকে বিশেষ উচ্চাধিকারী বুঝিতে পারিয়া তদ্রূপ আচরণ করিতে প্রয়াস পাইতেন যাহা নরেন্দ্রনাথকে প্রায়শঃ বিভ্রান্ত করিয়া তুলিত। তিনি বুঝিতে পারিতেন না ইহার মূলে কোন সত্য নিহিত আছে কিনা। অথচ ঐ সময়ে পরমহংসদেবের সান্নিধ্যে আসিয়া কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ, প্রতাপচন্দ্র প্রভৃতি চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ তাঁহার উপদেশ-সাহার্যে নিজ নিজ সন্দেহ ভঞ্জনে প্রবৃত্ত ছিলেন। তৎসত্ত্বেও তিনি নিজের অন্তর হইতে কোন সমাধান খুঁজিয়া না পাইয়া সন্দিগ্ধচিত্তেই শ্রীরামকৃষ্ণ সমীপে যাতায়াত করিতে থাকিলেন।

আজন্ম ধ্যান-নিষ্ঠ যুবক নরেন্দ্রনাথকে যে কোন বিষয় বস্তু নির্বাচনে ধীর-স্থির অচঞ্চল দেখিতে পাওয়া যাইত। ব্রাহ্মসমাজে গমনাগমনকালে তাঁহার ধ্যান-নিষ্ঠা এবং যথার্থ ঈশ্বরানুভূতি বা উপলব্ধির তীব্র আকাঙ্খা বর্দ্ধিত হইয়া থাকিলেও সমাজের আচার্যগণ তাঁহার ধর্ম-পিপাসা মিটাইতে সমর্থ হন নাই এবং পাশ্চাত্য দর্শনাদি সহায়ে ঈপ্সিত বস্তুর জন্য যুবক নরেন্দ্রনাথ

চেষ্টাদি করিতে থাকিলেও জীবন্ত আদর্শ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত না থাকায় তিনি ধর্মানুভূতির পথে অগ্রসর হইতে পারিতে ছিলেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে দর্শন করিবার পর হইতেই তাঁহার জীবনের পট পরিবর্তিত হইতে লাগিল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন নরেন্দ্রনাথকে প্রথম দর্শনেই বিশেষ উচ্চাধিকারী বলিয়া চিনিতে জানিতে পারিয়াছিলেন, তেমনই নরেন্দ্রনাথও এই অদ্‌ভূত আচরণকারী-পরমহংসটির চরিত্র, ত্যাগ, তপস্যায় আকৃষ্ট হইয়া ছিলেন যাহার ফলে তিনি দক্ষিণেশ্বরের প্রতি নিত্যই আকর্ষণ বোধ করিতেন। এই দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ সমীপে যাতায়াত করিবার প্রবল ইচ্ছা থাকিলেও কলেজের বি, এ, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি, ব্রাহ্মসমাজের সংগঠন-কাজে সহায়তা, নিয়মিত শরীর-চর্চা প্রভৃতিতে তাঁহাকে অধিক সময় নিযুক্ত থাকিতে হইত। শ্রীরামকৃষ্ণ যেদিন সংশয়-বিভ্রান্ত নরেন্দ্রনাথের প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও আত্ম-বিশ্বাস সাময়িকভাবে স্তব্ধ করিয়া তাঁহাকে দিব্যানুভূতির স্পর্শ পাওয়াইলেন সেই দিন হইতেই যে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে জানিবার বুঝিবার প্রবল বাসনা পোষণ করিতেন তাহা তাঁহার উক্তি হইতেই জানিতে পারা যায়।

পরবর্তী জীবনে স্বামীজি মহারাজ নিজে ঐ সকল অনুভূতি সম্বন্ধে তাঁহার গুরুভ্রাতাগণের নিকট এইরূপ বলিয়া ছিলেন,—দেখিলাম তিনি পূর্বের ন্যায় শয্যাপার্শ্বে অবস্থিত ছোট তক্তাপোষ খানির উপর একাকী আপন মনে বসিয়া আছেন, নিকটে কেহই নাই। আমাকে দেখিবামাত্র সাহ্লাদে নিকটে ডাকিয়া উহারই এক প্রান্তে বসাইলেন। বসিবার পরেই কিন্তু দেখিতে পাইলাম তিনি যেন কেমন এক প্রকার ভাবে আবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন এবং অস্পষ্টস্বরে আপনা-আপনি কি বলিতে বলিতে স্থির দৃষ্টিতে আমাকে লক্ষ্য করিয়া ধীরে ধীরে আমার দিকে সরিয়া আসিতেছেন। ভাবিলাম, পাগল বুঝি পূর্ব-দিনের ন্যায় আবার

কোনরূপ পাগলামি করিবে। ঐরূপ ভাবিতে না ভাবিতে তিনি সহসা নিকটে আসিয়া নিজ দক্ষিণপদ আমার অঙ্গে সংস্থাপন করিলেন এবং উহার স্পর্শে মুহূর্তমধ্যে আমার এক অপূর্ব উপলব্ধি উপস্থিত হইল। চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম, দেওয়াল গুলির সহিত গৃহের সমস্ত বস্তু বেগে ঘুরিতে ঘুরিতে কোথায় লীন হইয়া যাইতেছে এবং সমগ্র বিশ্বের সহিত আমার অস্তিত্ব যেন এক সর্বগ্রাসী মহাশূন্যে একাকার হইতে ছুটিয়া চলিয়াছে। তখন দারুণ আতঙ্কে অভিভূত হইয়া পড়িলাম, মনে হইল আমিত্বের নাশেই মরণ, সেই মরণ সম্মুখে অতি নিকটে! সামলাইতে না পারিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলাম "ওগো তুমি আমায় একি কর্‌লে, আমার যে বাপ-মা আছেন। অদ্‌ভূত পাগল আমার ঐ কথা শুনিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, "তবে এখন থাক্, একেবারে কাজ নাই, কালে হবে!" আশ্চর্যের বিষয় তিনি ঐরূপ করিয়া ঐকথা বলিবা-মাত্র আমার সেই অপূর্ব প্রত্যক্ষ এককালে অপনীত হইল; প্রকৃতিস্থ হইলাম এবং ঘরের ভিতরের ও বাহিরের পদার্থ সকলকে পূর্বের ন্যায় অবস্থিত দেখিতে পাইলাম।

অপর একদিনের কথা,—নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বর উপস্থিত হইয়াছেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের আনন্দের অবধি নাই; তাঁহাকে লইয়া তিনি বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে নিকটবর্তী যদুনাথ মল্লিক মহাশয়ের বাগান বাটিতে উপস্থিত হইলেন। সদানন্দ ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে কাছে পাইয়া না জানি কত রহস্যময় প্রসঙ্গই করিয়া থাকিবেন। কিছুক্ষণপর উভয়ে মল্লিক-ভবনের বৈঠকখানার গৃহখানিতে উপবেশন করিবার অল্প পরেই ঠাকুর ভাবস্থ হইতেছেন দেখিতে পাইয়া যাহাতে পূর্ব-দিনের ন্যায় কোন অবস্থান্তর না ঘটে সে বিষয়ে নরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত সজাগ রহিলেন। কিন্তু ফল ফলিল বিপরীত! সহসা ঠাকুর আসন ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে

স্পর্শ করিবামাত্র তিনি তাঁহার বাহ্যসংজ্ঞা এককালে হারাইয়া ফেলিলেন। কতক্ষণ এই অবস্থায় কাটিয়াছিল সে বিষয়ে যুবক নরেন্দ্রনাথের কিছুমাত্র বোধ ছিলনা, কেবল যখন তাঁহার সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল তখন দেখিয়াছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার বক্ষে হস্ত বুলাইতেছেন এবং মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট যখনই তিনি যাইয়া উপস্থিত হইতেন, তখন প্রায়শঃ দেখা যাইত তাঁহাকে দর্শনমাত্রে বা কখনও আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর গভীর সমাধি মগ্ন হইয়া পড়িতেন এবং কথঞ্চিৎ বাহ্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে নরেন্দ্রাদির সহিত তাঁহার দেবদুর্লভ অনুভূতি বা ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। একদিন অদ্বৈতবাদের জটিল তত্ত্বসকল নরেন্দ্রনাথকে বুঝাইয়া দিলেও এবং সর্ব বস্তুতে ঈশ্বরদর্শনই চরম অবস্থা এ বিষয়ে তাঁহাকে বিশেষ ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি ঠিক ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইলেন না। অন্তর্যামী শ্রীশ্রীঠাকুর তখন ভাবস্থ অবস্থায় সহসা নরেন্দ্রনাথের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াই সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। এই দিনের অনুভূতি সম্বন্ধে স্বামীজি মহারাজ বলিয়াছিলেন "ঠাকুরের এই দিনকার অদ্‌ভূত স্পর্শে মুহূর্তমধ্যে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। স্তম্ভিত হইয়া সত্য সত্যই দেখিতে লাগিলাম, "ঈশ্বর ভিন্ন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অন্য কিছুই আর নাই। ঐরূপ দেখিয়াও কিন্তু নীরব রহিলাম, ভাবিলাম দেখি, কতক্ষণ ঐ ভাব থাকে। কিন্তু সেই ঘোর সেদিন কিছুমাত্র কমিল না। বাটিতে ফিরিলাম, সেখানেও তাহাই; যাহাকিছু দেখিতে লাগিলাম, সে সকলই তিনি, সেইরূপই বোধ হইতে লাগিল। খাইতে বসিলাম, দেখি অন্ন, থালা, যিনি পরিবেশন করিতেছেন, সে সকলই এবং আমি নিজেও তিনি ভিন্ন অন্য কেহ নহে। দুই এক গ্রাস খাইয়া বসিয়া রহিলাম। "বসে আছিস কেনরে খা না"—মার এরূপ কথায় হুঁশ হওয়ায় আবার খাইতে আরম্ভ

করিলাম। এইরূপে খাইতে, শুইতে, কলেজে যাইতে, সকল সময়েই ঐরূপ দেখিতে লাগিলাম এবং সর্বদা কেমন একটা ঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া রহিলাম। রাস্তায় চলিয়াছি, গাড়ী আসিতেছে দেখিতেছি, কিন্তু অন্য সময়ের মত উহা ঘাড়ে আসিয়া পড়িবার ভয়ে সরিবার প্রবৃত্তি হইত না! মনে হইত উহাও যাহা আমিও তাহাই! হস্তপদ এই সময়ে সর্বদা অসাড় হইয়া থাকিত এবং আহার করিয়া কিছুমাত্র তৃপ্তি বোধ হইত না। মনে হইত যেন অপর কেহ খাইতেছে। খাইতে খাইতে শুইয়া পড়িতাম এবং কিছুক্ষণ পরে উঠিয়া আবার খাইতে থাকিতাম। এক এক দিন ঐরূপে অনেক অধিক খাইয়া ফেলিতাম। কিন্তু তাহার জন্য কোনরূপ অসুখও হইত না। মা ভয় পাইয়া বলিতেন, "তোর দেখ্‌ছি ভিতরে ভিতরে একটা বিষম অসুখ হয়েছে।" কখন কখন বলিতেন, "ও আর বাঁচবে না।" যখন পূর্বোক্ত আচ্ছন্ন অবস্থাটা একটু কমিয়া যাইত, তখন জগৎটাকে স্বপ্ন বলিয়া মনে হইত! হেদুয়া পুস্করিণীর ধারে বেড়াইতে যাইয়া উহার চতুঃপার্শ্বের লৌহ রেলে মাথা ঠুকিয়া দেখিতাম, যাহা দেখিতেছি তাহা স্বপ্নের রেল অথবা সত্যকার। হস্তপদের অসাড়তার জন্য মনে হইত পক্ষাঘাত হইবে না ত! ঐরূপ কিছুকাল পর্যন্ত ঐ বিষম ভাবের ঘোর ও আচ্ছন্নতার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই নাই। যখন প্রকৃতিস্থ হইলাম, তখন ভাবিলাম উহাই অদ্বৈত বিজ্ঞানের আভাস! তবে ত শাস্ত্রে যাহা লেখা আছে তাহা মিথ্যা নহে। তদবধি অদ্বৈত তত্ত্বের উপরে আর কখনও সন্দিহান হইতে পারি নাই।"

যুবক নরেন্দ্রনাথের আত্মগরিমা, প্রবল সন্দিগ্ধতা প্রভৃতি সকল প্রকার মনোবলই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সাহচার্যে তিরোহিত হইল। যাঁহাকে অর্দ্ধোন্মাদ বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন, আজ

তাঁহাকেই অভূতপূর্ব শক্তি-সম্পন্ন মহাপুরুষ বলিয়া নিশ্চিত ধারণা করিয়া লইলেও তাঁহাকে সম্পূর্ণ গুরুত্বে বরণ করিয়া তাঁহার সকল আচরণ ও উপদেশ নির্বিচারে মানিয়া লইবার মত মানসিক অবস্থা তখনও প্রাপ্ত হন নাই। বরং ইহাই স্থির করিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের আচরণ ও উপদেশ নিজে পরীক্ষা না করিয়া কোন মতেই তাহা মানিয়া লইবেন না। এই আজন্ম সন্ন্যাসীবৃত্তি-সম্পন্ন যুবককে তীব্র বৈরাগ্য বিশেষ ভাবে প্রবুদ্ধ করিয়াছিল এবং শ্রীরামকৃষ্ণের সাহচর্যেই তাহা দৃঢ়ভাবে রূপ পরিগ্রহ করে। ঐ সময়ে বন্ধুদের সহিত প্রসঙ্গক্রমে তিনি যে দীপ্ত বৈরাগ্যের এবং ত্যাগ-মণ্ডিত সন্ন্যাসীর মহিমা কীর্তন করিতেন, তাহাতেই বুঝিতে পারা যায়, "আমার মনে হয়, সন্ন্যাসই মানব জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শ হওয়া উচিত। নিয়ত পরিবর্তনশীল অনিত্য সংসারের পশ্চাতে সুখ-লালসায় ইতস্ততঃ ধাবমান হওয়ায় চেয়ে, সেই অপরিবর্তনীয় "সত্যং শিবং সুন্দরম্" কে পাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টাকরা শতগুণে শ্রেষ্ঠতর।"

বি, এ, পরীক্ষা নির্বিঘ্নে হইয়া গেল। নরেন্দ্রনাথ আইন পড়িবার জন্য সংকল্প গ্রহণ করিলেন। এমন সময়ে তাঁহাকে জীবনের এক নূতন অধ্যায়ের সম্মুখীন হইতে হইল। তাঁহার পিতা সহসা মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন এবং সংসারের দায়িত্ব হঠাৎ তাঁহার উপর আসিয়া পড়িল। পিতা উদার মহৎ দানে, সংসারে সৎব্যয়ে নিয়ত মুক্তহস্ত থাকায় কিছুমাত্র অর্থ সঞ্চিত করিয়া যাইতে পারেন নাই। শুনিয়াছি পিতার নিকট একদা বালক নরেন্দ্রনাথ নিজের অথবা অপরের প্রেরণাতেই হউক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "বাবা, আপনি আমাদের জন্য কি রাখিয়া যাইতেছেন?" এই প্রশ্ন শুনিবামাত্রই পিতা বিশ্বনাথ দত্ত বালককে গৃহের বৃহৎ দর্পণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "যা আর্শিতে নিজের চেহারাটা দেখে আয়, তা'হলে বুঝবি তোকে আমি কি দিয়াছি।"

কাজেই বুঝিতে পারা যায়, অর্থ সঞ্চয়ের প্রতি তাঁহার মোটেই স্পৃহা ছিল না।

সংসারে জন্ম গ্রহণ করিলে সকলকেই কিছু না কিছু অশান্তি ভোগ করিতেই হয়। নরেন্দ্রনাথেও ইহার ব্যতিক্রম লক্ষিত হইল না। তিনি নিঃসম্বল অবস্থায় গৃহের ভাই-বোন ও পরিজন সকলকে লইয়া বিশেষ দৈন্যদশা ভোগ করিতে লাগিলেন। বিপদে নিতান্ত স্বজনও দূরে সরিয়া গেল। সুযোগ বুঝিয়া জনৈক জ্ঞাতি তাঁহাদের গৃহ হইতে উচ্ছেদের জন্য চেষ্টিত হইয়া এক মোকর্দমা জুড়িয়া দিলেন। তবুও পরিজন বর্গের ভরণ পোষণ ও বসতবাটীর অধিকার রক্ষা বিষয়ে যত্নপর হইতে তিনি ত্রুটি করিলেন না। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রের এইসকল বিপত্তির সংবাদ পাইয়া বিশেষ চিন্তিত-মনে কালাতিপাত করিতে থাকিলেও শ্রীশ্রীজগদম্বার ইচ্ছা জানিয়াই অনেকটা আশ্বস্ত হইয়াছিলেন।

গৃহের নানা বিভ্রাটের জন্য নরেন্দ্রনাথের দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইতে বিলম্ব ঘটিল; তিনি মনে করিয়াছিলেন, শীঘ্রই একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থাদি হইয়া যাইবে। কিন্তু হইল না। চাকুরী, শিক্ষকতা প্রভৃতির জন্য কাহারও নিকট হইতে কোন সহায়তা মিলিল না। বরং বান্ধবদিগের নিকট হইতে অবজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া সংসারের প্রতি তাঁহার দারুণ ঘৃণা জন্মিল।

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক নরেন্দ্রনাথ অর্থোপার্জন বা স্বজন প্রতিপালনে অকৃতকার্য হইয়া পড়িলেন। কোনদিন আহার জোটে তো কোন দিন অর্দ্ধাহারে কাটাইতে হয়। চতুর্দ্দিকে যখন অভাব অভিযোগ জট পাকাইয়া দৃঢ়-হৃদয় যুবককে বিভ্রান্ত করিতেছিল, তখনই আবার তাঁহারই অজ্ঞাতসারে কঠোর ত্যাগ বৈরাগ্য তাঁহার হৃদয়কে তীব্রভাবে আকর্ষণ করিতেছিল। তিনি স্থির করিলেন দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসের সহিত শেষ-বারের মত সাক্ষাৎ করিয়া চিরতরে গৃহত্যাগী হইবেন। এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণও

তাঁহার একান্ত প্রিয় নরেন্দ্রের জন্য ব্যাকুল হৃদয়ে অশ্রুবিসর্জন করিতেছেন। দক্ষিণেশ্বরের প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিলেও অভিমানদীপ্ত নরেন্দ্রনাথ কিছুদিন পরমহংসের নিকট যাতায়াত একপ্রকার জোর করিয়াই বন্ধ রাখিয়াছিলেন। তাঁহার এই বিপদকালে তাঁহার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতার মধ্য দিয়া যে তীব্র ভালবাসা প্রকাশ পাইত, মানব সেই ভালবাসার রহস্য নির্ণয় করিতে সত্যই অপারগ। তৎকালে তাঁহারই অনুরক্ত ভক্তদিগের নিকট তিনি কখনও কখনও ভাবাবেগে ঐ সকল কিছু কিছু প্রকাশ করিয়া ফেলিতেন। "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা-প্রসঙ্গ" লেখক শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজ ঐ কালের ঘটনা যে ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার একটি মাত্র এইখানে উদ্ধৃত করিলেই বিষয়টী বুঝিতে পারা যাইবে। "সেদিন ঠাকুরের মন যেন নরেন্দ্রময় হইয়া রহিয়াছে! মুখে নরেন্দ্রের গুণানুবাদ ভিন্ন অন্য কথা নাই। আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ নরেন্দ্র শুদ্ধ সত্বগুণী! আমি দেখিয়াছি সে অখণ্ডের ঘরের চারি-জনের একজন এবং সপ্তর্ষির একজন, তাহার কত গুণ তাহার ইয়ত্তা হয় না।" বলিতে বলিতে ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে দেখিবার জন্য এককালে অস্থির হইয়া উঠিলেন এবং পুত্র-বিরহে মাতা যেমন কাতরা হন সেইরূপ অজস্র অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। পরে কিছুতেই আপনাকে সংযত করিতে পারিতেছেন না দেখিয়া এবং আমরা তাঁহার ঐরূপ ব্যবহারে কি ভাবিব মনে করিয়া ঘরের উত্তর দিকের বারান্দায় দ্রুতপদে চলিয়া যাইলেন এবং "মাগো, আমি তাকে না দেখে আর থাকতে পারি না" ইত্যাদি রুদ্ধস্বরে বলিতে বলিতে বিষম ক্রন্দন করিতেছেন শুনিতে পাইলাম। কিছুক্ষণ পরে আপনাকে কিছুটা সংযত করিয়া তিনি গৃহমধ্যে আমাদিগের নিকটে আসিয়া উপবেশন করিয়া কাতর করুণস্বরে বলিতে লাগিলেন, "এত কাঁদ্‌লাম কিন্তু নরেন্দ্র ত এল না! তাকে

একবার দেখবার জন্য প্রাণে বিষম যন্ত্রণা হচ্ছে, বুকের ভিতরটায় যেন মোচড় দিচ্ছে; কিন্তু আমার এই টানটা সে কিছু বুঝে না।" এইরূপ বলিতে বলিতে আবার অস্থির হইয়া তিনি গৃহের বাহিরে চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে আবার গৃহে ফিরিয়া আসিয়া বলিতে লাগিলেন, "বুড়ো মিন্‌সে, তার জন্য এইরূপ অস্থির হয়েছি ও কাঁদ্‌ছি দেখে লোকেই বা কি বলবে, বল দেখি? তোমরা আপনার লোক, তোমাদের কাছে লজ্জা হয় না, কিন্তু অপরে দেখে ভাববে কি, বল দেখি? কিন্তু কিছুতেই সামলাতে পাচ্ছি না।"

ভাবিয়া অবাক হইতে হয় যে, শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য প্রেমের ও স্বার্থগন্ধশূন্য ভালবাসার সম্পূর্ণ অধিকারী হইয়াও নরেন্দ্রনাথ কিভাবে নিজের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিটি আচরণ নিখুঁত ভাবে যাচাই করিয়া সত্য আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় তিনি কি অপূর্ব শক্তি, ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভায় দীপ্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সাধারণতঃ দেখা যায় যে কোন শক্তিমান মহাপুরুষের নিকট উপস্থিত হইলে প্রবল ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন পুরুষও ঐ মহাপুরুষের আদেশ বা উপদেশ নির্বিচারে গ্রহণ করিয়া তদ্‌গত-চিত্ত হইয়া পড়েন। কোন নিম্নাধিকারী ব্যক্তি উচ্চাধিকারী সত্যদ্রষ্টা ঈশ্বর-সাক্ষাৎ-প্রসূত জ্ঞান-প্রভায় উদ্দীপ্ত ব্যক্তির নিকট ভাগ্যবশে উপস্থিত হইলে তাহার ব্যক্তিগত সত্তা লোপ হইবে, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুমাত্র কারণ নাই বরং ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ ইহার ব্যতিক্রম; শ্রীরামকৃষ্ণই বলিয়াছিলেন, 'নরেন্দ্র আর আমি, টাকার এপিঠ আর ওপিঠ।' আবার নিজের শরীর ও নরেন্দ্রের শরীর দেখাইয়া বলিয়াছিলেন—"দেখছি কি এটা আমি আবার ওটাও আমি, সত্য বল্‌ছি কিছুই তফাৎ বুঝতে পারছি না! যেমন গঙ্গা জলে একটা লাঠি ফেলায় দুইটা ভাগ দেখাচ্ছে সত্য সত্যই কিন্তু ভাগাভাগি নেই, একটাই

রয়েছে !” এই ভাবের অনেক প্রসঙ্গ আমরা পর পর জানিতে পারিব। ঠাকুর ভাবাবেশে জগদম্বার ইচ্ছায় আরও জানিয়া ছিলেন এই নরেন্দ্রনাথ কে ? প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার শিষ্যদিগের নিকট বলিয়াছিলেন—“একদিন দেখিতেছি মন সমাধি-পথে জ্যোতির্ময় বর্ত্মে উচ্চে উঠিয়া যাইতেছে। চন্দ্র-সূর্য-তারকামণ্ডিত স্থূল-জগৎ সহজে অতিক্রম করিয়া উহা প্রথমে সূক্ষ্ম ভাবজগতে প্রবিষ্ট হইল। ঐ রাজ্যের উচ্চ উচ্চতর স্তর সমূহে উহা যতই আরোহণ করিতে লাগিল, ততই নানা দেবদেবীর ভাবঘন বিচিত্র মূর্তিসমূহ পথের দুই পার্শ্বে অবস্থিত দেখিতে পাইলাম। ক্রমে মন উক্ত রাজ্যের চরম সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে দেখিলাম, এক জ্যোতির্ময় ব্যবধান (বেড়া) প্রসারিত থাকিয়া খণ্ড ও অখণ্ডের রাজ্যকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। উক্ত ব্যবধান উল্লঙ্ঘন করিয়া মন ক্রমে অখণ্ডের রাজ্যে প্রবেশ করিল, দেখিলাম,—সেখানে মূর্তিবিশিষ্ট কেহ বা কিছুই আর নাই, দিব্যদেহধারী দেবদেবী সকল পর্যন্ত যেন এখানে প্রবেশ করিতে শঙ্কিত হইয়া বহুদূরে নিম্নে নিজ নিজ অধিকার বিস্তৃত করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু পরক্ষণেই দেখিতে পাইলাম, দিব্যজ্যোতিঃঘনতনু সাতজন প্রবীণ ঋষি সেখানে সমাধিস্থ হইয়া বসিয়া আছেন। বুঝিলাম, জ্ঞান ও পুণ্যে, ত্যাগ ও প্রেমে ইহারা মানব তো দূরের কথা দেবদেবীকেও পর্যন্ত অতিক্রম করিয়াছেন। বিস্মিত হইয়া ইহাদিগের মহত্ত্বের বিষয় চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে দেখি, সম্মুখে অবস্থিত অখণ্ডের ঘরের ভেদমাত্র-বিরহিত, সমরস, জ্যোতির্মণ্ডলের একাংশ ঘনীভূত হইয়া দিব্য শিশুর আকারে পরিণত হইল। ঐ দেবশিশু ইহাদিগের অন্যতমের নিকটে অবতরণ পূর্বক নিজ অপূর্ব সুললিত বাহু যুগলের দ্বারা তাঁহার কণ্ঠদেশ প্রেমে ধারণ করিল ; পরে বীণানিন্দিত নিজ অমৃতময়ী বাণীদ্বারা সাদরে আহ্বান

পূর্বক সমাধি হইতে তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করিতে অশেষ প্রযত্ন করিতে লাগিল। সুকোমল প্রেমস্পর্শে ঋষি সমাধি হইতে বুত্থিত হইলেন এবং অর্ধস্তিমিত নির্নিমেষ লোচনে সেই অপূর্ব বালককে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখের প্রসন্নোজ্জ্বল ভাব দেখিয়া মনে হইল, বালক যেন তাঁহার বহুকালের পূর্ব-পরিচিত হৃদয়ের ধন। অদ্ভুত দেব-শিশু তখন অসীম আনন্দ প্রকাশপূর্বক তাঁহাকে বলিতে লাগিল, 'আমি যাইতেছি, তোমাকে আমার সহিত যাইতে হইবে।' ঋষি তাঁহার ঐরূপ অনুরোধে কোন কথা না বলিলেও তাঁহার প্রেমপূর্ণ নয়ন তাঁহার অন্তরের সম্মতি ব্যক্ত করিল। পরে ঐরূপ সপ্রেম-দৃষ্টিতে বালককে কিছুক্ষণ দেখিতে দেখিতে তিনি পুনরায় সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। তখন বিস্মিত হইয়া দেখি, তাঁহারই শরীর-মনের একাংশ উজ্জ্বল জ্যোতির আকারে পরিণত হইয়া বিলোমমার্গে ধরাধামে অবতরণ করিতেছে! নরেন্দ্রকে দেখিবামাত্র বুঝিয়াছিলাম, এ সেই ব্যক্তি।" নরেন্দ্রনাথকে শ্রীশ্রীঠাকুর উপরোক্ত ভাবে জানিয়াই তাঁহার প্রতি অসীম স্নেহে আসক্ত হইয়াছিলেন। তিনি ইহাও বুঝিয়াছিলেন—নরেন্দ্র যদি তাঁহার প্রতিভাশক্তি সম্যকরূপে আধ্যাত্মিকভাবে পরিচালিত না করিতে প্রয়াস পায় তবে ফল বিপরীত ফলিবে এবং শ্রীরামকৃষ্ণ প্রবর্তিত ধর্ম-চক্রের প্রবর্তন অসম্ভব হইয়া পড়িবে। এইজন্যই নরেন্দ্রনাথে তাঁহার এত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, এত তীব্র আকর্ষণ। যখনই স্থির জানিতে পারিলেন যে, কালপ্রভাবে তাঁহার আর বিপথগামী হইবার সম্ভাবনা নাই তখনই তিনি কতকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছিলেন।

যে পাঁচটি বৎসর নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের পূতসঙ্গ করিয়া নিজের জীবনকে তাঁহার উদার মহৎ জনকল্যাণের ত্যাগ-মণ্ডিত আদর্শে গঠিত করিয়াছিলেন, আপাতদৃষ্টিতে অল্পকাল মনে হইলেও উচ্চাধিকারী ব্যক্তির জন্য এই কয় বৎসরই পর্যাপ্ত কাল সন্দেহ নাই।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম সাক্ষাৎ হইতেই তাঁহাকে নিজের আরব্ধ যুগধর্ম-সংস্থাপন কার্যের প্রধান হোতাবিশেষ জানিয়া নিয়তই নিজ উপলব্ধি সহায়ে যথার্থ জীবকল্যাণ ব্রতে ব্রতী করিয়া তুলিতে প্রয়াস পাইতেন এবং তাঁহাকেই প্রধান যন্ত্ররূপে গঠন করিতেও নিয়ত যত্নপর থাকিতেন।

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত গর্বিত এবং পশ্চিমাকাশের রজোগুণ-দীপ্ত প্রভায় আমরা যখন উদ্‌ভ্রান্ত ও দিশাহারা, তখনই এই ভারত-মহাশ্মশানকে মথিত করিয়া সদা-শিবস্বরূপ নরেন্দ্রনাথের আবির্ভাব হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিটি আচরণ, প্রতিটি কর্ম, তিনি অবিশ্বাসীর দৃষ্টি লইয়া যাচাই পূর্বক মানব-জাতিকে ঐ দেব-মানব চরিত্র জানিবার বুঝিবার বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। যে তীক্ষ্ণ বিচার-বুদ্ধি সহায়ে দেব-চরিত্র অনুধাবন করিতে হয়, তাহা একান্ত দুর্লভ। রামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে নিয়ত থাকিয়াও অনেকেই তাঁহাকে কিছুমাত্র বুঝিতে সক্ষম হন নাই। যুবক নরেন্দ্রনাথকে তিনি তাঁহার দিব্যদৃষ্টি-সহায়ে বিশেষভাবে দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন, কালে এই যুবক তাঁহারই আরব্ধ কর্মে আত্মোৎসর্গ করিয়া জগতে এক মহাজাগরণের সূচনা করিবে, যাহার সুস্নিগ্ধ বাণী-ছায়ায় আসিয়া ভ্রান্ত-শ্রান্ত জীবকুল শান্তিলাভ করিতে প্রয়াসী হইবে। এই জন্যই নরেন্দ্রের দৃঢ় আত্ম-বিশ্বাসকে দম্ভ বলিয়া এবং স্বাধীন আচরণকে উচ্ছৃঙ্খল অনাচার বলিয়া তিনি কখনো ভাবিতে পারেন নাই। কিন্তু প্রথম দর্শনে দর্শকবৃন্দ মনে করিত হয়ত বা এই যুবক কতই অসংযমী। এমন কি তাঁহার গুরুভ্রাতাগণও সকলে তাঁহার আচরণকে সম্যকরূপে বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই।

এদিকে যুবক নরেন্দ্রনাথ পিতার অন্তর্ধান হইবার পর হইতে সংসারের আর্থিক অনটন পূরণে কিছুমাত্র সমর্থ না হইয়া ভাবিলেন হয়ত-বা দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের নিকট উপস্থিত হইলে ইহার

কোন না কোন সমাধান হইয়া যাইতে পারে; এই ভাবিয়া একদিন পদব্রজে দক্ষিণেশ্বর অভিমুখে রওনা হইলেন। প্রেম-পরিপূর্ণ-তনু শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে কাছে পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইলেও তাঁহার উদাস মলিন দেহশ্রী দর্শনে কাতর হইয়াছিলেন, কারণ তাঁহারই একান্ত প্রিয়-পাত্র সংসারের আবর্তে পড়িয়া অশান্তি ভোগ করিবে ইহা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। সুযোগ বুঝিয়া নরেন্দ্রনাথও ঠাকুরের নিকট তাঁহার অভিযোগ উত্থাপন করিলেন, যাহাতে তাঁহার কৃপায় সংসারের একটা সুরাহা হইয়া যায়। শ্রীশ্রীঠাকুর তদুত্তরে বলিলেন, "তুই আমার মাকে তো মানিস্ না; মান্‌লে হয়ত কষ্টের লাঘব হইতে পারিত, আচ্ছা, আজ মঙ্গলবার, আমি বলছি, আজ রাত্রে কালীঘরে গিয়ে মাকে প্রণাম করে তুই যা চাইবি, মা তোকে তাই দিবেন।" নরেন্দ্র গম্ভীর হইলেন, পূর্বের নরেন্দ্র আর নাই; এখন তিনি সব কিছু মানেন। স্থির করিলেন আজ এই অদ্‌ভূত মানুষটির প্রস্তরময়ী 'মা'-টিকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে।

সন্ধ্যারতির পর দক্ষিণেশ্বরের গভীর নির্জনতা আরও বৃদ্ধি পাইল। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার সহজ-সরল ভাবরাজ্যে বিচরণ করিয়া আনন্দ-সাগরে মগ্ন রহিয়াছেন। না জানি নরেন্দ্রনাথের মনে তখন কি গভীর আলোড়ন উঠিয়া তাঁহার অদ্বৈতবাদের ভিত্তিমূলকে এক নূতন পরিবর্তনের সম্মুখীন করিয়া দিল। প্রখর বিচার-বুদ্ধি-সম্পন্ন যুবক স্থির গম্ভীর প্রশান্ত মনে অবস্থান করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্য ভাবের প্রতি চাহিয়া রহিলেন, তাঁহাকে আজ আকাঙ্খিত বস্তু জগজ্জননীর কাছে চাহিয়া লইতেই হইবে। যথাসময়ে, নানারূপ সংকল্প বিকল্প লইয়া দেবীর মন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। আজ ঈশ্বর-কৃপায় তাঁহার সংসার-দুঃখ ঘুচিবে। মন্দিরে প্রবেশ করিয়াই কি দেখিতে

পাইলেন ! দেখিলেন, "দেবী ভবতারিণী দিব্য প্রভায় আলোকিত থাকিয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছেন, পাষাণময়ী প্রতিমা জীবন্ত জাগ্রত প্রতিমা।" তাঁহার মনের সকল সংশয় তিরোহিত হইয়া দেবভাবে আবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। পূর্ব সঙ্কল্প সকল একেবারে ভুলিয়া গেলেন ; দেবী সমীপে প্রার্থনা জানাইলেন,— "মা, আমায় বিবেক বৈরাগ্য দাও, জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও !" নরেন্দ্রনাথ ভক্তি-বিশ্বাসে অভিভূত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ পদপ্রান্তে উপস্থিত হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিগো কি প্রার্থনা কোর্‌লে ?" নরেন্দ্রের চৈতন্য হইল, তাই তো কি চাহিতে গিয়া কি চাহিয়া বসিলাম। ঠাকুরের অভিপ্রায়ক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় বারেও তিনি দেবী ভবতারিণীর মন্দির হইতে একই প্রার্থনা জানাইয়া ফিরিয়া আসিলেন। ত্যাগ-বৈরাগ্য-দীপ্ত মন পার্থিব ভোগ সম্পদ চাহিতে পারিল না। তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতে বাধ্য হইলেন, "তুই যখন চাইতে পার্‌লিনা তখন তোর অদৃষ্টে সংসার সুখ নেই। তবে আমি বল্‌ছি, তোদের মোটা ভাত-কাপড়ের কখন অভাব হ'বে না।" পরদিবস তিনি নিশ্চিন্ত মনে গৃহে ফিরিলেন। করুণাময় ঠাকুরের করুণার অন্ত নাই। কিছু দিনের মধ্যেই সংসারের অভাব-অভিযোগ অনেকাংশে মিটিয়া গেল।

পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রভাব, ব্রাহ্ম-সমাজের প্রভাব এবং কালের ভোগসর্বস্ব-ধর্মবিমুখতার প্রভাব তাঁহাকেও কম বিভ্রান্ত করে নাই। কিন্তু দক্ষিণেশ্বরের পৌত্তলিক পূজারী ব্রাহ্মণ তাঁহার জীবনের নূতন দিক খুলিয়া দিলেন। তিনি মর্মে মর্মে অনুধাবন করিলেন,— 'যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই কালী।' "যিনিই নিরাকার তিনিই আবার সাকার হইয়া লীলাভিনয়ে ভক্তের পূজা গ্রহণ করেন।"

নরেন্দ্রনাথের ধর্মমতসকল পরিবর্তিত হইল ; তিনি এখন শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী পরমশ্রদ্ধায় গ্রহণ করিতে মনস্থ করিলেন এবং

তাঁহার আধ্যাত্মিক উপলব্ধি সকল নিজ তীক্ষ্ণ বিচার-বুদ্ধি সহায়ে যাচাইয়া গ্রহণ করিতে থাকিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরও অপূর্ব কৌশলে একপ্রকার অজ্ঞাতেই নরেন্দ্রনাথকে সর্বপ্রকারে গঠন করিয়া তুলিতে-ছিলেন। এক এক দিন এক এক বৎসরের শিক্ষা চলিতে লাগিল। তাঁহার বিশাল হৃদয়-মনও প্রখর বুদ্ধি সহায়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের অপূর্ব উপলব্ধ-তত্ত্ব শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণী সহায়ে অনুধাবন করিতে প্রয়াসী হইল। যুগদেবতার—যুগাচার্য গঠন! কোন বিরক্তি নাই, কোন তিক্ততা নাই। অন্তর্দ্রষ্টা ঠাকুর বুঝিয়াছিলেন তাঁহার মধ্যে ছল চাতুরী বা কপটতা নাই, 'ভাবের ঘরে কিছুমাত্র চুরি' নাই। যে সন্দিগ্ধ-চিত্ত লইয়া, অবিশ্বাসের পুঞ্জীভূত মলিনতায় আচ্ছন্ন হইয়া আমরা মহাপুরুষ-চরিত্র পরীক্ষায় গর্ব বোধ করি, তাহার কিছুমাত্র এই আত্মভোলা যুবকটির অন্তরকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তিনি জগতের মনীষা-সরোবরের নিষ্কলঙ্ক শুভ্র শতদল।

যুবক নরেন্দ্রনাথ সঙ্কল্প করিলেন, ভারতীয় বেদ-বেদান্ত প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ সকল বিশদভাবে জানিয়া এবং ঐ শাস্ত্রাদির অন্তর্নিহিত মর্মবাণী নিজ জীবনে প্রত্যক্ষানুভূতি সহায়ে উপলব্ধি করিয়া যথার্থ তত্ত্ব নির্ণয়ে যত্নপর হইবেন। দিবসের অধিকাংশ সময়ই ধর্মগ্রন্থাদিতে মনোনিবেশ করিয়া এবং রাত্রির নির্জনতায় ধ্যান ধারণার দ্বারা তাহার তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিবার প্রবল চেষ্টা চলিতে থাকিল। অধ্যয়ন ও তপস্যার বিরাম নাই। তাঁহার জীবনের বিশিষ্টতাই এই ছিল যে, কোন কার্য বা বস্তু যতক্ষণ না পর্যন্ত যথার্থভাবে নির্ধারণ হইয়াছে, ততক্ষণ কিছুতেই নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না। তপস্যার ক্ষেত্রেও দেখিতে পাওয়া যায়, যতদিন না ধ্যেয় বস্তুর চরম উপলব্ধি তাঁহার জীবনে উপস্থিত হইয়াছে, ততদিন কিছুতেই তৃপ্ত হইতে পারিতেন না। প্রকৃতিগত স্বভাবের জন্য যখন তিনি আধ্যাত্মিক অনুভূতির চরম ও পরম অবস্থা—নির্বিকল্প সমাধি লাভে তীব্র ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন এবং যখন কিছুতেই ঐ অবস্থালাভে সমর্থ হইলেন না,

তখন বাধ্য হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের পদপ্রান্তে গিয়া প্রার্থনা করিয়া বলিলেন—"ঠাকুর, শুকদেবের মত সর্বদা নির্বিকল্প সমাধিতে প্রতিষ্ঠা কর, নিরন্তর সচ্চিদানন্দ-সাগরে ডুবিয়া থাকিতে চাই।" শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ স্তব্ধ হইলেন, যে নরেন্দ্রনাথ জীব-জগতের কল্যাণের জন্য আত্মোৎসর্গ করিবে, সে কিনা নির্বিকল্প সমাধিতে ডুবিয়া থাকিতে চায় ? তিনি বলিলেন,—"বার বার ঐ কথা বলিতে তোর লজ্জা করে না। কোথায় কালে বটগাছের মত বর্ধিত হয়ে শত শত লোককে শান্তিছায়া দিবি, তা'না তুই নিজের মুক্তির জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিস্ ? এত ক্ষুদ্র আদর্শ তোর ?" নরেন্দ্রনাথ অভিমানে দীপ্ত হইলেন, উত্তর দিলেন,—"যতদিন না ঐ বস্তু জীবনে প্রত্যক্ষ হইতেছে ততদিন অপর কিছুই করিব না।" গুরুগম্ভীর প্রত্যুত্তর হইল—"তুই কি ইচ্ছায় করবি ? জগদম্বা তোর ঘাড় ধরে করিয়ে নেবেন। তুই না করিস্—তোর হাড় করবে।" নরেন্দ্রনাথ নির্বাক, অভিমানে অশ্রু-বিসর্জন করিতে লাগিলেন। করুণাময় ঠাকুর তাঁহার ব্যাকুলতায় প্রসন্ন হইলেন ; বলিলেন,—"আচ্ছা যা নির্বিকল্প সমাধি হবে।" ধ্যানগম্ভীর প্রসন্নতা লইয়া শ্রীগুরুপদ বন্দনান্তে কৃতকৃতার্থ শিষ্য সেদিনের মত বিদায় লইলেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কি অদ্ভুত কৌশলে লোক-চরিত্র অনুধাবন করিয়া তাহাদের নিজ নিজ সংস্কারানুযায়ী সাধনপথে অগ্রসর করাইয়া দিতেন তাহা ভাবিলে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়। কোন্ পথে কোন্ মতে এবং কি প্রক্রিয়ায় সাধকের আত্মোন্নতি তড়িৎ-গতিতে অগ্রসর হইবে, সে বিষয়ে অভ্রান্ত দৃষ্টি তাঁহার ন্যায় অন্য কোনও সাধক-প্রবরে ইতিপূর্বে ফুটিয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ঠাকুর বলিতেন—কোনও ব্যক্তি সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহার সংস্কার রুচি-অভিরুচি প্রভৃতি দর্পণে প্রতিবিম্বের ন্যায় তাঁহার মনে ফুটিয়া উঠিত। কখনও বা বলিতেন,—কাঁচযুক্ত আলমারিতে রক্ষিত জিনিষ-পত্র যেমন বাহির হইতে প্রত্যক্ষ করা যায়,

তেমনই তিনি সংস্কারাদি সহিত লোকটির চরিত্র দেখিতে পান। ইহা ছাড়াও তিনি তাঁহার ভক্তদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি দেখিয়াও সংস্কারাদি নির্ণয় করিয়া লইতেন এবং তদনুযায়ী শিক্ষা দিয়া তাহাকে আরও মহত্তর গুণের অধিকারী করিয়া তুলিতেন। এই স্থানে তুইটি ঘটনা উল্লেখ করিলেই বিষয়টী বুঝিতে পারা যাইবে। ঘটনা তুইটি শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা-প্রসঙ্গকার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, "একদিন শ্রীঠাকুরের অনুগত শিষ্য স্বামী যোগানন্দ কলিকাতা হইতে নৌকাযোগে দক্ষিণেশ্বরাভিমুখে আগমন করিতে ছিলেন, ঐ নৌকা-মধ্যে এক আরোহী এই সংবাদ তাঁহারই বাচনিক জানিতে পারিয়া অকারণে ঠাকুরকে নিন্দাদি করিতে লাগিল "ঐ এক ঢং আর কি; ভাল খাচ্ছেন, গদিতে শুচ্ছেন, ইত্যাদি।" যোগানন্দ স্বামী অত্যন্ত নিরীহ শান্ত প্রকৃতির লোক; পাছে কোন অশান্তি ঘটে এই জন্য কোন প্রতিবাদ করাও প্রয়োজন বোধ করিলেন না। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়া কথা-প্রসঙ্গে আদ্যোপান্ত বিবরণ বলিলে ঠাকুর কিন্তু তাঁহাকে ঐ আচরণ সম্বন্ধে বেশ সজাগ করিয়া বলিলেন, "আমার অযথা নিন্দা করিল, আর তুই কিনা তাহা চুপ করিয়া শুনিয়া আসিলি? শাস্ত্রে কি আছে জানিস্? গুরুনিন্দা-কারীর মাথা কাটিয়া ফেলিবে, অথবা সেই স্থান পরিত্যাগ করিবে। তুই মিথ্যা রটনার একটা প্রতিবাদও করিলি না।" আর একদিনের ঘটনা স্বামী নিরঞ্জনানন্দ কলিকাতা হইতে দক্ষিণেশ্বর যাতায়াত করিতেন। তাঁহার প্রকৃতি অত্যন্ত উগ্র, অন্যায় সহ্য করিতেই পারিতেন না এবং ক্রোধের কারণ উপস্থিত হইলে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িতেন। তিনিও একদিন কলিকাতা হইতে নৌকাযোগে দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার সময়ে, অপরাপর আরোহীগণ বিভিন্ন প্রসঙ্গে দক্ষিণেশ্বরের সেই অদ্‌ভূত পরমহংসটীর নিন্দায় মাতিয়া উঠিলে তাহাদের নিরস্ত হইতে অনুরোধ জানাইলেন। ইহাতে

আরোহীগণ আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল! নিরঞ্জনানন্দ স্বামীর শরীর-মন দৃঢ় উপাদানে গঠিত, তিনি ইহাদের কাহাকেও গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিলেন না। তীব্র প্রতিবাদে তাহাদিগকে স্তব্ধ করিতে না পারিয়া অবশেষে নৌকাখানিকে ডুবাইয়া দিয়া প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যবস্থায় তৎপর হইলেন। আরেহোীগণ ভয়ে ভীত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনায় সেযাত্রা রক্ষা পাইয়াছিলেন। ঠাকুর ও কথা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "ক্রোধ চণ্ডাল, ক্রোধের বশীভূত হইতে আছে? সৎ ব্যক্তির রাগ জলের দাগের মত, হইয়াই মিলাইয়া যায়। হীন বদ্ধ লোকে কত কি অন্যায় কথা বলে, তাহা লইয়া বিবাদ বিসম্বাদ করিতে গেলে উহাতেই জীবনটা কাটাইতে হয়। ঐরূপ স্থানে ভাব্‌বি, 'লোক না পোক (কীট) এবং উহাদিগের কথা উপেক্ষা কর্‌বি।' ক্রোধের বশে কি অন্যায় করিতে উদ্যত হইয়াছিলি, ভাব্ দেখি, দাঁড়ি মাঝিরা তোর্ কাছে কি অপরাধ করিয়াছিল যে, সেই গরীবদের উপরেও অত্যাচার করিতে অগ্রসর হইয়াছিলি!" এইরূপে, শরীর-মনের গঠন বা প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষায়, ব্যক্তি-বিশেষের জীবন বরাবরের জন্য অন্য ছাঁচে গড়িয়া উঠিত সন্দেহ নাই।

পরবর্তী জীবনে স্বামীজির আচরণের মধ্যেও এই ভাবের অনেক ঘটনা দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। শরীর-মনের গঠনানুযায়ী যাহাকে যেভাবে পরিচালনা করিলে যথার্থ কল্যাণ হইবে মনে করিতেন, তাহাকে সেই ভাবেই পরিচালনা করিতেন। হয়ত কোন শারীরিক দুর্বলতাযুক্ত ব্যক্তি স্বামীজির নিকট আসিয়া দার্শনিক কোনও তত্ত্ব উত্থাপন করিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ দীপ্ত কণ্ঠে উপদেশ করিলেন, আগে শরীর সম্বন্ধীয় দর্শন অধ্যয়ন করিয়া তবে এ'সো! দুর্বল শরীর মন লইয়া কেহ গীতা-পাঠে ব্রতী হইলে বলিতেন—কে বলিয়াছে গীতা পাঠে পূণ্য হয়? বরং ফুট্‌বল খেলিলে বেশী পূণ্য হইবে! আপাতঃ দৃষ্টিতে কথা কয়টি অত্যন্ত

রূঢ় হইলেও ইহা যে অতি সত্য কথা তদ্‌বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমরা অত্যন্ত দুর্বল শরীর মন লইয়া গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত হই, এইজন্য ঐ তত্ত্ব কিছুমাত্র অনুশীলন না করিয়াই ক্লান্ত হইয়া পড়ি। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য" উপনিষদের এই মহামন্ত্র স্বামীজির জীবনে বিশেষভাবে প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছিলেন, "এ'র ভিতর যেটা রয়েছে সেটা শক্তি; ওর ভিতর যেটা আছে সেটা 'পুরুষ; ও আমার শ্বশুরঘর।" তিনি সত্যই দেখিয়াছিলেন, নরেন্দ্রনাথে অসীম পৌরুষ-শক্তি বর্তমান রহিয়াছে, যে শক্তিতে তিনি পৃথিবীতে একটা তোলপাড় আনিয়া উপস্থিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আবার তাঁহার মধ্যে অপরিসীম পৌরুষ বর্তমান বলিয়া তিনি যে হৃদয়হীন ছিলেন, তাহা নহে; পৌরুষের তেজ-বীর্য এবং ক্ষমা দয়া প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলী তাঁহাতে সমভাবেই বর্তমান ছিল। এইজন্যই তিনি বলিতে পারিয়াছিলেন, "লক্ষবার নরকে যাইতে প্রস্তুত, যদি একটিও গরীবের উপকার হয়।" এমন মানবদরদী কে কবে প্রত্যক্ষ করিয়াছে? তাই মহামানব শ্রীবুদ্ধের হৃদয়-বত্তা স্বামীজির সহিত তুলনীয় এবং তিনি নিজেও সারাজীবন শ্রীবুদ্ধের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান ছিলেন, কখনও বুদ্ধ-প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলেই তাহাতে আত্মহারা হইয়া যাইতেন। এখানে একটি মাত্র ঘটনার উল্লেখ করিয়াই প্রসঙ্গান্তরে উপস্থিত হইব। ঘটনাটি ভগিনী নিবেদিতা এইভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—"বুদ্ধ সম্বন্ধে স্বামীজি যে সময়ে কথা কহিতেছিলেন, সেটী এক মাহেন্দ্রক্ষণ; কারণ জনৈক শ্রোত্রী স্বামীজির একটি কথা হইতে বৌদ্ধধর্মের ব্রাহ্মণ্য-প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবটীই তাঁহার মনোগত ভাব, এই ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্ত করিয়া বলিলেন, "স্বামীজি! আমি জানিতাম না যে, আপনি বৌদ্ধ!" উক্ত নাম শ্রবণে তাঁহার মুখমণ্ডল দিব্যভাবে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। প্রশ্নকর্ত্রীর দিকে ফিরিয়া তিনি বলিলেন, আমি

বুদ্ধের দাসানুদাসগণের দাস। তাঁহার মত কেহ কখনও জন্মিয়াছেন কি? স্বয়ং ভগবান হইয়াও তিনি নিজের জন্য একটি কাজও করেন নাই, আর কি হৃদয়! সমস্ত জগৎটাকে তিনি ক্রোড়ে টানিয়া লইয়াছেন, এত দয়া যে রাজপুত্র এবং সাধু হইয়াও একটি ছাগ-শিশুকে বাঁচাইবার জন্য প্রাণ দিতে উদ্যত; এত প্রেম যে ব্যাঘ্রীর ক্ষুধা তৃপ্তির জন্য স্বীয় শরীর পর্যন্ত দান করিয়াছিলেন এবং আশ্রয় দাতা এক চণ্ডালের জন্য আত্মবলি দিয়া তাহাকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। আর আমার বাল্যকালে একদিন তিনি সূক্ষ্মদেহে আমার গৃহে আসিয়াছিলেন এবং আমি তাঁহার পাদমূলে সষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়াছিলাম। কারণ আমি জানিয়াছিলাম যে ভগবান বুদ্ধই স্বয়ং আসিয়াছেন।" বাস্তবিক ভগবান বুদ্ধের ন্যায় স্বামীজির কার্য পরার্থে অনুষ্ঠিত হইয়া জগৎকে পবিত্রতর করিয়াছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের দেব-সংস্পর্শে নরেন্দ্রনাথের যেমন শুভ সংস্কার সকলের বিশেষ পরিপুষ্টি সাধন হইতেছিল, তেমনই ধর্ম জীবনের দিক দিয়াও তিনি চরম সত্য লাভের বা ঈশ্বর-সাক্ষাৎকারের জন্য ঠাকুরের শ্রীমুখ-নিঃসৃত বিশেষ নির্ভরতা-সূচক বাণীতে শ্রদ্ধা ও আস্থা দৃঢ়তর করিয়া সাধন-পথে অগ্রসর হইতেছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর দৃঢ়তার সহিত তাঁহাকে বলিতেন—"মানবের সকরুণ প্রার্থনা ঈশ্বর সর্বদা শ্রবণ করিয়া থাকেন এবং তোমাতে আমাতে যেভাবে বসিয়া বসিয়া কথোপথন করিতেছি উহা অপেক্ষাও স্পষ্টতর ভাবে তাঁহাকে দেখিতে, তাঁহার বাণী শ্রবণ করিতে ও স্পর্শ করিতে পারা যায়, একথা আমি শপথ করিয়া বলিতে প্রস্তুত আছি।"

আবার কখনও তিনি বলিতেন, "সাধারণ প্রসিদ্ধ ঈশ্বরের যাবতীয় রূপ এবং ভাবকে মানব কল্পনা-প্রসূত বলিয়াই যদি মনে কর অথচ জগতের নিয়ামক ঈশ্বর একজন আছেন এ কথায় বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে 'হে ঈশ্বর, তুমি কেমন জানিনা,

তুমি যেমন, তেমনি ভাবে আমাকে দেখা দাও' এরূপ কাতর প্রার্থনা করিলেও তিনি উহা শ্রবণ-পূর্বক কৃপা করিবেন নিশ্চয়।” শ্রীঠাকুরের সরল দৃঢ় বিশ্বাস ও ঈশ্বর-নির্ভরতার প্রভাবে নরেন্দ্রনাথের ঈশ্বর বিশ্বাস ও নির্ভরতা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল! ঐ কালে তিনি যে কেবলমাত্র নরেন্দ্রনাথকেই আত্মোপলব্ধির প্রবল প্রেরণা যোগাইতেছিলেন তাহা নহে, সম-ভাবে অন্তরঙ্গ পার্ষদ এবং সমীপাগত ভক্তমণ্ডলীকে অধিকারী ভেদে ধর্মানুভূতি সকল উপলব্ধি করাইয়া বা উহার ক্রম সকল প্রদর্শন করাইয়া দিতেছিলেন। যাহার ফলে এক ধর্ম-মহাচক্র তাঁহাকেই কেন্দ্র করিয়া গঠিত হইয়া উঠিতেছিল। তাঁহার কৃপা-মাত্রে কাহারও দর্শন, কাহারও সমাধি, কাহারও ভাব মহাভাব প্রভৃতি আধ্যাত্মিক বিবিধ উপলব্ধি সকল শরীর-মনে উপস্থিত হইয়া সাধকজীবন কৃতার্থ করিয়া দিতেছিল। বিশেষতঃ শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্য শরীর ত্যাগের অনতিপূর্ব কয় বৎসর যে আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ তাঁহার শরীর-মনে উপস্থিত হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত, কল্পনাতীত। ঐ সময়ে যাঁহরাই ভাগ্যবশে তাঁহার পদপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারাই কম বেশী কিছু না কিছু পারমার্থিক উন্নতি লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

পূর্বেই বলিয়াছি দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ পদপ্রান্তে এইকালে শত শত ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দর্শন এবং তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিয়া নিজ নিজ ধর্ম সম্বন্ধীয় সংশয় সমাধান করিয়া লইতেছিলেন। প্রায় সর্বক্ষণ জীবকল্যাণ কামনায় ধর্মোপদেশ প্রদানে এবং মুহুর্মুহুঃ সমাধির ফলে তাঁহার শরীর ক্রমশঃ ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছিল। তাই একদিন ভাবাবেশে জগজ্জননীকে বলিয়াছিলেন, “যত সব এঁদো লোককে এখানে আনবি, একসের তুধে একেবারে পাঁচসের সের জল, ফুঁ দিয়ে জাল ঠেলতে আমার চোখ গেল, হাড় মাটি হল, অত করতে আমি পারবো না, তোর সখ থাকে তুই কর্‌গে

যা। ভাল লোক সব নিয়ে আয়, যাদের দু এক কথা বলে দিলেই (চৈতন্য) হবে।" আর একদিন এই ভাবে জগন্মাতার উপর অভিমানে বলিয়াছিলেন "মাগো আজ বলিয়াছিলাম বিজয়, গিরীশ, কেদার, রাম, মাষ্টার এই কয়জনকে একটু একটু শক্তি দে যাতে নূতন কেহ আসিলে ইহাদের দ্বারা কতকটা তৈয়ারী হইয়া আমার নিকটে আসে।" শ্রীশ্রীঠাকুর আর একদিনও ভাবস্থ অবস্থায় শ্রীশ্রীভবতারিণীকে বলিয়াছিলেন,—"এত লোক কি আন্‌তে হয়! একেবারে ভিড় লাগিয়ে দিয়েছিস্! লোকের ভিড়ে নাইবার খাইবার সময় পাই না! একটা ত এইটুকু ঢাক, (নিজ শরীর লক্ষ্য করিয়া) রাত-দিন এটাকে বাজালে আর কয়দিন টিকিবে?" হইলও তাহাই ;—তাঁহার দেব-শরীরে অসুস্থতা শীঘ্রই প্রকাশিত হইল। ভক্ত অনুরাগী শিষ্যদিগের একান্ত চেষ্টায় যদিও তিনি কলিকাতা আসিয়া তৎকালীন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করাইতে সম্মত হইলেন, তথাপি উহাতে রোগের উপশম বিশেষ কিছু লক্ষিত হইল না। ভক্তেরা চিন্তিত হইলেন! শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে প্রয়াসী হইয়া তখন কাশীপুরে অবস্থিত একটি বাগানবাটী তাঁহার অবস্থিতির জন্য ভাড়া লইয়া সকলে সমবেতভাবে তাঁহার যথোচিত সেবা ও চিকিৎসাদিতে যত্নপর হইলেন! ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস এই স্থানেই তিনি ভাগবত জীবনের শেষ সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন এবং এই কয় মাস ত্যাগী যুবক ভক্তদের লইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মসংঘের যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহাই কালে মহামহীরুহরূপে সারা-বিশ্বকে ধর্মের সুশীতল ছায়া দানের গৌরব অর্জনে সমর্থ হইয়াছিল। এই স্থলেই নরেন্দ্রাদি ত্যাগী যুবকবৃন্দকে প্রতিনিয়ত তাঁহার আগমনের হেতু এবং তাঁহাদের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করিয়া প্রত্যেককে নিজ নিজ ভাবানুযায়ী গঠন করিয়া দিয়াছিলেন। এই বাগানবাটীতেই যুবক

নরেন্দ্রনাথকে নিশাকালে একান্তে ডাকিয়া—"আজ তোকে সর্বস্ব দিয়া ফকীর হইলাম" বলিয়া তাঁহাকে জীবজগতের কল্যাণব্রতে দীক্ষিত করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন,। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে দুর্বলের উপর প্রবলের যেরূপ অত্যাচার, দস্যুতা, জুলুম প্রভৃতি হইয়াছে জগতের ইতিহাসে আর কখনো এরূপ হয় নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন এই জাতীয় কলঙ্ক নরেন্দ্রনাথকেই অপনোদন করিতে হইবে!

প্রেমস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার শিষ্যগণকে—সন্ন্যাসীগণের তো কথাই নাই—গৃহস্থগণকে পর্যন্ত এক প্রেমের সূত্রে আবদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে তাহার দেহান্তে গৃহস্থ শিষ্যগণ সন্ন্যাসী যুবকগণের আহার বিহারের যথাসাধ্য সহায়তাও করিয়াছিলেন; তাহাও গুরুভ্রাতাগণের প্রতি আন্তরিক ভালবাসারই নিদর্শন। ঠাকুর যেমন বলিতেন,—"আমার সন্তানেরা কিরূপ,—যেমন কলমি শাক; একটিকে ধরিয়া টানিলে সব দলটী চলিয়া আসে।" এইজন্যই তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে কখনও ছোট বড় বা গৃহী সন্ন্যাসী ভেদ ছিল না। তাই স্বামীজি পত্রে একস্থানে লিখিয়াছেন, "আমি গৃহস্থ বুঝিনা, সন্ন্যাসীও বুঝিনা, যথার্থ সাধুতা এবং উদারতা এবং মহত্ত্ব যথায়, সেই স্থানেই আমার মস্তক চিরকালই অবনত হউক।"

স্বামীজি মহারাজ পাশ্চাত্য দেশ হইতে আগমনের পর বিভিন্ন প্রদেশে ভ্রমণ করিতে বহির্গত হইয়াছিলেন, এবং ঐ সময়ের একটি ঘটনায় তাঁহার মহত্ত্ব বেশ বুঝিতে পারা যায়। দরিদ্র অথচ যথার্থ পবিত্র 'শুদ্ধ আধার' ব্যক্তির প্রতি তাঁহার বরাবর অনুরক্তি ছিল! তিনি যখন ক্ষেত্রির পথে আলোয়ারে উপস্থিত হইলেন, তখন তথাকার শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ও ধনী ব্যক্তিগণ কর্তৃক বিশেষভাবে অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন। রেল-ষ্টেশনে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সহিত আলোচনাদি করিতেছেন,

এমন সময় দেখিতে পাইলেন যে তাহারই দীক্ষিত একটি গরীব সদাশয় ব্যক্তি অত্যন্ত করুণ-নেত্রে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে নিকটে ডাকিয়া কুশল-বার্তা জিজ্ঞাসানন্তর তাহারই গৃহে আতিথ্য গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইলেন, অপর কোন ধনী বা মানী ব্যক্তির প্রার্থনাই রক্ষা করিলেন না। গরীব শিষ্যটির গৃহে গিয়া অবস্থান করিলেন। আর একটি ঘটনা ;— আলোয়ারেরই অপর একটি গরীব মহিলার নিকট দীর্ঘকাল পূর্বে যখন পরিব্রাজকের বেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন তখন ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া বিশেষ তৃপ্ত হইয়াছিলেন। এবারেও তিনি তাহাকে সংবাদ পাঠাইয়া জানাইলেন যে, তাহার নিকট হইতে 'চাপাটি' নামক রুটি ভিক্ষা লইবেন। ইহাতে মহিলাটি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া স্বামীজির সহিত সকলকে আহার করাইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। মহিলাটি যখন স্বামীজিকে 'চাপাটি' পরিবেশন করিতেছিলেন, তখন অশ্রুসিক্ত নয়নে বলিয়াছিলেন, "আমি গরীব। ইচ্ছা থাকিলেও তোমাকে দেবার মত কোন মিষ্ট দ্রব্য কোথায় পাইব বাবা ?" তদুত্তরে স্বামীজি বলিলেন, "তোমার এই 'চাপাটি'র মত মধুর খাদ্যদ্রব্য আমি আর আহার করি নাই।" উপস্থিত শিষ্যবর্গকে লক্ষ্য করিয়া বহিলেন, "দেখলি, কি ভক্তিমতী মহিলা! এরূপ সাত্ত্বিক আহার আমার ভাগ্যে অনেকদিন লাভ হয় নাই।" স্বামীজি মহারাজের এই মহত্ত্বপূর্ণ ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য, যদিও তাঁহার জীবনে এরূপ ঘটনা আরও ঘটিয়াছে। জানিতে পারা যায় আহারান্তে উক্ত গরীব পরিবারটিকে আর্থিক সহায়তাও করিয়াছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে নিরভিমানিতা বহুক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হইয়াছে এবং সন্ন্যাসের আদর্শকে বরাবর রক্ষা করিয়া চলাও একান্তভাবে তাঁহার কাম্য ছিল। এইখানে স্বামীজি জীবনের মহত্ত্বপূর্ণ দুই একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণদের তামাকু সেবন করিতেন, একবার ভাবস্থ অবস্থায় যুবক নরেন্দ্রনাথকে নিজের তামাকু সেবন করাইয়াছিলেন, ইহাতে তিনি সংকুচিত হইয়া আপত্তি জানাইলে বলিয়া ছিলেন "আমি আর তুই কি পৃথক।" ছাত্র-জীবনেও জাতিভেদের সত্যতাপরীক্ষা করিবার জন্য তিনি অন্তজ জাতির জন্য নির্দিষ্ট হুকাতে তামাকু সেবন করিয়াছিলেন। পরিব্রাজক বেশে তিনি যখন বিভিন্ন প্রদেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন এক পল্লীবাসীকে তামাকু সেবন ব্যাপৃত দেখিয়া তাঁহারও তামাকু সেবনের ইচ্ছা উদিত হইল। তৎক্ষণাৎ পল্লীবাসীটির নিকট গমন করিয়া বলিলেন, 'আমাকে একটু তামাকু দেবে?' তাহাতে পল্লীবাসী উত্তরে জানাইল যে, সে 'ভাঙ্গি', মানে নীচু জাতি বিশেষ। তিনি বিরত হইয়া আপন মনে পথ চলিতে উদ্যত হইলেন, হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, "আমি তো সন্ন্যাসী,—কোন সামাজিক সংস্কার তো আমার মধ্যে থাকা উচিত নহে! সন্ন্যাসীর আবার জাতি কি? তৎক্ষনাৎ তিনি ফিরিয়া আসিয়া পল্লীবাসী 'ভাঙ্গি'টির নিকট হইতে হুকাটি চাহিয়া লইয়া আনন্দের সহিত তামাকু সেবন করিয়াছিলেন। আর একবার পাশ্চাত্য দেশ হইতে ফিরিবার পথে এডেন বন্দরে একটি দরিদ্র ভারতবাসীর নিকট হইতে তামাকু সেবন করিয়া অনুগামী পাশ্চাত্য শিষ্যদিগকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছিলেন। এই তামাকু সেবন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একটি আনন্দপূর্ণ বিশ্রাম। স্বামীজি যখন 'মঠ-মিশন' প্রতিষ্ঠা করেন, তখন এই তামাকু সেবন বিষয়ে মন্তব্য করিয়া একটি নিয়মও প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণজীবনে বিবেকানন্দ যে মহামিলনের সূত্র প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহা রূপায়িত করিবার ভারও তিনি নিজেই গ্রহন করিয়াছিলেন। বহুর মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি, বিভিন্ন ধর্মের বিচিত্রতার মধ্যে ধর্মসমন্বয় হওয়া যে নিশ্চিতরূপে সম্ভব তাহা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও আচরণের মধ্যে অত্যন্ত

পরিস্ফুট ছিল। হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন মতের তথা খৃষ্টান, মুস্লীম প্রভৃতি মতের সাধনে সিদ্ধি লাভ করিয়া তিনি ইহাই প্রতিপন্ন করিলেন যে ভারতবর্ষ সর্বধর্মের মিলন তীর্থ। ভেদ-বিভেদ হিন্দু ধর্মের যথার্থরূপ নহে। স্বামীজিও তাঁহার এই নীতিই অনুসরণ করিয়া সনাতন হিন্দু ধর্মের পাদপীঠ হইতে দীপ্ত ঘোষণাবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। পরবর্তীকালে এই উদার মহৎ সমন্বয়ের বাণীই বিভিন্ন প্রকারে মণীষীদের বাণীর মধ্যে ব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। একস্থানে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ভারতের সমাজ ধর্মনীতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "বহুর মধ্যে ঐক্যের উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য স্থাপন—ইহাই ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম। ভারতবর্ষ পার্থক্যকে বিরোধ বলিয়া জানে না, সে পরকে শত্রু বলিয়া কল্পনা করেনা। এই জন্যই ত্যাগ না করিয়া, বিনাশ না করিয়া একটি বৃহৎ ব্যবস্থার মধ্যে সকলকেই সে স্থান দিতে চায়। এই জন্য সকল পন্থাকেই সে স্বীকার করে,—স্বস্থানে সকলেরই মাহাত্ম্য সে দেখিতে পায়।" শ্রীরামকৃষ্ণের যে সাধনা তাহা এই সর্বধর্মের মিলনক্ষেত্র আবিষ্কারের সাধনা যাহা বর্তমান যুগে একান্ত ভাবে আবশ্যক। শ্রীরামকৃষ্ণ সান্নিধ্যে বিবেকানন্দ তাহাই একান্ত ভাবে শিক্ষা করিয়াছিলেন।

পৃথিবীতে এমন সময় কখনও কখনও উপস্থিত হয় যখন বিভিন্ন পর্যায়ে সমাজের প্রাণকেন্দ্র ধর্মকে নিষ্পেষণ-আন্দোলনের সম্মুখীন হইতে হয়, সে বাহিরের আঘাতেই হোক্ আর স্বদেশীয় অত্যাচারেই হোক্। তখন ধর্মের স্থানে আসিয়া দাঁড়ায় সমাজ বা শাসকশ্রেণী। আবার এই অনুভূতিই স্বদেশকে বড় করিয়া দেখিতে, দেবতার স্থানে অভিষিক্ত করিতে উদ্‌বুদ্ধ করে। তখন দেবীরূপ মাতৃভূমির জন্য জীবন উৎসর্গ করাটাই গৌরবের ধর্ম হইয়া উঠে। পীড়িতের সেবা, আর্তের সেবা, দুর্বলের সেবা, 'নারায়ণ' বোধে সেবা করিতে অগ্রসর হইয়া

মানুষ ক্রমে ক্রমে ধর্মের মর্মস্থানে উপস্থিত হয়। ইহাই মনুষ্যধর্মে ক্রমবাদ। ধর্মের জন্য, দেশের জন্য, মানবের জন্য আত্মোৎসর্গ একই পর্যায়ভুক্ত হইয়া দাঁড়ায়। এই স্বার্থত্যাগ আত্মত্যাগ সর্বক্ষেত্রেই প্রয়োজন—কি ধর্মে, কি রাষ্ট্রে। নতুবা স্বার্থান্বেষী ভোগতৃষ্ণা আমাদের দৃষ্টিকে সংকীর্ণতায় সীমাবদ্ধ করিয়া তুলিবেই। সুপরিকল্পিত ত্যাগের মধ্য দিয়া সমবেত প্রচেষ্টাকে যথার্থ কার্যে নিয়োজিত করিতে পারিলে সমাজ কিরূপ উপকৃত হয়, স্বামীজি প্রবর্তিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশন' তাহার দৃষ্টান্ত স্থল সন্দেহ নাই। সংঘ-জীবনের প্রয়োজনীয়তা এইদিক দিয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছিলেন, "নরেন্দ্রের মত একটি ছেলেও আর দেখিতে পাইলাম না! যেমন গাইতে-বাজাতে তেমনি লেখাপড়ায়, তেমনি বলতে-কইতে, আবার তেমনি ধর্ম বিষয়ে। সে রাত-ভোর ধ্যান করে, ধ্যান করতে করতে সকাল হয়ে যায়, হুঁস থাকে না। আমার নরেন্দ্রর ভিতর একটু মেকী নেই; বাজিয়ে দেখ, টং টং করছে।" সত্যই তাঁহার জীবনে বিন্দুমাত্র 'মেকী' দেখিতে পাওয়া যায় নাই। বাহিরের আচরণের মধ্যে প্রথম প্রথম অনেকেই তাঁহাকে ভুল বুঝিয়া বসিলেও এবং তাঁহার স্পষ্টোক্তি, অসঙ্কোচ ব্যবহার, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও বুদ্ধি দ্বারা সকল তত্ত্ব জানিয়া-বুঝিয়া লইবার প্রয়াসকে ঔদ্ধত্য বলিয়া ভুল করিলেও তাঁহার আত্মবিশ্বাস, সত্যানুরাগ ও তেজস্বিতার নিকট সকলেই স্তব্ধ হইতে বাধ্য হইতেন। তাঁহার আচরণের মধ্যে কোথায়ও 'লুকোচুরি' ছিল না; চিন্তা বা উক্তিতে ছিল না অপবিত্রতার লেশ। অন্যায় অবিচারের সহিত সন্ধি করিয়া তিনি কোনদিন বিজয়ের গৌরব-রথ পরিচালনায় প্রয়াসী হন নাই। পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তিনি জন-সমাজে নিজের মতবাদ অনুপম মহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর, যুবক নরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি সহায়ে ভবিষ্যৎ কৃতকার্যতা দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং সর্বসমক্ষে প্রকাশ করিতেও দ্বিধা করেন নাই। একদিন প্রসঙ্গক্রমে শ্রীযুত কেশব সেন ও শ্রীযুত বিজয় গোস্বামীর মন্তব্যে বলিয়াছিলেন, "দেখিলাম, কেশব যেরূপ একটা শক্তির বিশেষ উৎকর্ষে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে, নরেন্দ্রের ভিতর ঐরূপ আঠারটা শক্তি পূর্ণমাত্রায় বিগুমান। আবার দেখিলাম, কেশব ও বিজয়ের অন্তর দীপ-শিখার ন্যায় জ্ঞানালোকে উজ্জ্বল রহিয়াছে। পরে নরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া দেখি, তাহার ভিতর জ্ঞান-সূর্য উদিত হওয়ায় মায়া-মোহের লেশ পর্যন্ত তথা হইতে দূরীভূত হইয়াছে।" বাস্তবিক শ্রীশ্রীঠাকুর কত ভাবে কত প্রযত্নে নরেন্দ্রনাথকে গঠন করিয়া তুলিয়াছিলেন, ভাবিলে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়। কখনও তর্ক যুক্তি প্রদর্শন করিয়া, কখনও স্পর্শ দ্বারা, কখনও উচ্চ উচ্চ ভাবভূমির অনুভূতি করাইয়া সন্দিগ্ধ মনকে স্থির নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই ক্রমে দ্বৈত-অদ্বৈত প্রভৃতি সিদ্ধান্তে তাঁহাকে এককালে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আচার্যের পদবীতে উন্নীত করিয়া তুলিয়াছিলেন। সন্দিগ্ধমনা নরেন্দ্রনাথ যখন দ্বৈতবাদাত্মক মূর্তি পূজাকে কিছুতেই স্বীকার করিতে পারিলেন না, তখন মন্দিরের শ্রীশ্রীভবতারিণীকে দর্শন এবং হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া স্থূল অনুভূতি দ্বারা দেখিলেন যে, দেবী মৃন্ময়ী নহেন, জীবন্ত দেহধারী প্রতিমা! তখন তাঁহার অবিশ্বাস চিরকালের জন্য তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল। বিভিন্ন পুঁথিগত মতবাদ, বিশেষতঃ পাশ্চাত্য দর্শনাদির সিদ্ধান্ত, সনাতন হিন্দুধর্মের সিদ্ধান্ত সমূহের পরিপোষক না হওয়ায় তাঁহার মনে যে সংশয় ছিল ঠাকুর তাহা বিদূরিত করিয়া তাঁহাকে সামঞ্জস্যপূর্ণ সুষ্ঠু মীমাংসায় উপনীত করাইয়াছিলেন। ঠাকুরের পূত সন্নিধানে উপস্থিত হইবার আগেই তিনি পাশ্চাত্য দর্শন-বিজ্ঞানে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ

করিয়াছিলেন। কিন্তু উহা তাঁহাকে যথার্থ শান্তি দিতে পারে নাই। সদ্‌বস্তু লাভের তীব্র আকাঙ্খাই তাঁহাকে তৎকালীন মহাত্মাদিগের নিকট লইয়া যাইবার সহায়তা করিয়াছিল এবং সকল স্থানেই "মহাশয়, আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন?" এই প্রশ্নেরই উত্তর কামনা করিয়াছিলেন দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ সান্নিধ্যে গিয়াও তিনি সর্ব-প্রথম ঐ প্রশ্নই করিয়াছিলেন। তিনিও সহজ সরলভাবে উত্তর দিয়াছিলেন "হাঁ, দেখিয়াছি, তোমাকেও দেখাইতে পারি।" নরেন্দ্রনাথ এরূপ উক্তি শুনিয়া যে বিশেষ স্তম্ভিত হইবেন তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। কারণ তাঁহার জীবনে ঐরূপ ব্যক্তি ইতিপূর্বে দৃষ্ট হওয়া তো দূরের কথা এরূপ ব্যক্তি যে বর্তমান তাহাও কল্পনাতীত! পাশ্চাত্যভাবে শিক্ষিত নরেন্দ্রনাথ উক্তপ্রকার উক্তিতে বিশ্বাস করিয়াও সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হইতে পারিয়াছিলেন কি? সম্ভবতঃ নহে। আধ্যাত্মিক সাধনার চরম পরিণতি যে ঈশ্বর লাভ তাহা জানিয়া এবং শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য জীবন দর্শন করিয়াও অনেকেই তাঁহার মধ্যে ঈশ্বর সাক্ষাৎকার কল্পনা বা ধারণা করিতে অপারগ হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের অপূর্ব উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষসমূহ বিচার-বিশ্লেষণে অগ্রসর হইয়া মন-বুদ্ধিআদি ইন্দ্রিয় সকল অসমর্থতাবশতঃ অধিকতর সন্দেহেরই উদ্রেক করিয়াছে! তিনি যেমন বলিতেন, "ছটাক বুদ্ধি লইয়া ঈশ্বরকে মাপিতে যাওয়া" তেমনই মানব বুদ্ধি বিভ্রান্ত হইবে ইহাতে আর বিচিত্র কি?

ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনাদিতে ব্যুৎপত্তি যুবক নরেন্দ্রনাথকে ধর্মের মর্মানুগ্রহণে সহায়তাই করিয়াছিল এবং তিনি যে এই সময়ে অধিকতর ঈশ্বর বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাহাও শ্রীশ্রীঠাকুরের উক্তি হইতে অনুমিত হয়। তবুও ঐ সময়ে তাঁহাকে বিষম পরীক্ষা-সঙ্কটে পড়িতে হইয়াছিল। একদিকে সংসার, আর এক দিকে

মোক্ষমার্গ! অদ্ভুত জীবন; অদ্ভুত সংকল্প-বিকল্পের মধ্য দিয়াই অগ্রসর হওয়া! একদা সংসারের প্রতি কঠিন কর্তব্য পালনে যত্নপর হইয়াও অর্থোপার্জনে ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া রাজপথ আশ্রয় আবার একদা তাঁহার মহান্ শ্রীগুরুর ব্রত উদ্‌যাপনে সন্ন্যাস-জীবনে কত স্থানে বৃক্ষতলকে এবং অনাদৃত স্থানকে শয্যারূপে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, তাহা জানিয়া হতবাক হইতে হয়। এতসব প্রতিকুল-অপ্রতিকুল আবহাওয়ার মধ্যেও তিনি অসীম ধৈর্যে নির্বিকার আনন্দ উপভোগ করিতে পারিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রয়ে দক্ষিণেশ্বর পঞ্চবটী বৃক্ষমূলে সতীর্থগণের সহিত আলোচনায় তিনি যেমন আনন্দ-মুখর হইয়া উঠিতেন, আবার তেমনই ধ্যান-ধারণায়ও আত্মনিবেশ পূর্বক বৃত্তি-শূন্যের সাধনায় লিপ্ত থাকিতেন। কখনওবা আবার তথাগত বুদ্ধের ন্যায়ই তরুছায়া-তলে ধর্মবেদী স্থাপন করিতেন। বৃক্ষমূলে বসিয়া উচ্চ উচ্চ চিন্তা, শ্রবণ, মনন ও উপদেশাদি প্রদান তাঁহার জীবনে বিশেষ প্রীতিপ্রদ মনে হইত। পাশ্চাত্য দেশে যে পাইন বৃক্ষমূলে বসিয়া তিনি উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, আজিও ঐ বৃক্ষটি 'স্বামীজিস্ পাইন' নামে প্রসিদ্ধ হইয়া তাঁহার স্মৃতি বহন করিতেছে। সহস্রদ্বীপোদ্যানে অবস্থান কালে তিনি অনেক সময় বৃক্ষমূলেই উপাসনাদি করিতেন ও উপদেশাদি প্রদান করিতেন। আলমোড়া অবস্থান কালে ও কাশ্মীর থাকাকালীন এই বৃক্ষ মূলকেই শান্তির স্থানরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন দেখিতে পাওয়া যায়। শেষজীবনে বেলুড় মঠে বিল্ববৃক্ষটির মূলে বসিয়াও অনেক প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছিল এবং ঐ বিল্বমূলে বসিয়াই তৎসংলগ্ন বর্তমান স্বামীজির স্মৃতি মন্দির-তলস্থ জমিখণ্ড তাঁহার শেষ কৃত্যের জন্য চিহ্নিত করিয়া গিয়াছিলেন।

যুবক নরেন্দ্রনাথ শ্রীশ্রীঠাকুরের দেবশরীর বর্তমান থাকিতেই তাঁহার ধর্ম সংস্থাপন কার্যে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিলেন

এবং যাহাতে তাঁহার সেবক ভক্তগণের যথার্থ ত্যাগ বৈরাগ্য-দীপ্ত জীবন সংযমের ও নিষ্ঠার মধ্য দিয়া গড়িয়া উঠিতে পারে, এবং তাঁহারা কেবলমাত্র ভাবপ্রবণ না হইয়া জ্ঞান-ভক্তির অধিকারীও হইতে পারেন তৎবিষয়েও প্রখর দৃষ্টি রাখিতেছিলেন। এজন্য তিনি প্রায়শঃ বলিতেন, "যাহারা শ্রীশ্রীঠাকুরকে যথার্থ ভালবাসিবে তাহাদের জীবন ও চরিত্র সর্বতোভাবে তাঁহার ন্যায় গঠিত হইয়া উঠিবে।" তাঁহার উদার মহৎভাব 'যতমত ততপথ' সহায়ে সকলের সহিত সাম্য ও প্রেম সম্পন্ন হইয়া ঈশ্বরাভিমুখে অগ্রসর হওয়াই চরম পুরুষার্থ। এই বিষয়ে স্বামীজির স্পষ্ট অভিমত এইরূপ—"যে ভাবোচ্ছাস মানবজীবনে স্থায়ী পরিবর্তন উপস্থিত না করে, যাহার প্রভাব মানবকে এইক্ষণে ঈশ্বর লাভের জন্য ব্যাকুল করিয়া তুলিয়া পরক্ষণে কাম-কাঞ্চনের অনুসরণ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে না, তাহার গভীরতা নাই। সুতরাং তাহার মূল্যও অতি অল্প। উহার প্রভাবে কাহারও শারীরিক বিকৃতি,—যথা অশ্রু পুলকাদি অথবা কিছুক্ষণের জন্য বাহ্য-সংজ্ঞার লোপ হইলেও আমার নিশ্চয় ধারণা, উহা স্নায়বিক দৌর্বল্য-প্রসূত; মানসিক শক্তিবলে উহাকে দমন করিতে না পারিলে পুষ্টিকর খাদ্য এবং চিকিৎসকের সহায়তা গ্রহণ করা মানবের অবশ্য কর্তব্য।" ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় ঠাকুরের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি তাহাদিগকে এমনভাবে যথার্থ বৈরাগ্য ও তত্ত্ব নিরূপণে সহায়তা করিয়া আসিতেছিলেন ভাবপ্রবণতায় যাহাতে কেহ আসল জীবন-উদ্দেশ্য ভুলিয়া না যান। আবার তিনিই সকলের অগ্রণী হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের লোকপাবন চরিত্রের প্রতিটি আচরণের গভীর অর্থ বিচার-বিশ্লেষণের দ্বারা নিরূপিত করিতে প্রয়াসী হন। শ্রীশ্রীঠাকুর যথার্থই বলিয়াছিলেন, "এত ভক্ত আসছে, ওর মত একটিও নাই।—এক একবার বসে বসে খতাই। তা দেখি, অন্য পদ্ম কারু দশদল, কারু ষোড়শদল, কারু শতদল কিন্তু পদ্মমধ্যে নরেন্দ্র সহস্রদল।"

তাঁহাদের মহান শ্রীগুরুদেবকে কেন্দ্র করিয়া যে আধ্যাত্মিক পরিবেশ সৃষ্ট হইয়া ছিল, তাহার অমোঘ প্রভাবে ত্যাগী সন্তানগণ নিজেদের অলক্ষ্যেই সমাজ-কল্যাণের ব্রতোপযোগী ভাবে গঠিত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং তিনিও সময় ও সুযোগ বুঝিয়া প্রত্যেকের নিজ নিজ ভাবানুযায়ী পারমার্থিক কল্যাণের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিতেছিলেন। কাশীপুর অবস্থান কালে নরেন্দ্রনাথকে প্রায় প্রত্যহ একান্তে ডাকিয়া লইয়া কি উপদেশ-আদেশ প্রদান করিতেন, তাহা কে বলিবে! কোন কোন দিন গুরুশিষ্যের এই নিভৃত সাধন-যজ্ঞ দুই তিন ঘণ্টারও অধিক কাল স্থায়ী হইত। শ্রীশ্রীঠাকুরের শিক্ষা-দীক্ষা এমন কি কথাবার্তাও শ্রোতা-গ্রহীতার ভাবানুযায়ী অনুষ্ঠিত হইয়া অধিকারী-ভেদে সকলকেই কল্যাণের পথে অগ্রসর করাইয়া দিত। ত্যাগাবলম্বন-কারী সন্ন্যাসীগণের প্রতিটি শিক্ষা যেমন ত্যাগীগণের উপস্থিতিতেই সম্পন্ন হইত, তেমনই আবার গৃহস্থগণের নির্ভরযোগ্য আশা-ভরসার প্রসঙ্গও গৃহস্থ-গণের মধ্যেই পরিবেশিত হইয়া প্রত্যেককে ভাবানুযায়ী ধর্মপথে অগ্রসর করাইয়া, "কাহারও ভাব নষ্ট করিতে নাই"—এই বাণীর মর্যাদা রক্ষা করিত।

জন্মাবধি প্রবল ব্যক্তিত্ব তাঁহাতে বর্তমান ছিল বলিয়াই তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের বিভিন্ন প্রবল শক্তি সমূহ হইতে নিজকে সবলে পৃথক রাখিয়া, তাঁহার প্রত্যেকটি বাণী বিচার বিশ্লেষণের দৃষ্টি লইয়া যাচাই করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি ও যোগ সহায়ে ঠাকুরের মধ্যে যেমন সমন্বয়ভাবের ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তেমনই পরবর্তী কালে নরেন্দ্রনাথের মধ্যেও সর্বভাবের আদর্শ পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশিত হইয়া তাঁহাকে বহুমুখী প্রতিভা-সম্পন্ন আচার্যের পদবীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। বাহির হইতে দেখিতে গেলে তাঁহাকে কেবলমাত্র কর্মী ও জ্ঞানী বলিয়া মনে হইলেও তিনি ভক্তি ও যোগের বিশেষ আধিকারিক পুরুষ

ছিলেন সন্দেহ নাই। তিনি একসময় বলিয়া ছিলেন যে, "শ্রীশ্রীঠাকুর বাহিরে পূর্ণ মাত্রায় ভক্ত, কিন্তু ভিতরে পূর্ণ জ্ঞানী। আমি বাহিরে পূর্ণ মাত্রায় জ্ঞানী হইলেও অন্তর ভক্তিতে পূর্ণ।" ঈশ্বর-ভজনে তন্ময় হইয়া অশ্রুবিসর্জন, 'মা' 'মা' বলিয়া আনন্দে নৃত্যরত ও ভাবে অশ্রুপ্লুত বিবেকানন্দের মূর্তি অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। দক্ষিণেশ্বরের স্মৃতি বিজড়িত কোন প্রসঙ্গ তাঁহার নিকট উত্থাপন করিলে তিনি মুহূর্তে গম্ভীর হইয়া উঠিতেন এবং সকলের অলক্ষ্যে নিজের ভাব সামলাইয়া আত্ম গোপন করিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তর্ধানের পর দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলে অথবা দূর হইতে উহা দর্শন করিলেও ঠাকুরের পূণ্য-স্মৃতি তাঁহাকে বিহ্বল করিয়া তুলিত কারণ উহাই ছিল ঠাকুরের নরলীলার প্রধান অনুষ্ঠান-ক্ষেত্র এবং গুরু-শিষ্যের পবিত্র মিলন-ভূমি।

আর একদিন তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি বেশীক্ষণ রামকৃষ্ণের কথা বলিতে বা ভাবিতে পারিনা; অভিভূত হইয়া পড়ি। তাই আমি আমার মধ্যকার ভক্তির এই প্রবল উচ্ছাসকে কেবলই চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছি, তাই যখনই আমি দেখি যে ভক্তির ভাবগুলিই উপরের দিকে উঠিয়া আমাকে টলাইয়া দিতেছে, তখনই সেগুলিকে আমি কঠিন আঘাত দিই। তখন কঠোর জ্ঞানের সাহায্যে নিজেকে অটল করিয়া তুলি।" ইহাতেই বেশ বুঝিতে পারা যায় তিনি ভক্তিভাবে বিশেষ পূর্ণ ছিলেন। শুধু শ্রীরামকৃষ্ণ কেন, পরবর্তীকালে সকল দেবদেবী ও তীর্থদর্শনে এবং বেলুড় মঠে প্রতিমা-প্রভৃতি পূজানুষ্ঠানেও তাঁহার গভীর ভক্তিভাব প্রকাশিত হইয়া পড়িত। শ্রীরামকৃষ্ণ সান্নিধ্যে আসিয়া শুধু যে নরেন্দ্রনাথই বিবেকানন্দে রূপায়িত হইয়াছিলেন তাহাই নহে। তৎকালীন বিভিন্ন মনীষীও তাঁহার উদার মহৎ ভাবে নিজদিগকে রঞ্জিত করিয়া জীবনের গতি নূতন পথে

পরিচালনা করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র প্রমুখ সমাজ সংস্কারক নেতাগণও তাঁহার প্রভাবে 'মত ও পথ' নূতন আদর্শে ঢালিয়া সাজাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব প্রতক্ষ্যভাবেই নেতৃস্থানীয়গণের মাধ্যমে সমাজ জীবনে পরিব্যাপ্ত হইয়া তাঁহার আরব্ধ কার্যের সূচনায় লোকসংগ্রহে বিবেকানন্দ প্রভৃতির ন্যায় আত্মত্যাগী আদর্শবাদী যুবকগণকে দক্ষিণেশ্বরে একত্রীকরণে সহায়তা করিয়াছিল সন্দেহ নাই। আবার বহুক্ষেত্রে তাঁহার প্রভাব সংস্কারক নেতাগণকে তাঁহাদের সঙ্কীর্ণ দলীয় আদর্শ হইতে মুক্ত করিয়া আত্মোন্নতির পথে, বৈরাগ্যের পথে প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছিল।

ধর্ম-ইতিহাসে দেখা যায় যে উপযুক্ত গুরু-শিষ্য সম্মিলনে নবযুগ প্রবর্তিত হইয়া অশেষ লোক-কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। এইজন্যই ধর্ম জগতে উপযুক্ত গুরু ও শিষ্য একান্তভাবেই আবশ্যক হইয়া থাকে এবং শ্রীগুরুর সহিত শিষ্যের যে নিঃস্বার্থ ভাব-ভালবাসা-যুক্ত প্রেম সম্বন্ধ তাহা একান্তভাবেই প্রয়োজনীয়। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে শিষ্যের কল্যাণের জন্য যেরূপ ঐকান্তিক কামনা দেখা যাইত তাহা অন্যত্র কদাচিৎ দেখা যায়। যুবক নরেন্দ্রনাথের জন্য এবং অপরাপর ত্যাগী শিষ্যগণের জন্য তাঁহার 'জগজ্জননীর' নিকট কাতর প্রার্থনা ও শিষ্যগণের অদর্শনে অশ্রুবিসর্জন যে গভীর ভাবের দ্যোতক কে তাহার ইয়ত্তা করিতে সমর্থ হইবে? শুধু যে ত্যাগী যুবকগণের জন্যই তাঁহার ব্যাকুলতা লক্ষিত হইত এমনও নহে, গৃহী ভক্তগণের জন্য, বিভিন্ন ভাবের সাধকগণের আত্মোন্নতির জন্যও আগ্রহের অভাব ছিল না। সব মতের, সব পথের সাধকগণের জন্যই তিনি অপেক্ষা করিয়া থাকিতেন এবং ভাবানুযায়ী সকলকে ধর্মোপদেশ দিয়া সমন্বয়ের উদারভাবে গঠিত করিতেন।

প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে ধর্ম-সমন্বয়ের ইঙ্গিত থাকিলেও শ্রীরামকৃষ্ণ

কর্তৃক উপলব্ধ হইয়া ঐ তত্ত্ব বর্তমান যুগকে যতখানি প্রভাবিত করিয়াছে, ইতিপূর্বে মানুষের জীবনে অনুপলব্ধ থাকার জন্য উহা কখনও সমাজ-জীবনে ততখানি প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয় নাই। স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ ভাবধারা প্রচারের সর্ব-প্রধান ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইলেও তাঁহার উপর অপরাপর অবতার-কল্প মহাপুরুষগণের প্রভাবও বেশ পরিলক্ষিত হয়। আজীবন তিনি শ্রীবুদ্ধের ও আচার্য শঙ্করের অনুরাগী তো ছিলেনই, শ্রীচৈতন্য, রামানুজ, নিম্বার্ক, মাধ্ব প্রভৃতি যুগাচার্যগণের প্রতিও তিনি সমান শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্য-রূপে তাঁহার মধ্যে যে সমন্বয়ভাব তথা হৃদয়বত্তা, ধীসম্পন্নতা ও পরক্লেশে গভীর বেদনাবোধ প্রভৃতি মহৎ চিত্তবৃত্তিসমূহ বিকশিত হইয়াছিল তাহা ঐ সকল মহাপুরুষগণের সম্মিলিত শক্তি সমন্বয় বলিলেও অত্যুক্তি করা হইবে না। সেইজন্যই বলিয়াছিলাম শ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যানে বিবেকানন্দের মধ্যে সর্বভাবের পরিপূর্তি হইয়াছিল; এবং বিবেকানন্দের মধ্য দিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইয়া সমাজ-জীবনের সহিত ধর্ম-জীবনের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ স্থাপিত করিয়াছে। তিনি ধর্ম ও সমাজকে পৃথক দৃষ্টিতে কখনও ভাবিতে পারেন নাই এবং এইজন্যই ধর্মচেতনার মাধ্যমে সমাজের উন্নতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। শ্রীবুদ্ধ-অনুগামী ধর্মাশোক যেমন ভারতের বহির্দেশে ধর্মপ্রচারে বিপুল স্বার্থকতা লাভ করিয়াছিলেন, তৎপর কয়েক শতাব্দী অন্তে শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্য বিবেকানন্দও তেমনই সনাতন হিন্দুধর্মের অদ্বৈত বেদান্ত অমিতবীর্যে ভারতেতর দেশে প্রচারাদি করিয়া বিশেষ সাফল্য লাভ করেন। এবিষয়ে সফলতার গৌরবও তাঁহারই নিজস্ব। বৌদ্ধযুগ ভারত-বহির্ভূত দেশ সমূহের সহিত ভারতের ভাব বিনিময় ঘটাইয়াছিল। উহার ফলেই ঐ যুগ সর্বদিক দিয়া উন্নত হইয়াছিল এবং কি শিল্পে, কি বিজ্ঞানে, কি রাষ্ট্রে, কি কলা-

কৌশলে, সর্ববিষয়ে উহা পূর্বতন যুগগুলিকে ম্লান করিয়া দিয়াছিল। এইজন্য স্বামীজি মহারাজ বলিয়াছিলেন, "কোন জাতি অপর জাতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, আদান-প্রদান রহিত হইয়া বাঁচিতে সমর্থ হয় না, প্রচার ও বিনিময়ই জীবনের চিহ্ন।"

পৃথিবীর মানুষের জন্য মহাপুরুষগণের যে ভালবাসাপূর্ণ করুণা কোনক্রমেই তাহার বর্ণনা সম্ভব নহে। তাঁহারা নিঃস্বার্থ ভালবাসার ফল্গুধারা। স্বামীজি মহারাজের একটি একান্ত অনুগত শিষ্য বলিয়াছিলেন—"নরেন দত্তের পিরিতে পড়ে এসেছি! সাফ্ কথা! তাঁর সবটাই প্রেমময়—ভালবাসা জমাট।" শ্রীশ্রীঠাকুরের ভালবাসা অনুগ্রহে নাট্যসম্রাট গিরীশচন্দ্র শেষজীবনে দেবোপম চরিত্র সম্পদের অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি একদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে বসিয়া বলিয়াছিলেন "মশাই, কি বলবো। আপনাকে চিন্তা করে আমি কি ছিলাম কি হয়েছি।" সত্যই ভালবাসায় মানুষকে দেবতা করে, অমৃত প্রদান করে। বেলুড় মঠের প্রাচীন বহু সাধু সন্ন্যাসীগণের নিকট শুনিয়াছি তাঁহারা মহাপুরুষগণের ভালবাসাতেই গৃহকে খড়কুটার ন্যায় ত্যাগ করিয়া বাল্যকালেই সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। কথাগুলি যে অতি সত্য তাহা আমরা নিজ জীবনেও প্রত্যক্ষ করিয়াছি। মহাপুরুষদিগের অহেতুকী ভালবাসার একটি ঘটনা এইস্থানে বিবৃত করিতেছি। একদা শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম অন্তরঙ্গ সন্তান মহাপুরুষ মহারাজ স্বামী শিবানন্দের নিকট কাজ-কর্মের তিক্ততা লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম, বলিলাম "মহারাজ, আমি মঠে থাকবো না, আপনি আদেশ করুন, আমি অন্যত্র চলে যাই।" তিনি বলিলেন—"তুমি যখন আমার আদেশের অপেক্ষা না করেই স্থির করে ফেলেছ থাক্‌বে না, তখন আর আমার বলবার কি আছে?"—আমি অপ্রস্তুত হইয়া চলিয়া আসিতে উদ্যত হইলে নাম ধরিয়া ডাকিলেন, বলিলেন "বাবা, কোথায় যাবি একটা কাঠের শুক্‌নো মালা নিয়ে? এমন

গুরু-গঙ্গা সাক্ষাৎ ঠাকুরের স্থান ছেড়ে কোথায় যাবি ? বুঝিস না—তোদের কত ভালবাসি ! ঠাকুরের সাক্ষাৎ সন্তানদের ছেড়ে, এত সব সাধুদের সঙ্গ ছেড়ে কিনা বাইরে যাবি ! বাইরে যাবার ঢের সময় পাবি আমাদের আর পাবি না। খবরদার —য়াসনি !" কথাগুলি এমন মধুমাখা দরদ দিয়া বলিয়াছিলেন যে আজিও মর্মে মর্মে অনুভব হইতেছে। কল্যাণ-কামনায় ইহাই তো যথার্থ ভালবাসা, এখানে আইন নেই, নিয়ম নেই, শাসন নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রবর্তিত সঙ্ঘ প্রেমের সূত্রেই গ্রথিত হইয়া উঠিয়াছিল। এমন কি সঙ্ঘ পরিচালনের কঠিন দায়িত্বও ঐ ভালবাসার দ্বারা নিয়মিত হইতে দেখিয়াছি। মিশনের কর্মিগণের প্রতি সঙ্ঘ-নায়ক মহাপুরুষ মহারাজ যখন কোন নির্দেশ প্রদান করিতেন তাহাও কত মধুর, কত প্রীতির স্নেহের আবেদনে ভরা থাকিত তাহার নিদর্শন একখানি পত্রের অংশ-বিশেষের উদ্ধৃতি হইতে বুঝিতে পারা যাইবে।—"তোমাদের সকলকে লইয়াই শ্রীশ্রীস্বামীজির প্রবর্তিত প্রভুর এই সঙ্ঘ এতকাল ধরিয়া নবযুগ প্রবর্তক স্বামীজির অভিষ্টানুযায়ী কাজ করিয়া দেশের সমাজের ও তোমাদের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়া আসিতেছে, এবং আমার স্থির বিশ্বাস আরও দীর্ঘকাল ধরিয়া করিতে থাকিবে। "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়চ" তোমরা সকলেই শ্রীশ্রীপ্রভূর পদে বলি প্রদত্ত। তোমাদের সমগ্র জীবন তাঁর। শরীর, মন, প্রাণ, কল্যাণ, উন্নতি অবনতি সব তাঁর শ্রীপদে সমর্পণ করিয়া তোমরা সন্ন্যাসী। প্রভুর কৃপায় তোমরা মুক্ত। বিশ্বাস কর, শ্রীশ্রীপ্রভুর কাজে কায়, মন, প্রাণ, ঢালিয়া দেওয়া ছাড়া তোমাদের অন্য কর্তব্য নাই। এমন অবস্থায় শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজির কাজের জন্য যদি শত ব্যক্তিগত অসুবিধাও ভোগ করিতে হয় তাহাতে নিশ্চয়ই তোমাদের বিন্দুমাত্রও দ্বিধা নাই, ইহাই আমার দৃঢ় ধারণা।

সমগ্র জগতের দুঃখ-দৈন্য শোক-তাপ, অজ্ঞতা ও অন্ধতার গুরুদুঃখভার নিজ বিশাল হৃদয়ে অনুভব করিয়া স্বামীজি খেটে খেটে শরীরটা পাত করে গেলেন। তাঁর আশা ছিল তোমাদের উপর। তিনি ত্যাগ ও সেবার নূতন আদর্শে ভাবী কর্মীদিগকে তাঁর সিদ্ধ সঙ্কল্পের দ্বারা দীক্ষিত করিয়া গিয়াছেন, তোমরা তাঁরই বিশাল ভাবের উত্তরাধিকারী। সুতরাং তাঁর আরব্ধ কাজ সর্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া সম্পন্ন করিবার ভার তোমাদেরই উপর ন্যস্ত। * * * তোমরা থাকিতে শ্রীশ্রীপ্রভুর কাজ বিস্তারলাভ না করিয়া সঙ্কোচ প্রাপ্ত হইবে, ইহা আমি বিশ্বাস করি না। পত্র দ্বারা সকল সংবাদ বিস্তারিত জানান অসম্ভব। মোটের উপর তোমরা সকল অসুবিধা অগ্রাহ্য করিয়া এবং নিজের স্বার্থের দিকে না চাহিয়া কাজে না লাগিলে তোমাদেরই সমূহ ক্ষতি। আমি তোমাদিগকে ব্যক্তিগতভাবে বিশেষ করিয়া বলিতেছি। শ্রীশ্রীপ্রভুর এই সঙ্ঘ ও বিশেষ করিয়া তোমরা শ্রীহীন ও সঙ্কুচিত হইবে, ইহা কি তুমি চাও ?

যদি না চাও তবে আমি সকল প্রকার আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছার সহিত শ্রীঠাকুর ও স্বামীজির নামে আহ্বান করিতেছি, এসো, প্রভুর কাজে সঙ্ঘের নিয়োগে লেগে যাও, তোমার অশেষ কল্যাণ হইবে। আমি বলিতেছি বিশ্বাস কর, কোন প্রকার দ্বিধা বা সঙ্কোচ না রেখে শ্রীশ্রীপ্রভুর এই যুগচক্র প্রবর্তনের সহকারী হইয়া ধন্য ও কৃত-কৃতার্থ হও।" ইহাই হইল মহাপুরুষগণের কর্মী নিয়ন্ত্রণের আহ্বান। কে ইহার বিরুদ্ধাচারণে অগ্রসর হইবে ? শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের আর এক দিকপাল স্বামী সারদানন্দ মহারাজ পত্রে লিখিয়াছেন—"আইন দ্বারা, শাসনদ্বারা, অনুশাসন দ্বারা, কোন প্রতিষ্ঠান চলিতে পারে না—কেবলমাত্র প্রেম প্রীতি ও ভালবাসার দ্বারাই সকল কার্য সম্পন্ন হইতে পারে।" শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রেমের

ছোঁয়াচ ইঁহাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ অনুভূত হইয়াছে। এই ভালবাসার প্রেরণাতেই তখনকার দিনে ভদ্রঘরের যুবকবৃন্দ সংসারের মায়া-মোহ অক্লেশে জয় করিয়া চরিত্রে, আচরণে দেবত্বলাভ করিতে পারিয়াছিলেন। যে বয়সে সাধারণ যুবকগণ খেলিয়া বেড়ায় ও বন্ধুবর্গের সহিত বাচালতায় প্রমত্ত হইয়া কালক্ষেপন করে, সেই বয়সে ইঁহারা অন্তর্জগতের নিগূঢ় তত্ত্ব নির্ণয়ের জন্য কঠোর তপশ্চর্যায় নিযুক্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ-সমুদ্র মন্থন করিয়া নরেন্দ্রনাথ যে অমৃত আহরণ করিয়াছিলেন তাহাই বিশ্ববাসীকে মুক্তহস্তে দান করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার সহকারী, সহযোগীরূপে যে গুরুভ্রাতাগণ দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন তাঁহারাও তাঁহাদের উর্বর হৃদয়-মস্তিকের উৎকৃষ্ট ফসলগুলি জগতের কল্যাণের জন্য অকাতরে দান করিতে কার্পণ্য করেন নাই। এই দেওয়া নেওয়ার জন্যই তো ঈশ্বর পার্ষদগণ যুগে যুগে ধরায় নামিয়া আসেন। তাঁহারা ভক্তিগ্রহণ করেন—মুক্তি প্রদান করেন। জন্মমৃত্যুর হস্ত হইতে আর্তগণকে ত্রাণ করেন, মুক্ত করেন। দৈবক্রমে এই সকল পূণ্যশ্লোক, হৃদয়বান, ক্ষমাশীল, অবতারকল্প, মহাপুরুষগণের সংস্পর্শে আসিলে, বা তাঁহাদের সাহচর্য লাভ করিলে পাপিষ্ঠ ব্যক্তিগণেরও চরিত্র পরিবর্তিত হইয়া যায়, জীবন নূতনপথে পরিচালিত হইতে আরম্ভ হয়।

যুবক নরেন্দ্রনাথ প্রথমে ঠাকুরের অনেক কথাই নিঃসংশয়ে মানিয়া লইতে না পারিলেও পরবর্তীকালে তাঁহার সকল বাণীর যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন—"শিব শক্তি অভেদ" "পুরুষ প্রকৃতি অভেদ" "ব্রহ্ম ও তাঁর শক্তি অভেদ", কিন্তু নরেন্দ্রনাথ প্রথমে তাঁহার ঐ সকল কথা ঠিক ঠিক তত্ত্বানুসন্ধানপূর্বক গ্রহণে অপারগ হন এবং এইজন্য শ্রীশ্রীকালীকেও শক্তি বলিয়া মানিয়া লইতে পারেন নাই। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি বলিয়াছিলেন—"ওঃ! মা কালী ও তাঁর লীলা-সকলকে

আমি কি ঘৃণাই কর্‌তুম। ছ'বৎসর ধরে আমি ঐ নিয়ে ধ্বস্তা-ধ্বস্তি করেছি, কিছুতেই তাঁকে মান্‌ব না, কিন্তু শেষে আমাকে মান্‌তেই হল। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস আমাকে তাঁর কাছে উৎসর্গ করেছিলেন। আর এখন আমি বিশ্বাস করি যে, অতি সামান্য সামান্য কাজেও সেই মা-ই আমাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, আমাকে নিয়ে যা ইচ্ছা তাই কর্‌ছেন! —তবু আমি বহু দিন ধরে তাঁকে মানব না বলে জেদ করেছিলুম। আমি ঠাকুরকে ভালবাসতুম কিনা, তাই ছাড়তে পারলুম না। আমি তাঁর অদ্‌ভূত পবিত্রতা প্রত্যক্ষ কর্‌লাম। তাঁর অসাধারণ ভালবাসা প্রাণে প্রাণে বুঝ্‌লাম।—তিনি যে কত বড় ছিলেন, তা তখনও আমার ধারণা হয়নি। সে সব পরে হয় যখন আমি বশ্যতা স্বীকার করেছি। সে সময়ে আমি তাঁকে এক মাথা-পাগলা কচি ছেলে বলে মনে করতুম, ভাব্‌তুম কেবল কি কতগুলো খেয়াল দেখ্‌ছেন। আমি এসব ঘৃণা করতুম। কিন্তু শেষে আমাকেও মা কালীকে মান্‌তেই হল।" আবার ইহাও বলিয়াছেন "ব্রহ্মই একমাত্র সৎ পদার্থ, তিনি অদ্বিতীয়, কিন্তু তিনিই আবার দেবদেবী হইয়াছেন।" এইভাবে তাঁহার আদর্শ ও চরিত্র প্রভাবে দ্বৈত-অদ্বৈত-বাদ এক অপূর্ব মহিমায় উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। তেমনই গুরু-শিষ্য উভয়ের সম্মিলনে ব্রাহ্মণের ক্ষমা, দয়া, ধৃতি ও ক্ষত্রিয়ের বলবীর্য, ন্যায়-নিষ্ঠা নরেন্দ্রনাথে একীভূত হইয়াছিল। তিনি ধর্মের প্রকৃত যোদ্ধা, ধর্মের বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়া যশস্বী হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার ত্যাগী সন্তানদিগের নিকট স্পষ্ট ভাবেই এই কথা বলিয়াছিলেন যে, সমগ্র মনুষ্যজাতির প্রতি তাঁহাদের এক মহান কর্তব্য রহিয়াছে এবং তিনি নিজ জীবনে ঐ কর্তব্য সম্পাদনের সূচনা করিয়া যাইতেছেন। তিনি বলিতেন— "মানুষের ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। তুমি ভগবানকে খুঁজিতেছ? বেশ তো, মানুষের মধ্যেই সন্ধান কর। ভগবান

নিজকে মানুষের মধ্যে যেমন প্রকট করিয়াছেন, তেমনটি আর কিছুর মধ্যে করেন নাই। ভগবান সর্বভূতে আছেন সত্য। তবে তাঁহার শক্তি অন্যান্য বস্তুতে কমবেশী প্রকট হইয়াছে। ভগবান মানুষের মধ্যে রূপলাভ করিয়া রক্তমাংসে আপনার শক্তিকে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রকাশ করিয়াছেন। মানুষ ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ।" তাঁহার এই অনুশাসনই স্বামীজি মহারাজের মধ্যে 'নরনারায়ণ' সেবায় মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। স্বামীজির-হৃদয় বিশাল ও দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ ছিল বলিয়াই তাহাতে মানবের যাবতীয় দুঃখরাশি প্রতিবিম্বিত হইত। কাজেই তিনি অপরের দুঃখ এমন করিয়া অনুভব করিতে পারিতেন। সর্ব-লোকের আত্মাতেই নিজের আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিতেন বলিয়াই সকল জীবের দুঃখ নিবৃত্তির জন্য নিজের দেহ মন সমর্পণ করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নাই। এই পরদুঃখ-কাতরতা স্বামীজি মহারাজের হৃদয়কে সত্যই ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিয়াছিল; সে দুঃখের ক্ষত তিনি সারাজীবন বহন করিয়া গিয়াছেন। বলিতে গেলে শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে কর্মযোগের বীজই কেবলমাত্র সঞ্চিত ছিল, কর্মের চাঞ্চল্য তাঁহার মধ্যে কিছুমাত্র লক্ষিত হইত না। কিন্তু স্বামীজি মহারাজের মধ্যে শেষ-জীবন পর্যন্ত কর্মের আবেশ, উৎসাহ, পরদুঃখ-কাতরতা সমভাবেই বর্তমান ছিল। মনুষ্যমাত্রকেই যে ঈশ্বর-বোধে, শিববোধে সেবা এবং জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সকলের মধ্যেই আত্মদর্শন, ঈশ্বর উপাসনারই একটা শ্রেষ্ঠ পথ ইহাও তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। মনীষী রোঁমা রোঁলা এ বিষয়ে একটি সুন্দর চিত্র তাঁহার রচিত পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—"ভগবান মানুষের রূপেই আবির্ভুত হন। মানুষের মধ্যে যে ভগবান রহিয়াছেন, তাহাকে যদি কেহ ভাল না বাসে, তবে সে মানুষকে প্রকৃত ভালবাসিতে পারে না, সুতরাং তাহাকে সাহায্যও করিতে

পারে না। সেইসঙ্গে একথাও ঠিক যে, প্রতেকে মানুষের মধ্যে ভগবানকে প্রত্যক্ষ না করিলে কেহ কখনও ভগবানকেও প্রকৃত জানিতে পারে না।" পরবর্তীকালে স্বামীজি মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ-প্রণোদিত হইয়া যে সকল মানব কল্যাণের সেবা-প্রতিষ্ঠানাদি গঠন করিয়াছেন নিঃসন্দেহে তাহা একটি শ্রেষ্ঠ অবদান। এই মহান আচার্যের কর্ম-জীবনে সকলেই শুনিয়াছেন—"যদি ভাল চাও তো ঘণ্টা-ফণ্টাগুলোকে গঙ্গার জলে সঁপে দিয়ে সাক্ষাৎ ভগবান দেহধারী নারায়ণ হরেক মানুষের পূজো করগে বিরাট আর স্বরাট।" শ্রীরামকৃষ্ণের মানবিকতা সর্বতোভাবে বিবেকানন্দের মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করিয়া মানবের জন্য তাঁহাকে ভাবাইয়া তুলিয়াছিল। তাই তিনি বলিয়াছেন—"যে ধর্ম বা ঈশ্বর বিধবার অশ্রুমোচন বা পিতৃমাতৃহীন অনাথের মুখে এক টুকরা রুটি দিতে পারে না আমি সে ধর্মে বা সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করিনা; তাহা যত সুন্দর মতবাদই হউক, যত গভীর দার্শনিক তত্ত্বই উহাতে থাকুক, যতক্ষণ ইহা মত বা পুস্তকেই আবদ্ধ, ততক্ষণ উহাকে আমি ধর্ম নাম দিই না।" একদা শ্রীনরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট নিজের মুক্তি এবং মানবজীবনের চরম ও পরম অবস্থা নির্বিকল্প সমাধি ব্যতীত কিছুই প্রার্থনা করেন নাই; এমন কি যোগের দ্বারা লব্ধ অষ্ট প্রকারের বিভূতিসকলও দৃঢ়তার সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য প্রভাব তাঁহার অজ্ঞাতসারেই তাঁহাকে স্বীয় মুক্তির এই তীব্র আকাঙ্খা হইতে মুক্ত করিয়া জনকল্যাণের পথে পরিচালিত করিয়াছিল। প্রথমে তিনি নিজেও ইহা অবগত হইতে পারেন নাই; তাই প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছিলেন—"তাঁহার চোখের একটি মাত্র চাহনি একটা মানুষের সমস্ত জীবনকে বদলাইয়া দিতে পারিত।"

চার

॥ আলমবাজার মঠ ও পরিব্রাজক ॥

দক্ষিণেশ্বর মহাশ্মশান-বেদীমূলে "জাগ জাগ" বলিয়া 'বহুজন-হিতায় বহুজন সুখায়' যে মহাশক্তির উদ্বোধন শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছিল, ঐ চৈতন্য-শক্তি তিনি তাঁহার সুযোগ্য শিষ্যবৃন্দের অন্তরে প্রবিষ্ট করাইয়া ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট লীলা সংবরণ করিলে নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ত্যাগী শিষ্যবৃন্দ শ্রীগুরু-প্রদত্ত গৈরিক বসন মস্তকে ধারণপূর্বক সন্ন্যাসের বিরজা-হোম অনুষ্ঠান করিয়া সংসারের সকল আসক্তি বিসর্জনে ও ত্যাগের মহামন্ত্রে ব্রতী হইয়াছিলেন।

কাশীপুর উদ্যান-বাটী ছাড়িয়া দিয়া যাহাতে গৃহত্যাগী যুবকবৃন্দ স্বল্পব্যয়ে একত্রে থাকিয়া সাধন-ভজনে কাল কাটাইতে পারেন এই উদ্দেশ্যে আলমবাজারস্থিত একটি পুরাতন বাটী অল্পভাড়ায় সংগৃহীত হইল এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের গৃহী শিষ্য শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় উক্ত গৃহের ভাড়া বহনে স্বীকৃত হইলেন। আলমবাজারের এই জীর্ণ পুরাতন বাটীখানিতেই বর্তমান বেলুর মঠ ও মিশনের "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" ভাবী কর্মকাণ্ডের সূচনা হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের অন্যতম প্রধান স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ এই বাটীতেই ঠাকুরের পূতাস্থি এবং আলেখ্য স্থাপন করিয়া নিত্য সেবাপূজার প্রবর্তন করেন। এই নবীন সন্ন্যাসী-সন্তানদিগের ধারণা হইল "ঈশ্বর লাভই জীবনের উদ্দেশ্য।" কাজেই দিনরাত্রি যে যাহার ভাবে কঠোর তপস্যায় নিরত হইলেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজই তখন এই সঙ্ঘের জননীরূপে সকলকে ধ্যান ভজনাদি

হইতে ক্ষণিকের জন্য বিরত করাইয়া ভিক্ষালব্ধ সামান্য অন্ন ডাল-সহযোগে ভোজন করাইয়া তাঁহার প্রিয় গুরুভ্রাতাগণের শরীর রক্ষার সহায়তা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মুখে শুনিয়াছি—"যদি শশী মহারাজ না থাকিতেন তবে আজ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ অনেক মহান ব্যক্তিকেই হারাইতেন।" তখন শ্রীরামকৃষ্ণদেব সবেমাত্র দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার ত্যাগ, তপস্যা এবং ঈশ্বরানুভূতি সন্তানগণের মনে তীব্রভাবে জাগরূক। স্বামীজি মহারাজও গুরুভ্রাতাগণকে প্রবল উৎসাহে আত্মোপলব্ধির ইন্ধন যোগাইতেছিলেন এবং বিভিন্ন শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন-আলোচনার দ্বারা সকলকে শাস্ত্রের মর্মার্থ স্মরণ করাইয়া দিতেছিলেন। একমাত্র কৌপীন সম্বল করিয়া উন্মুক্তদেহে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সকলের ধ্যান-ভজন চলিত। শরীর যায়—তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না! যদি ঈশ্বর লাভ না হইল তবে শরীর দিয়া কি হইবে? এমন অবস্থা হইল যে লজ্জা নিবারণের জন্য সকলের মাত্র একখানি বস্ত্রের উপর নির্ভর করিতে হইত। কোন দিন হয়ত আহার জুটিত কোন দিন হয়ত কিছুই জুটিত না। কিন্তু তাহাতে কাহারও বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নাই; ধ্যান-বিঘ্ন না ঘটিলেই নিশ্চিন্ত। আবার যে দিন আহার জুটিত, সকলে সমবেত হইয়া কচুপাতে রক্ষিত অন্ন এবং মধ্যস্থলে ডাল নামক লঙ্কা-জলের পাত্র রাখিয়া গোলাকারে বসিয়া মহানন্দে ভোজন করিতেন। আহারে-বিহারে কোন খেয়ালই নাই ব্রহ্মানুভূতিতে সব আনন্দময়। শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তান স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের শ্রীমুখে শুনিয়াছি—"এমন দিন গিয়াছে, শশী মহারাজ ভিক্ষা করিয়া যাহা কিছু সংগ্রহ করিতেন তাহা পর্যাপ্ত ছিলনা, তাহাই তিনি রন্ধন করিয়া আমাদের সকলকে ডাকিয়া আহার করাইতেন। বাসনপত্র কিছুই ছিল না কাজেই কচুপাতা সংগ্রহ করিয়া তাহাতে ঢালিয়া লইতেন। আবার ঐ ভাতের মাটির হাঁড়িটিতেই ডাল তেলাকুচা-পাতা লঙ্কা নুন সহযোগে সেদ্ধ করা হইত। তাহা আবার এমন

ঝাল যে একটুতেই ভাতের গ্রাস গিলিয়া ফেলিতে হইত। তা ব'লে এতেই কিন্তু আমরা মহানন্দে কাল কাটাইতাম। ধ্যান-ভজনে কোথাদিয়া সময় চলিয়া যাইত বুঝিতেই পারিতাম না। ঐ সময় স্বামীজি বেদান্তের চর্চা খুব করিতেন। আহারের সময়ে সকলের উপস্থিতিতে আনন্দের রোল উঠিত।" ঐ আলমবাজার মঠের কথা উঠিলে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ রহস্য করিয়া বলিয়া-ছিলেন "তখন তেলাকুচাপাতার ঝোল জুটত না, আর এখন 'শালারা' খুব দিচ্ছে!" ঐ সময়ে:স্বামীজি মহারাজের শিক্ষায়, উৎসাহে এবং বৈরাগ্য-দীপ্ত জীবনালোকে সকলের মধ্যে এমন একটি আধ্যাত্মিক-শক্তি উদ্ভূত হইয়াছিল যাহা পরবর্তীকালে দেশের যুবশক্তিকে সেবা-মূলক সঙ্ঘবদ্ধ কর্মপ্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ করিয়া প্রত্যক্ষভাবে সমাজ-জীবনের তামসিকতা-প্রসূত পঙ্কিলতা বহুলাংশে বিদূরিত করিয়াছিল এবং পরোক্ষভাবে আসন্ন স্বাধীনতা-সংগ্রামের নির্ভীক বিপ্লবী সৈনিক-দিগের চরিত্র গঠনে সহায়তা করিয়াছিল।

আলমবাজার মঠকে কেন্দ্র করিয়া ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানগণ সঙ্ঘবদ্ধভাবে নিজ নিজ জীবন গঠন ও শাস্ত্রাদি অধ্যয়নে তৎপর হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বা ঈশ্বর লাভের জন্য ব্যাকুল অন্তরে তীর্থাদি ভ্রমণ ও একান্তে তপস্যা করিবার অভিপ্রায়ে অন্য গুরুভ্রাতাদের অজ্ঞাতে তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। স্বামীজি মহারাজ গুরুভ্রাতাগণের এই তীব্র বৈরাগ্যে বাধা প্রদান করিলেন না। বিশেষতঃ তাঁহারও ইচ্ছা একবার তীর্থাদিতে গিয়া নির্জন বাস ও নিঃসঙ্গভাবে তপস্যা করেন এবং ভারতের বিভিন্ন দেশ ও জাতির সংস্পর্শে আসিয়া মাতৃভূমির শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তিনিও সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে থাকিলেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের প্রথমদিকে তাঁহার মনে ঐ বাসনা তীব্রতর হইয়া তাঁহাকে আলমবাজার মঠ ত্যাগে বাধ্য করিল। তিনি পদব্রজে গয়া কাশী প্রভৃতি স্থান দর্শন এবং তৎকালীন স্বনামধন্য সাধু

মহাত্মাগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কাশীতে অবস্থানকালে তিনি কঠোর তপস্যায় ব্রতী ছিলেন এবং অবসর সময়ে বিভিন্ন সাধু বিশেষতঃ শ্রীমৎ ত্রৈলঙ্গ স্বামী ও শ্রীমৎ ভাস্করানন্দ স্বামীর সহিতও সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। এইভাবে কিছুদিন আনন্দে কাটাইয়া তিনি সহসা আলমবাজারে গুরু-ভ্রাতাগণের মধ্যে ফিরিয়া আসিলেন। পুনরায় তাঁহার প্রভাবে প্রবল আনন্দের মধ্যে শাস্ত্রাদি চর্চা ও ধ্যান-ভজনে সকলে মাতিয়া উঠিলেন। স্বামীজির ত্যাগ-মণ্ডিত বাণী সকলকে প্রেরণা যোগাইত। আবার ঐ সময়েই তাঁহার মনে ভারতের দুঃখ-দুর্দশার চিত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল এবং কি ভাবে কি উপায়ে জাতীয় জীবনের কালিমা ধৌত করা যায় এই চিন্তা তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। সম্ভবতঃ এই মহৎ কার্য সমাধার জন্যই তিনি সহসা গুরুভ্রাতাগণের মধ্যে ফিরিয়া তাঁহাদিগকে সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য চেষ্টিত হইয়াছিলেন। কারণ কাশী প্রভৃতি স্থান হইতে ফিরিয়া আসিয়াই গুরুভ্রাতাগণকে বলিয়াছিলেন—"ভারতবর্ষকে দেখিতে হইবে, বুঝিতে হইবে। এই লক্ষ কোটি নরনারীর জীবনযাত্রার বিভিন্ন স্তরে যে বেদনা, যে অভাবের অব্যক্ত ক্রন্দন অহরহঃ উত্থিত হইতেছে তাহার ভাষা বুঝিতে হইবে, ইহাদের কল্যাণব্রতের সাধনা শুধু স্বার্থত্যাগের কথা নহে, সর্ব-ত্যাগের কথা। এমন কি স্বীয় মুক্তির কামনা পর্যন্ত বিস্মৃত হইতে হইবে।" এইভাবে গুরুভ্রাতাগণের মধ্যে স্বার্থ-ত্যাগের উদ্দীপনা দিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের ত্যাগাদর্শে তাঁহাদের জীবন গঠনে যত্নপর হইয়া কিছুকাল মঠে বিশ্রাম ও সাধনায় কাটাইয়া পুনরায় তিনি ভারতের প্রধান প্রধান স্থান ও তীর্থাদি দর্শনে বহির্গত হইলেন। দণ্ড কমণ্ডলু মাত্র সম্বল করিয়া নগ্নপদে এই বীর সন্ন্যাসী ভারতের পবিত্র তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া বিভিন্ন প্রকারের ব্যক্তিবর্গের সংস্পর্শে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের দ্বারা জ্ঞান-ভাণ্ডার পূর্ণ

করিতেছিলেন। আবার কত ছোটখাট ঘটনার মধ্য দিয়াও ঈশ্বরের অদৃশ্য অনুগ্রহ প্রত্যক্ষ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। এই সময়কার কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিতেন—"প্রভূর দয়ার নিদর্শন ভূয়োভূয়ঃ এ জীবনে পেয়েছি। তিনি পেছনে দাঁড়িয়ে এসব কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। যখন ক্ষুধায় কাতর হয়ে গাছতলায় পড়ে থাক্‌তুম্ যখন কৌপীন আঁটিবার বস্ত্র ছিল না, যখন কপর্দ্দকশূন্য হয়ে পৃথিবী ভ্রমণে কৃতসংকল্প, তখনও ঠাকুরের দয়ায় সর্ব বিষয়ে সহায়তা পেয়েছি!" বাস্তবিক স্বামীজি মহারাজের এই আত্মবিশ্বাস ও শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি নির্ভরতা তাঁহাকে সর্ববিষয়ে সর্ব কার্যে সাফল্য আনিয়া দিয়াছিল। আলমবাজার মঠে সর্বদা বিভিন্ন শাস্ত্রাদি আলোচনা হইলেও তিনি ত্যাগের মহান আদর্শকেই বিশেষভাবে সকলের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতেন। "ত্যাগ ভিন্ন এই গভীর জীবন সমস্যার রহস্যভেদ কিছুতেই হইবার নহে। ত্যাগ-ত্যাগ-ত্যাগ, ইহাই যেন তোদের জীবনের মূলমন্ত্র হয়।—'একুল ওকুল দুকুল রেখে চল্‌তে হবে', এ পাগলের কথা, উন্মত্তের প্রলাপ, অশাস্ত্রীয় অবৈদিক মত। ত্যাগ ভিন্ন মুক্তি নাই। ত্যাগ ভিন্ন পরাভক্তি লাভ হয় না। ত্যাগ-ত্যাগ-'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়'। গীতায়ও আছে 'কাম্যানাং কর্মনাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।" এই ত্যাগের দীপ্ত প্রভায় মণ্ডিত হইয়াই তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন এবং বিভিন্ন প্রকারের রুচিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের সাহচর্যে ভারতের দুঃখ-দৈন্যের সহিত বিশেষ ভাবে পরিচিত হইতে পারিয়াছিলেন। যাহার ফলে তিনি বুঝিয়া ছিলেন ভারতের প্রাণকেন্দ্রে কোন্ দুর্বলতা বিরাজমান এবং কি উপায়ে এই জাতীয় দুর্বলতাকে চিরতরে বিদূরিত করা যায়। এই ভ্রমণকে কেন্দ্র করিয়া ভারতের আভ্যন্তরিক চিত্র দেখিতে বুঝিতে বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হইত কারণ যেখানেই তিনি অবস্থান করিতেন সেখানেই তাঁহার প্রতিভা ও জ্ঞান-

গরিমায় সর্ব-সাধারণ তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইয়া উঠিত। অবশ্য স্বামীজি মহারাজ একস্থানে বেশীদিন অবস্থান করিতেন না। প্রবল অনুসন্ধিৎসা তাঁহাকে সারাভারত ভ্রমণে নিযুক্ত রাখিয়াছিল। এইভাবে তিনি উত্তর হইতে দক্ষিণ, পূর্ব হইতে পশ্চিম, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশসকল ভ্রমণ করিয়া ধর্ম আচার রীতি নীতি প্রভৃতি বিশেষভাবে অনুধাবন করিলেন এবং মর্মে মর্মে বুঝিলেন যে ভারতকে সকলপ্রকার অজ্ঞতার মোহ-বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে হইলে ধর্মের মাধ্যমেই তাহা করিতে হইবে। তিনি লক্ষ্য করিলেন যে যদিও ভারতীয়গণ বিভিন্ন ধর্মমতাবলম্বী, তথাপি সকল ধর্মমতেই অন্তরঙ্গ সাধনার ভিত্তিভূমি বলিয়া গৃহীত নীতি বা শীল সমুদায় প্রায় অভিন্ন। তাঁহার সুদৃঢ় ধারণা হইল যে ধর্মের এই সাধারণ ভিত্তি-ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেই দেশ ও সমাজ প্রকৃত ঐক্য, সাম্য ও শান্তি লাভ করিতে পারে, অন্যথায় নহে। তাঁহার এই ধারণা কখনই ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয় নাই। প্রথমবার পাশ্চাত্য দেশসমূহ ভ্রমণান্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি জনসাধারণের সম্মুখে যে বাণী প্রদান করেন তাহাতেও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জাতীয় জীবনে এই ধর্মভিত্তির গুরুত্ব ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন "হিন্দুগণ ধর্মকেই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান বস্তু বলিয়া মনে করেন। আপনারা এক্ষেত্রে কোন বিখ্যাত রাজপুরুষ, যোদ্ধা অথবা ধনীর অভিনন্দন করিতেছেন না। একজন ভিক্ষুক সন্ন্যাসীর জন্য এই সকল আয়োজন। ইহাতে কি বুঝাইতেছে না যে, হিন্দুর মতিগতি কোন দিকে? যদি হিন্দুজাতি জীবিত থাকিতে চায়, তবে এই ধর্মকেই তাহার জাতীয় মেরুদণ্ড স্বরূপ গ্রহণ করিতে হইবে।" এই সুচিন্তিত অভিমতই স্বামীজি মহারাজের মনে রূপ-পরিগ্রহ করিতেছিল কিন্তু কি উপায়ে এবং পরিকল্পনায় তাহা মানব-জীবনে প্রতিফলিত করা সম্ভব তাহা তিনি ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। তবে ইহা নিশ্চিত যে তিনি

অন্তর হইতে প্রেরণা পাইয়া প্রস্তুত হইতেছিলেন এবং সুযোগের অপেক্ষায় কাল ক্ষেপণ করিতেছিলেন। দ্বিতীয়বার আলমবাজার মঠ হইতে ভ্রমণে বহির্গত হইয়া কাশী পরিত্যাগকালে বিশেষ তেজের সহিত তিনি বলিয়াছিলেন "যখন আমি ফিরিয়া আসিব, তখন সমাজের উপর বোমার মত ফাটিয়া পড়িব এবং সমাজ আমার অনুবর্তী হইবে।" ইহা সম্ভবতঃ ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের কথা ; তখনও তিনি পাশ্চাত্য দেশে গমন করেন নাই। তিনি যে জগদ্বাসীকে বিশেষতঃ ভারতবাসীকে একটা বিশেষ কিছু দিবার জন্যই আবির্ভূত হইয়াছেন এই দৃঢ় ধারণা তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল, কিন্তু কি উপায়ে সমাজে আন্দোলনের সূত্রপাত করিবেন তাহা তখনও স্থির করিতে পারেন নাই। অবিরাম ভ্রমণের ফলে এই সময় তিনি সামান্য অসুস্থ হইয়া পড়েন ; বিশেষতঃ পেটের গোলযোগে ভূগিতে থাকেন। স্বামীজি মহারাজ যখন ভ্রমণে ব্যাপৃত ছিলেন তখন কোনস্থানে একজন বিভূতিবান সাধুর সহিত তাঁহার শাস্ত্রাদি ও বিভূতি সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক হইয়াছিল। তর্কে পরাস্ত হইয়া উক্ত সাধু স্বামীজি মহারাজকে "পেটের পীড়ায় ভুগিবে" বলিয়া অভিসম্পাত প্রদান করেন। স্বামীজি মহারাজ কখনও কখনও এইরূপ মনে করিতেন হয়ত ঐ সাধুর অভিশাপের ফলেই তাঁহার পেটের গোলযোগ চলিতেছে। এই ঘটনার কিছুকাল পরে স্বামীজি মহারাজকে গাজীপুর পাওহারীবাবার নিকট অবস্থান করিতে দেখা যায়। ঐ সময়ে তাঁহার মনে দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল, শরীর যদি দৃঢ় সবল না হয় তাহা হইলে কোন কার্যই সুসম্পন্ন করা সম্ভব নহে। তিনি জানিতে পারেন যে গাজীপুরের এই পাওহারীবাবা যোগ-সাধনে সিদ্ধ। তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া যোগ-সহায়ে শরীরটাকে সুস্থ সবল করিয়া লইবেন মনে এই ইচ্ছা বলবতী হইলে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন এবং তাঁহার সম্মতি-লাভ করিয়া তৎকর্তৃক নির্দ্ধারিত দিনের

অপেক্ষায় তথায় অবস্থান করিতে থাকেন। কিন্তু যে দিন তিনি যোগশিক্ষার সংকল্প গ্রহণ করিলেন ঐ দিনই গভীর রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল; তিনি দেখিলেন দিব্য-জ্যোতিতে গৃহ আলোকিত-উদ্ভাসিত! সবিস্ময়ে দেখিলেন যে সেই জ্যোতি-মণ্ডলের মধ্যে তাঁহার উপর প্রসন্ন-দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন তাঁহারই গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ, নির্বাক নিস্পন্দ। ধীরে ধীরে মূর্তি শূন্যে মিলাইয়া গেল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—কি দেখিলাম, ইহা কি সত্য? চিত্তে আলোড়ন উঠিয়া রাত্রি কাটিয়া গেল। দিবসের ব্যস্ততায় আর ভাবিবার অবকাশ হইল না। কিন্তু পর পর তিন রাত্রি এইভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রত্যক্ষ করিয়া অন্তরে অনুভব করিলেন যে যোগ-শিক্ষা তাঁহার গুরুদেবের অভিপ্রেত নহে। তখন একে একে দক্ষিণেশ্বরের ঘটনা সকল তাঁহার মনে উদিত হইয়া যোগশিক্ষার বাসনা মন হইতে চিরতরে মুছিয়া দিল এবং নূতন নূতন ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণী স্মৃতিপথে উদিত হইয়া তাঁহাকে তৎসাধনে কৃতসংকল্পতার কথা স্মরণ করাইয়া দিল। তিনি গাজীপুর পরিত্যাগ করিলেন।

পুনরায় বিভিন্ন প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে আলোয়ার সহরে উপস্থিত হইয়া স্থানীয় মহারাজার আতিথ্যে কিছুদিন অবস্থান করেন। রাজ্যের দেওয়ান ও রাজা বাহাদুরের সহিত ঐ সময়ে তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব হইয়াছিল। তাঁহারা সকলেই স্বামীজি মহারাজের তেজোদীপ্ত প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনিও তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া বলিয়াছিলেন "মানব-জীবনের যে সকল মহা-সত্য ভারতীয় চিন্তানায়কগণ কর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহা সারা পৃথিবীতে ছড়াইয়া দেওয়া এবং পৃথিবীর প্রত্যেক জাতিকে প্রত্যেক জাতির প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ করিয়া এক সূত্রে গ্রথিত করা উচিত।"

দীর্ঘ চারি বৎসর ভ্রমন করিয়া শেষে তিনি দক্ষিণ ভারতের দক্ষিণ

প্রান্তভূমি কন্যা-কুমারীর শেষ প্রস্তর খানির উপর উপবিষ্ট হইলেন, পরিব্রাজকের সকল ক্লান্তি সকল শ্রান্তি বিদূরিত হইল। সমাহিত-চিত্ত স্বামীজি মহারাজের মনে দীর্ঘ দিনের আকাঙ্খিত সমাধির ধ্যান-তন্ময়তা জাগিয়া উঠিল। কিন্তু সহসা চিত্র-পটের ন্যায় একে একে বিগত কালের স্মৃতি-সমূহ তাঁহার মনে ফুটিয়া উঠিল, সর্বাপেক্ষা প্রোজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিল "জীব-কল্যাণ" ব্রত গ্রহণের জন্য তাঁহার প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশ এবং তাঁহার সশ্রদ্ধ প্রতিশ্রুতি। "আমি তাঁহার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, মহান কার্যভার আমার উপর ন্যস্ত, আমাকে কাজ করিতেই হইবে" এই চিন্তা মনে উদিত হওয়ায় সন্ন্যাসীর ত্যাগ তপস্যাপুত কোমল হৃদয় জীব-দুঃখে বিগলিত হইল, শ্রীগুরুর আশীর্বাদ স্মরণ করিয়া তিনি উত্থিত হইলেন। তিনি মাদ্রাজ সহরে ফিরিয়া আসিলেন। তথায় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া স্থানীয় শিক্ষিত যুবক ভক্ত ও সমাজপতিদিগের সহিত নানা বিষয়ে নিয়মিত আলোচনা আরম্ভ করিলেন। আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁহার প্রতিভার দীপ্তি বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। শত শত ব্যক্তি তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যে গুণগরিমায় মুগ্ধ হইয়া শিষ্যত্ব গ্রহণে কৃতার্থ বোধ করিলেন। চতুর্দ্দিকে তাঁহার খ্যাতি বিস্তৃত হইয়া পড়িতে লাগিল এবং যে স্থানেই তিনি উপস্থিত হইতেন তথায় ধর্ম, রাষ্ট্র, সমাজ প্রভৃতি বিষয় লইয়া আলোচনা সভা বসিত এবং স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁহার জ্ঞান-গরিমায় অনুরক্ত হইয়া উঠিতেন। পরবর্তীকালে পাশ্চাত্য দেশে গমনে ইঁহাদের দ্বারা প্রভূত সহায়তা হইয়াছিল, যদিও স্বামীজি মহারাজ বলিয়াছেন যে তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য দক্ষিণ ভারতান্তর্গত রামনাদ রাজাই সর্বপ্রথম তাঁহাকে পাশ্চাত্য দেশে যাইবার জন্য পরামর্শ দেন। যখন তিনি পাশ্চাত্য দেশ হইতে প্রথম বার ভারতে ফিরিয়া আসেন তখন রামনাদে অভিনন্দনের উত্তর প্রদানকালে রাজা ভাস্কর সেতুপতির নাম উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন "যদি আমার দ্বারা কিছু সৎ কার্য হইয়া থাকে, তবে তাহার

প্রত্যেকটির জন্য ভারত এই মহাপুরুষের নিকট ঋনী ; কারণ আমাকে চিকাগোয় পাঠাইবার কল্পনা তাঁহার মনেই প্রথম উদিত হয়। তিনিই আমার মাথায় ঐ ভাব প্রবেশ করাইয়া দেন এবং উহা কার্যে পরিণত করিবার জন্য আমাকে বার বার উত্তেজিত করেন।" এই রামনাদের মহারাজাই স্বামীজি মহারাজ পাশ্চাত্য দেশ হইতে আগমন করিয়া যে স্থানে প্রথম পদার্পণ করেন উক্ত স্থানে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থে একটি সুন্দর স্মৃতি-স্তম্ভ স্থাপন করিয়া দেন। স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ বাণী স্বামীজি মহারাজের দিগ্‌বিজয় ঘোষনা করে "পাশ্চাত্য দেশে স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্ত প্রচারে অপূর্ব সফলতা লাভের পর তাঁহার ইংরেজ শিষ্যগণের সহিত ভারতের যে স্থানে প্রথম পদার্পণ করেন, রামনাদের রাজা ভাস্কর সেতুপতি সেই স্থানে এই স্মৃতি স্তম্ভ নির্মাণ করিলেন।"

এই ভ্রমনকে উপলক্ষ করিয়া কত সন্দিগ্ধ চিত্ত ব্যক্তিকে তিনি ধর্মরে যথার্থ গূঢ় তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। যাহারাই তাঁহাকে পরীক্ষার অভিপ্রায় লইয়া যাচাই করিতে অগ্রসর হইয়াছেন তাহারাই তাঁহার যুক্তিপূর্ণ মীমাংসায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিয়া নিজদিগকে ধন্য মনে করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম শিষ্যও এই ভ্রমন কালেই উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি যখন বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া হাথরাস্ নামক রেল ষ্টেশনে বিশ্রাম ও পরবর্তী গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন ঐ সময়ে ষ্টেশন মাষ্টার তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে নিজ বাস ভবনে লইয়া যথোচিত সেবা-যত্ন করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন এবং স্বামীজি মহারাজ কয়েক দিবস তথায় বিশ্রাম ও বিবিধ ধর্ম প্রসঙ্গে শিষ্যের সংশয় ছিন্ন করিতে অন্যথা করেন নাই। যখন তিনি অন্যত্র যাইবার সংকল্প জ্ঞাপন করিলেন তখন অনুগত সেবক শ্রীশরৎচন্দ্র তাহাকে শিষ্য করিয়া সঙ্গে লইবার জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিলে স্বামীজি মহারাজ গম্ভীর হইলেন এবং গুণ গুণ স্বরে গান গাহিলেন "কান্ত যদি পেতে চাও, চাঁদ মুখে মাখ ছাই'—শরৎ চন্দ্র অমনি

কতগুলি ছাই মুখ মণ্ডলে লেপন করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া করজোড়ে বলিতে লাগিলেন, স্বামীজি, আমি আপনার আজ্ঞাবহ ভৃত্য, যাহা আদেশ করিবেন নির্বিচারে তাহাই পালন করিব। স্বামীজি মহারাজও শিষ্যের আন্তরিকতা দর্শনে মুগ্ধ হইলেন এবং তাহাকে পরীক্ষার ছলে বলিলেন "উত্তম, এই আমার ভিক্ষার ঝুলি লও, তোমার ষ্টেশনের কুলিগণের কুটির হইতে ভিক্ষা লইয়া আইস!" শিষ্য কিছুক্ষণের মধ্যেই এই মহান্ গুরুর জন্য কুলিগণের নিকট হইতে ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া উপস্থিত হইলে তিনি বিশেষ প্রসন্ন হইয়াছিলেন এবং তাহাকে দীক্ষা দানে কৃতার্থ করিয়া সঙ্গে লইয়াছিলেন। ইনিই পরবর্তীকালে স্বামী সদানন্দ নামে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে পরিচিত হন। ঐ কালে স্বামীজির দিব্য প্রভাবে মাদ্রাজের বহু প্রতিভাবান ব্যক্তিও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

স্বামীজি মহারাজ অন্তরের অন্তস্তল হইতে নির্দেশ পাইয়াছিলেন, তাঁহাকে মানব জাতির কল্যাণের জন্য বিদেশে গমন করিতেই হইবে এবং তাহার সূচনাও প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইয়াছিলেন। ইতিমধ্যে হায়দরাবাদ "সজ্জন মণ্ডলীর" আমন্ত্রণে তিনি কয়েক দিনের জন্য তথায় উপস্থিত হইলেন এবং তথাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া 'নিজামের' সহিতও সাক্ষাৎ করিলেন। ঐ সময় নিজামের সহিত তাঁহার বিভিন্ন ধর্মের মূলভিত্তিসমূহ লইয়া দীর্ঘ আলোচনা হইয়াছিল। স্বামীজি মহারাজের সিদ্ধান্তে মুগ্ধ হইয়া নিজাম ও তাঁহাকে বিদেশ ভ্রমণে উৎসাহিত করেন। নিজাম বাহাদুরের ও "সজ্জন-মণ্ডলী"র আগ্রহে তিনি তথাকার কলেজ হলে একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতাও প্রদান করিয়াছিলেন এবং এই স্থানেই সর্ব প্রথম তাঁহার বিদেশ যাত্রার অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য প্রকাশ্য ভাবে জ্ঞাপন করেন। তিনি পুনরায় মাদ্রাজে শিষ্য ভক্ত ও বন্ধুগণের মধ্যে ফিরিয়া আসিলেন। ওদিকে তখন চিকাগো ধর্ম মহাসভার আয়োজন

প্রায় সম্পূর্ণ হইতে চলিল, সকলেই তাঁহার ন্যায় প্রতিভাবান সন্ন্যাসীকে তথায় হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধিরূপে প্রেরণে প্রার্থনা জানাইলেন এবং তিনিও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিতে বাধ্য হইলেন। বিচারপতি সুব্রমণ্য আয়ারের নেতৃত্বে স্বামীজির অনুগত শিষ্যগণ ইতিমধ্যেই তাঁহার শিষ্য ও বন্ধুগণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহে বিশেষ উদ্‌যোগী হইয়াছিলেন। উৎসাহের অন্ত ছিল না। মাদ্রাজবাসিগণ এই যোগ্য সন্ন্যাসীকে সর্ব প্রথমে যথোপযুক্ত মর্য্যাদা দান করিয়া সমগ্র ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাদের শ্রীগুরুকে যথার্থই চিনিয়াছিলেন। তাঁহাদেরই সকলের আগ্রহে এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রেরণায় পাশ্চাত্য দেশে গমণের সংকল্প লইয়া তিনি সঙ্ঘ-জননী শ্রীশ্রীমায়ের অনুমতির জন্য কলিকাতায় পত্র প্রেরণ করিলেন। শ্রীশ্রীমাতা ঠাকুরাণীও স্বামীজি মহারাজকে আন্তরিক আশীর্বাদ জানাইয়া লিখিলেন "বাবাজীবন, ইহা শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছাই জানিবে, আমি তোমাকে যাইবার সম্মতি দিতেছি।" বলা বাহুল্য তিনি মায়ের অনুমতি পাইয়া যারপরনাই আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং ইহা শ্রীশ্রীঠাকুরেরই ইচ্ছা জানিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

স্বামীজি মহারাজের বিদেশ যাত্রা যাহাতে ত্বরান্বিত হয় তাহার জন্য মাদ্রাজবাসী যুবকগণ বিশেষ উদ্‌যোগী হইয়া সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন করিলেন। কিন্তু সহসা স্বামীজি মহারাজের প্রিয় শিষ্য খেত্‌রীর রাজাবাহাদুর তাঁহাকে তথায় লইয়া যাইবার জন্য দেওয়ান মুনশী জগমোহনলালকে প্রেরণ করিলেন। রাজাজী জানাইলেন যে, তাঁহাকে দু'এক দিনের জন্য হইলেও যাইতেই হইবে। তিনি শিষ্যের আন্তরিক আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। কয়েক দিনের জন্য তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি যখন পরিব্রাজক বেশে খেতরীর রাজ-পরিবারের আতিথ্য গ্রহণ করেন তখন রাজা কর্তৃক বিশেষ ভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া আশীর্বাদ করিয়া ছিলেন

"শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা হইলে আপনার পুত্র সন্তান হইবে।" রাজা পুত্র লাভ করিলেন। সেই রাজপুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষ করিয়া শ্রীগুরুর আশীর্বাদ গ্রহণের একান্ত অভিলাষেই স্বামীজিকে খেতরীতে আনাইয়াছিলেন। স্বামীজি কয়েক দিবস খেত্রীতে অবস্থান করিয়া পাশ্চাত্যে গমনের জন্য দেওয়ান জগমোহনলালের সহিত বোম্বাই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা বাহাদুর ইতিমধ্যেই তাঁহার দেবপ্রতিম শ্রীগুরুর জন্য জাহাজে প্রথম শ্রেণীর এক খানি কাম্রা সংরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছিলেন যাহাতে দীর্ঘ সমুদ্র-যাত্রায় তাঁহার কোনরূপ ক্লেশ না ঘটে। রাজা দেওয়ানজীকে আদেশ দিলেন যেন স্বামীজির প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র, পোশাক পরিচ্ছদ ক্রয় করিয়া দিতে অন্যথা না হয়। তিনিও স্বামীজি মহারাজের জন্য বহুমূল্য রেশমী আলখাল্লা ও শিরস্ত্রাণ প্রভৃতি ক্রয় করিয়া দিয়াছিলেন। পরে ঐ আলখাল্লা ও পাগড়ি পরিহিত হইয়াই তিনি চিকাগো সম্মেলনে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহার মহান গুরুদেবের আশীর্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া এবং অনুরাগী শিষ্য-বৃন্দের নিকট হইতে বিদায় লইয়া তিনি ষ্টীমার যোগে আমেরিকার পথে বোম্বাই সহর তথা ভারতবর্ষ ত্যাগ করিলেন ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মে তারিখে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রিয় 'নরেন্দর' তাঁহারই বাণী হৃদয়ে বহন করিয়া চলিয়া গেলেন। ভারত ত্যাগ করিবার প্রাক্কালে গুরুভ্রাতা স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজের সহিত হঠাৎ দেখা হইয়া গেল। বলিয়া গেলেন "এর পর দেখ্‌বি, ঠাকুরের নাম কি ভাবে প্রচার হয়।" দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের ঘোষণা। অপরাপর গুরুভ্রাতাগণ আলমবাজার মঠে কঠোর তপস্যায় ঈশ্বর সাক্ষাৎকারের পণ গ্রহণ করিয়াছেন, অপর কোন বাসনা নাই, অপর কোন আকাঙ্ক্ষা নাই, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা! স্বামীজি মহারাজের যোগ্য ভ্রাতা শ্রীমহেন্দ্র নাথ দত্ত ঐ সময়কার প্রত্যক্ষ ঘটনা স্বীয় গ্রন্থে এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন "তারকদা (যিনি মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ) সকালে রামতনু বোসের

গলির বাড়িতে আসিলেন, তাঁর গায়ে ধুলো কাদাতে মোটা সরের মত একটা নেউনি পড়ে গেছে, মাথায় উড়ি খুড়ি চুল, আর কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো দাড়ি। তারকদাকে কলের নীচে বসিয়ে দিল্লীআনা গা মাজবার বগলিটা হাতে পরে নিয়ে, তাঁর গা ঘষতে লাগলুম। গা ঘষতে ঘষতে কাদাটে জল বেরুতে লাগলো। অনেকক্ষণ পিঠ, বুক, হাত, পা ও মুখ ঘষে তারপর গায়ের চামড়ার রং বেরুলো। আমি বল্লুম তারকদা, এত কাদা বেরুচ্ছে কেন? তারকদা বল্লেন "সমস্ত রাত ধুনির পাশে বসে জপ করি, আর যেখানে সেখানে পড়ে থাকি, সেই জন্য গায়ে এত কাদা লেগেছে। দিনের বেলায় গঙ্গায় তিনটে ডুব দিয়ে আসি, গাও ঘষিনি কি পুঁছিনি তো?" ইহাতেই অনুমিত হয় কি কঠোর সাধনায় তাঁহারা ঐ সময় লিপ্ত ছিলেন। জাগতিক কোন দুঃখকেই দুঃখ বলিয়া তাঁহারা বোধ করিতেন না। যে মন দ্বারা সুখ দুঃখ বোধ করিবেন সেই মন আনন্দ স্বরূপ ঈশ্বরে অর্পিত হইয়াছিল, কাজেই আহারে বিহারে কোন প্রকার অভাব অভিযোগ ইহাদের চাঞ্চল্য ঘটাইতে সমর্থ হইত না বরং শাস্ত্রাদি আলোচনায় এবং অবসর সময়ে হাস্য কৌতুকে এমন মাতিয়া থাকিতেন যে কোন প্রকার শারীরিক ক্লেশই দুঃখ দায়ক হইত না। "মনুষ্য জীবনে এমন সময় কখন কখন আসিয়া থাকে, যখন দেহের জ্ঞান একেবারে চলিয়া যায়, যখন মন পর্যন্ত ক্রমশঃ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম হইতে হইতে প্রায় অন্তর্হিত হইয়া যায়, যখন দেহে আবদ্ধকারী ভীতি ও দুর্বলতা জনক সমুদায় বস্তুই চলিয়া যায়।" স্বামীজি মহারাজের ভাষায় বলিতে গেলে ঠিক এই অবস্থাটাই তখন আলমবাজার মঠবাসী যুবক সন্ন্যাসীদিগের অন্তর জুড়িয়া বিরাজ করিতেছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্ষদ মহাপুরুষ মহারাজ (স্বামী শিবানন্দজী) কথা প্রসঙ্গে বরানগর সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন "আমরা সকলে তথায় এসে থাকতে লাগলুম। তখন সকলেরই প্রাণে তীব্র বৈরাগ্য। সাধন ভজন, পূজা পাঠ খুব চল্‌ছে।

দিন-রাত সমভাবে কেটে যেত। ক্ষুধাতৃষ্ণা পর্যন্ত থাক্‌ত না। খুব ভজন কীর্ত্তন হত। এমন নৃত্য হত এক এক সময় যে, নীচে যে একটি দারোয়ানছিল সে ভয়ে অস্থির হয়ে যেত, পাছে দালান ভেঙ্গে পড়ে। খুব আনন্দে আমাদের দিন কাট্‌ত। এমনি করে সাধন ভজন ত্যাগ তপস্যাদির ভেতর দিয়ে আমাদের সঙ্ঘের গোড়াপত্তন।" স্বামীজি মহারাজও বরাবর সংগীত প্রিয় ছিলেন। তিনি ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইয়া সর্বপ্রথম সঙ্গীত গাহিয়াই তাঁহাকে আনন্দ প্রদান করিয়াছিলেন এবং দক্ষিণেশ্বরে, বরানগরে, বেলুর মঠে প্রায়শঃ গুরুভ্রাতাগণের সহিত শিব কিম্বা শক্তি বা ব্রহ্ম বিষয়ক সঙ্গীতে বিভোর হইয়া থাকিতেন। গুরুভ্রাতা স্বামী সারদানন্দ মহারাজ 'পাখোয়াজ' বাদনে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি পাখোয়াজ এবং স্বামীজি মহারাজ তানপুরা লইয়া যখন "বোম্ বোম্ হর হর" প্রভৃতি গান গাহিতেন তখন উপস্থিত সকলেই মুগ্ধ হইয়া অবস্থান করিতে বাধ্য হইতেন! মনে হইত, বুঝিবা সাক্ষাৎ শিবের আবির্ভাবে উপস্থিত সকলে ধ্যানস্থ হইয়া অবস্থান করিতেছেন! ধ্রুপদ সঙ্গীত স্বামীজি মহারাজের বিশেষ প্রীতিপ্রদ ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণ অনেকেই সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন। অনেকেই সঙ্গীতের অবতারণায় উপদেশাদিও প্রদান করিয়াছেন। সুখে-দুঃখে আলমবাজার মঠ-গৃহে তাঁহাদের সাধক-জীবনের কঠোর তপশ্চারণা সম্পন্ন হইয়াছিল। তখনকার বহু ঘটনা বিভিন্ন পুস্তকে বিবৃত রহিয়াছে। একস্থানে স্বামীজি মহারাজ তখনকার প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন "খরচপত্রের অনটনের জন্য কখন কখন মঠ তুলে দিতে লাঠালাঠি করতুম্। শশীকে কিছুতেই ঐ বিষয়ে রাজী করাতে পারতুম না। শশী আমাদের মঠের কেন্দ্রস্বরূপ বলে জান্‌বি। এক এক দিন মঠে এমন অভাব হয়েছে যে, কিছুই নেই। ভিক্ষা করে চাল আনা হলো তো নুন নেই। এক এক দিন শুধু নুন ভাত চল্‌ছে, তবু কারো ভ্রুক্ষেপ

নেই, জপ ধ্যানের প্রবল তোড়ে আমরা তখন সব ভাস্‌ছি। তেলাকুচার পাতা সেদ্ধ, নুন ভাত, এই মাসাবধি চলছে আহা সে সব কি দিনই গেছে! সে কঠোরতা দেখলে ভূত পালিয়ে যেতো মানুষের কথা কি!" আলমবাজার ও বরানগর মঠেই শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদগণের আধ্যাত্মিক জীবনের ভিত্তি গঠিত হইয়াছিল। যাঁহারা পরবর্তীকালে বিশ্ব বিজয় করিয়াছেন তাঁহারাও ঐ মঠেই ভগ্নগৃহের কোণে বসিয়া শক্তির উদ্বোধনে এবং শাস্ত্রজ্ঞান আয়ত্তী-করণে সাফল্য লাভ করেন। শ্রীবুদ্ধের ন্যায় কঠোর সংকল্পে ঐ মঠেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল অধ্যয়ন ও তপস্যা। পাশ্চাত্যে গমনের পূর্বে স্বামীজি মহারাজ একদিন বলরামমন্দিরে কথা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন "দর্শন শাস্ত্রগুলি যেন আমার হাতের মুঠার ভিতর রয়েছে, পাশ্চাত্য দর্শনগুলিও আমার ওষ্ঠের অগ্রে রয়েছে। আমরা কোন্ থাক্ জানিস? আমরা হচ্ছি Teacher Class. জগৎকে নূতন ভাব দেবার জন্য আমরা আসি।" বাস্তবিক এই আলমবাজর মঠকে কেন্দ্র করিয়া কত অদ্ভূত ঘটনাই ঘটিয়া গিয়াছে; কঠোর তপস্যার মধ্যে পড়াশুনা ও সঙ্গীতই তাঁহাদের বিশ্রামের একমাত্র অবলম্বন ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে যে তানপুরাটি ক্রয় করিয়া দিয়াছিলেন তাহা সর্বদাই নিকটে থাকিত। বিভিন্ন প্রকারের অসুবিধার মধ্যেও তিনি যন্ত্রটিকে কখনও পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহার সাহিত্য-দর্শনাদি বিষয়ক প্রবন্ধ রচনায় যেমন দক্ষতা ছিল তেমনই কবিতা ও সঙ্গীত রচনায়ও বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। স্বামীজি মহারাজের বহু কবিতা ও সঙ্গীতের মধ্যে তাঁহার একটি প্রিয় সঙ্গীত এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। ইহা হইতেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন তাঁহার ভাব ও ভাষা কত গভীর ভাবোদ্দীপক ছিল।

"নাহি সূর্য নাহি জ্যোতিঃ নাহি শশাঙ্ক সুন্দর।
ভাসে ব্যোমে ছায়া সম ছবি বিশ্ব চরাচর॥

অস্ফুট মন আকাশে, জগত সংসার ভাসে।
উঠে ভাসে ডোবে পুনঃ অহং স্রোতে নিরন্তর ॥
ধীরে ধীরে ছায়া-দল, মহালয়ে প্রবেশিল ;
বহে মাত্র আমি আমি এই ধারা অনুক্ষণ ॥
সে ধারাও বন্ধ হল, শূন্যে শূন্য মিলাইল ;
অবাঙ্‌মনসোগোচরম্‌ বোঝে প্রাণ বোঝে যার ॥”

* *

*

পাঁচ

॥ পাশ্চাত্য-দেশ ভ্রমণ ॥

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ভ্রমণান্তর স্বামীজি মহারাজ যখন মাদ্রাজবাসী ও অপরাপর দক্ষিণ ভারতবাসিগণের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া আমেরিকা গমন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মে বোম্বাই সহর হইতে আমেরিকা যাত্রা করেন, সেদিন নিদ্রিত, পরানুকরণ-সর্বস্ব, পরাধীন ভারতবাসীর কালগ্রহ গ্রহান্তরে পরিবর্তিত হইয়া নূতন যুগের সূচনা করিয়াছিল। মোহমুগ্ধ আত্মবিস্মৃত জাতির ভাগ্যাকাশে বিবেকের জ্ঞানভাণ্ড লইয়াই সেদিন বিবেকানন্দ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। স্বদেশবাসী অথবা বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় কেহই এই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীকে বিদায় সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতে বোম্বায়ের জাহাজ-ঘাটায় সেদিন

উপস্থিত হয় নাই। দুইটি-মাত্র ভারতীয় এই তরুণ সন্ন্যাসীকে বিদায় অভিনন্দন দিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের একান্ত প্রিয় শিষ্য নরেন্দ্রনাথ তাঁহারই আরব্ধ নিরূপিত মহান ব্রত উদ্‌যাপনে একমাত্র তাঁহাকেই ভরসা করিয়া যাত্রা সুরু করিয়াছিলেন, সাংসারিক চিন্তাশূন্য, সহায় সম্বলহীন একক বাঙালী সন্ন্যাসী চলিলেন মদগর্বে গর্বিত ভোগবাদের লীলাভূমিতে ধর্মমহাসভায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে। সঙ্গে একমাত্র বিত্ত প্রাচীন ভারতের সাধনালব্ধ পারমার্থিক জ্ঞানের মণিমঞ্জুষা, সহায় গুরুবল ও আত্মপ্রত্যয়। অবজ্ঞা, অবহেলা, অপমান, লাঞ্ছনার কোনটিই তাঁহার গতিপথ রুদ্ধ করিতে পারিল না। মহাপুরুষদিগের জীবনে তীব্রভাবে ঐ সকল উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের মহত্ত্বকে বর্ধিত করিয়া তোলে। স্বামীজি মহারাজের জীবনেও তাহাই ঘটিয়াছিল। তিনি তাঁহার দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের বলে সকল বাধা অতিক্রম করিয়া পাশ্চাত্যে বেদান্তের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আমেরিকার পথে বিভিন্ন দেশ দর্শনের যে সুযোগ তাঁহার ঘটিয়াছিল তাহাতেই ঐ সকল দেশের আভ্যন্তরিক উত্থান-পতনের চিত্রও তিনি যথার্থভাবে অনুধাবন করিয়া লইয়াছিলেন। তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। মহাচীনের ভবিষ্যৎ, জাপানের ভবিষ্যৎ অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন স্বামীজির দৃষ্টির সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। পত্রে লিখিলেন—"জাপানীরা বর্তমানকালে কি প্রয়োজন বুঝিয়াছে তাহারা সম্পূর্ণরূপে জাগরিত হইয়াছে। জাপানীদের সম্বন্ধে আমার কত কথা মনে উদয় হচ্ছে, তা একটা সংক্ষিপ্ত চিঠির মধ্যে প্রকাশ করে বলতে পারি না। তবে এইটুকু বলতে পারি যে আমাদের দেশের যুবকেরা দলে দলে প্রতি বৎসর চীন ও জাপানে যাক্। জাপানে যাওয়া আবার বিশেষ দরকার; জাপানীদের কাছে ভারত সর্বপ্রকার উচ্চ ও মহৎ পদার্থের স্বপ্নরাজ্য স্বরূপ।" জাপানের কার্যদক্ষতা, সৌন্দর্য বোধ,

জাতীয় উন্নতির জন্য প্রবল উদ্যম এবং প্রখর কর্তব্য নিষ্ঠা স্বামীজি মহারাজকে মুগ্ধ করিল। তিনি নিশ্চিত বুঝিলেন যে তাহাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, আর সে ভবিষ্যৎ সুদূর নহে। আর সঙ্গে সঙ্গে ভারতের দুর্দশার চিত্র তাঁহার মানস-পটে উদিত হইল। দুঃখ-দারিদ্র-ক্লিষ্ট অগণিত মানবের জন্য তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইল। তিনি লিখিলেন—"যে জাতি শত শত বৎসর ধরিয়া এক গ্লাস জল 'ডান হাতে খাব কি বাম হাতে খাব', এইরূপ গুরুতর সমস্যা সমূহের বিচারে ব্যস্ত রহিয়াছে, সেই জাতির নিকট আর কি আশা করিতে পার! যে দেশের বড় বড় মাথাগুলি শত শত বৎসর ধরিয়া এই স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচারে ব্যস্ত, সেই জাতির অবনতি যে চরম সীমায় দাঁড়াইয়াছে, তাহা কি আর বলিতে হইবে?"

তিনি কলম্বো, সিঙ্গাপুর, হঙ্কং, চীনের রাজধানী ক্যান্টন ও জাপানের বিভিন্ন সহর পরিদর্শন করিয়া অবশেষে ভাঙ্কুবরে পৌঁছিয়া তথা হইতে রেল-যোগে আমেরিকার চিকাগো সহরে উপস্থিত হইলেন। কোথায় থাকিবেন, কার অতিথি হইবেন কিছুই স্থির নাই। এ সম্বন্ধে তিনি পরে বলিয়াছেন—"তখন আমি একজন দরিদ্র, অপরিচিত সন্ন্যাসী মাত্র। একজনও বন্ধু-বান্ধব নাই। সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া আমাকে আমেরিকায় যাইতে হইবে কিন্তু কাহারও উপর কোন চিঠি পত্র নাই।" কাজেই তিনি ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর এবং ফলাফল তাঁহারই উপর সমর্পন করিলেন "কর্মণ্যেবাধি-কারস্তে মা ফলেষু কদাচন।" "মৃত্যু যখন নিশ্চিত, তখন মহৎ উদ্দেশ্যে শরীর যায়, উত্তম।" ইহাই তখন তাঁহার মনোভাব।

এই সকল মহান ত্যাগ-মন্ত্র তাঁহার মনে অসীম শক্তি সঞ্চার করিল। সুতরাং জাগতিক কোন বিরুদ্ধ শক্তিই তাঁহার গতিপথ রুদ্ধ করিতে পারিল না। কিন্তু তথাপি পরাধীনতার মসিলিপ্ত ভারতীয় হিন্দু সন্ন্যাসীর কুত্রাপি স্থান হইল না! দ্বারে দ্বারে ফিরিলেন, সকলেই অবজ্ঞায়:মুখ ফিরাইল! তিনি নানা কুট-কৌশলে প্রতারিত

হইতে লাগিলেন। এই প্রতিকুল অবস্থার বর্ণনা-প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—"টাকা আমার নিকট অতি অল্পই ছিল আর ধর্ম মহাসভা বসিবার পূর্বেই সমুদায় খরচ হইয়া গেল। এদিকে শীত আসিল। আমার কেবল পাত্‌লা গ্রীষ্মোপযোগী বস্ত্র ছিল। এক দিন আমার হাত পা হিমে আড়ষ্ট হইয়া গেল। এই ঘোরতর শীত প্রধান দেশে আমি যে কি করিব তাহা ভাবিয়া পাইলাম না।" আজন্ম-সন্ন্যাসী দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হইলেন "আমার একটু দৃঢ়তা আছে, আমার নিজের একটু অভিজ্ঞতাও আছে, আর জগতের নিকট আমার কিছু বার্তা বহন করিবার আছে, আমি নির্ভয়ে ও ভবিষ্যৎতের জন্য কিছু মাত্র চিন্তা না করিয়া সেই বার্তা বহন করিব।"

দারুণ সঙ্কটে ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাঁহার সহায়ক হইল। চিকাগো ধর্ম-মহাসভার অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার তখনও বিলম্ব ছিল। চিকাগোয় বাস করা একে ব্যয়-বহুল; তাহার উপর তাঁহার অশ্বেত বর্ণ ও অদ্ভূত পরিচ্ছদের জন্য অত্যধিক ব্যয়েও তাঁহার পক্ষে বাসস্থান সংগ্রহ করা দুষ্কর। এদিকে সঙ্গে যে অর্থ আনিয়াছিলেন তাহাও নিঃশেষিত-প্রায়; কোনও স্থান হইতে অর্থ সাহায্য প্রাপ্তির আশাও নাই। এমতাবস্থায় অন্য কোন সহরে অল্প ব্যয়ের হোটেলে অন্তর্বর্তী কাল কাটানই সমীচীন মনে করিয়া তিনি ট্রেনযোগে বোষ্টন-যাত্রা করিলেন। ঐ ট্রেণেই তাঁহার সহিত বোষ্টন বাসিনী, সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিতা, শিক্ষিতা, বর্ষীয়সী এক ভদ্র মহিলার সহিত পরিচয় হয়। কথা-প্রসঙ্গে স্বামীজির বোষ্টনে যাইবার কারণ ও উদ্দেশ্য জানিতে পারিয়া ভদ্রমহিলা অপ্রত্যাশিত ভাবে স্বামীজিকে তাঁহার বাড়ীতে অবস্থান করিবার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানাইলেন। স্বামীজি মহারাজও এই আমন্ত্রণকে ঈশ্বরের অনুগ্রহ মনে করিয়া ধন্য-বাদের সহিত তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। সঙ্কটের অবসান হইল। চিকাগো :ধর্ম মহাসভার মাধ্যমে পাশ্চাত্যবাসিগণের

নিকট হিন্দুর ধর্ম ও দর্শনের প্রকৃত স্বরূপ তুলিয়া ধরিবার এবং উহাকে যথোচিত মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিবার 'মহাব্রত' উদ্‌যাপনের আশা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

স্বামীজির ব্যক্তিত্ব, পাণ্ডিত্য বা তাঁহার 'মহাব্রত' (mission) তাঁহার আশ্রয়দাত্রী ভদ্র মহিলাকে যত না আগ্রহান্বিত করিয়া ছিল, তদপেক্ষা স্বামীজির প্রতি তাঁহাকে অনেক বেশী কৌতূহলী করিয়াছিল তৎকালে ইউরোপ-আমেরিকায় প্রচারিত ভারতীয় যোগীদিগের কৃচ্ছ্র-সাধনা ও ক্ষমতার বিষয়ে নানা বিকৃত এবং অতিরঞ্জিত কাহিনী। তাঁহার উত্তেজনা-প্রিয় মার্কিনী মন স্বামীজির মধ্যে কাহিনীর "ভারতীয় যোগী" আবিষ্কার করিয়া উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং উহাই তাঁহার সত্ত-পরিচিত তখনও পর্যন্ত অখ্যাত এই ভারতীয় সন্ন্যাসীকে স্বগৃহে আশ্রয়-দানের মুখ্য হেতু। তিনি স্বামীজিকে স্বগৃহে লইয়া গিয়া তাঁহার পরিচিত এবং বন্ধু-বান্ধব সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া সগর্বে তাঁহার এই অদ্ভুত আবিষ্কার দেখাইয়া তাহাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিতে লাগিলেন। এই সময়ের অবস্থা বর্ণনা-প্রসঙ্গে স্বামীজি মহারাজ লিখিয়াছেন—"এখানে থাকায় আমার এই সুবিধা হইয়াছে যে প্রত্যহ আমার যে এক পাউণ্ড খরচ হইতেছিল তাহা বাঁচিয়া যাইতেছে। আর তাঁহার লাভ এই যে তিনি তাহার বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভারতাগত এই অদ্ভূত জীব দেখাইতেছেন। এ সব যন্ত্রণা সহ্য করিতেই হইবে। আমাকে এখানে অনাহার, শীত, এবং আমার অদ্ভূত পোষাকের জন্য রাস্তার লোকের বিদ্রূপ, এইগুলির সহিত যুদ্ধ করিয়া চলিতে হইতেছে।" ভদ্র মহিলার কৃপায় বাসস্থান সঙ্কটের অবসান হইলেও তদীয় ভবনে এই ভাবে অজস্র কৌতূহলের পাত্র হইতে বাধ্য হওয়ায় স্পষ্টতই স্বামীজি মহারাজের চিত্ত পীড়িত হইতেছিল। কিন্তু শাপে বর হইল। এক দিন ভদ্র মহিলার নিমন্ত্রিত অন্য সাধারণ কৌতূহলী

দর্শকদিগের সহিত এক অসাধারণ ব্যক্তিও তাহার ভবনে উপস্থিত হইলেন। ইনি ছিলেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন খ্যাতনামা অধ্যাপক। অন্যান্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের ন্যায় তাঁহার কৌতূহল কেবলমাত্র এই ভারতীয় যোগীর পোষাক-পরিচ্ছদ বা বাহ্য আচরণ দেখিয়াই নিবৃত্ত হইল না। তাহার শিক্ষিত চক্ষু এই সন্ন্যাসীর প্রশান্ত মুখাবয়বে আত্মপ্রত্যয় ও ব্যক্তিত্বের সুস্পষ্ট ছাপ এবং প্রতিভার দীপ্তি দেখিতে পাইল। তিনি স্বামীজির সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং প্রায় চারি ঘণ্টা দর্শনাদি সম্বন্ধে আলোচনার ফলে তাঁহার প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইলেন এবং স্বামীজি মহারাজকে চিকাগোর সম্মেলনে উপস্থিত হইয়া তাঁহার মতবাদ প্রচার করিতে অনুরোধ করিলেন। স্বামীজি তাঁহার অসুবিধার বিষয় জানাইলেন। অধ্যাপক মহোদয় তৎক্ষণাৎ চিকাগো সম্মেলনের কর্তৃপক্ষস্থানীয় এক ব্যক্তির নামে পরিচয়পত্র লিখিয়া স্বামীজিকে দিলেন। পত্রে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এইরূপ লিখিয়াছিলেন—"......এই অজ্ঞাতনামা হিন্দু সন্ন্যাসী, আমাদের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পণ্ডিতগুলি একত্র করিলে যাহা হয় তদপেক্ষাও বেশী পণ্ডিত।" পরিচয়-পত্র সঙ্গে লইয়া স্বামীজি নূতন উদ্যমে বোষ্টন হইতে পুনরায় চিকাগোতে পৌঁছিলেন। কিন্তু যাহার নিকট যাইবেন তাঁহার ঠিকানা হারাইয়া গেল। উহা কোথায় রাখিয়াছেন বা কি হইয়াছে তাহার সন্ধান করিতে পারিলেন না। এই বিরাট সহরে ভদ্রমহোদয়ের অনুসন্ধান করিয়াও বিফল মনোরথ হইলেন। ক্রমে সন্ধ্যা সমাগম হইল। কোথাও থাকিবার স্থান বা আহারের জন্য হোটেলেরও কোন ব্যবস্থা হইল না। সকল-দিক হইতেই নিরাশ হইয়া রেল ষ্টেশনেই ফিরিয়া আসিলেন। প্রচণ্ড শীত, বরফ পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে অথচ ষ্টেশনের বিশ্রামাগারেও স্থান সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। অবশেষে নিরুপায় হইয়া ষ্টেশনে পরিত্যক্ত

একটি বৃহৎ কাঠের বাক্সের মধ্যে আশ্রয় লইয়া কোন প্রকারে রাত্রের নিদারুণ হিম হইতে আত্মরক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিলেন। কোন মতে রাত্রি কাটিয়া গেল। সকালে মনে করিলেন যে একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবেন যদি চিকাগো সম্মেলনে প্রতিনিধি হইয়া যোগদানের সুযোগ ঘটে। তদনুসারে পুনরায় পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু অনশন-ক্লিষ্ট দুর্বল শরীরে বেশী দূর যাওয়া সম্ভব হইল না। ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পথ-পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন। 'মহাব্রত' উদ্‌যাপনের ক্ষীণ আশাও মন হইতে বিলুপ্ত হইয়া গেল। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সমস্ত অবস্থা মনে মনে পর্যালোচনা করিলেন। সমস্ত প্রচেষ্টার শোচনীয় ব্যর্থতা নিশ্চিত বলিয়া বোধ হইল। ঠাকুরের উপর প্রবল অভিমানে হৃদয় ভরিয়া গেল, চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত হইল, ভক্তের অভিমানক্ষুব্ধ হৃদয়ের অন্তঃস্থল মথিত করিয়া আর্ত আবেদন ধ্বনিয়া উঠিল—"ঠাকুর, যদি এমন হইবে, তবে আমাকে কেন এখানে আনিলে?" সহসা মুহূর্তের জন্য তাঁহার স্থান-কালের বোধ অবলুপ্ত হইল। তিনি দেখিলেন যেন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার পিছনে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন—"এই দেখ্ আমি রয়েছি।" চমকিত হইয়া স্বামীজি চক্ষু খুলিলেন। নিমেষের আশ্বাসময় অলৌকিক দর্শন কোথায় মিলাইয়া গেল। নৈরাশ্যের অন্ধকারকে গাঢ়তর করিয়া চক্ষে ফুটিয়া উঠিল রূঢ় পারিপার্শ্বিক। আর ঠিক সেই মহূর্তে তাঁহার নিকটস্থ প্রাসাদোপম ভবনের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া এক মহিলা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সুমিষ্ট ভাষায় সম্ভাষণ করিয়া সাদরে তাঁহাকে ঐ গৃহে লইয়া গেলেন। যথোচিত পরিচর্যার পর কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে তিনি ভদ্রমহিলার অনুরোধে স্বীয় অবস্থা-বিভ্রাটের কথা জানাইলেন। সমস্ত শুনিয়া ভদ্রমহিলা তাঁহাকে দৃঢ় আশ্বাস দিলেন যে তিনি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া কর্তৃপক্ষের সহিত দেখা করিবেন এবং তাঁহার চিকাগো সম্মেলনে প্রতিনিধি হইবার সমস্ত ব্যবস্থাদি করিয়া দিবেন। ঠাকুরের ইচ্ছায় অসম্ভবও সম্ভব হইল।

বলা বাহুল্য যে উক্ত ভদ্রমহিলা স্বামীজিকে সঙ্গে লইয়া সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, এবং স্বামীজিও সম্মেলনের প্রতিনিধি হিসাবে নির্দিষ্ট বাসস্থানে অবস্থান করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। আমেরিকার এই সহৃদয়া মহিলা পাশ্চাত্য দেশে স্বামীজি মহারাজের প্রচার-কার্যে প্রভূত সহায়তা করিয়াছিলেন এবং স্বামীজিও জননীর ন্যায়ই তাঁহাকে শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিতেন। এই মহিয়সী মহিলার নাম মিসেস জর্জ ডব্লিউ হেইল।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর পৃথিবীখ্যাত ধর্মমহাসভার অধিবেশন আরম্ভ হইবে। স্বামীজি মহারাজ অপরাপর প্রতিনিধি-গণের সহিত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। যথারীতি নির্দিষ্ট দিনে অধিবেশন আরম্ভ হইলে মাদ্রাজবাসী শিষ্যদিগের নিকট অধিবেশন বর্ণনায় লিখিলেন—"অধিবেশনের দিন সকালবেলা আমাদিগকে যথোচিত সম্মানের সহিত অবিবেশন স্থলে লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে বিরাট একটি হল এবং ছোট ছোট অস্থায়ী কতগুলি হল নির্মিত হইয়াছিল। সর্বজাতির লোক সমাগম। ভারত হইতে প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার এবং আর, চক্রবর্তী আসিয়াছেন। মজুমদার আমার পূর্বপরিচিত, চক্রবর্তী আমাকে নামে মাত্র চেনেন। আমরা সকলে বক্তৃতা-মঞ্চে আসিলাম। কল্পনা কর সম্মুখে বিরাট হল ও গ্যালারী, বিভিন্ন দেশের বাছা বাছা ছয় সাত হাজার শিক্ষিত স্ত্রী-পুরুষ উপবিষ্ট। আর আমি, যে কোনদিন সাধারণের সম্মুখে জীবনে বক্তৃতা করে নাই, আমাকে বক্তৃতা করিতে হইবে। যথারীতি সঙ্গীত ও বক্তৃতা দ্বারা অধিবেশন আরম্ভ হইল এবং প্রতিনিধিগণকে একে একে পরিচয় করাইয়া দেওয়া হইল। তাঁহারাও অগ্রসর হইয়া কিছু কিছু বলিলেন। আমার অবশ্যই বুক দুরু দুরু করিতেছিল এবং জিহ্বা শুষ্কপ্রায় হইয়াছিল। আমি অত্যন্ত ঘাবড়াইয়া গিয়াছিলাম, সকালের দিকে বক্তৃতা করিলাম না। আমি অত্যন্ত বোকা। কোন বক্তৃতা প্রস্তুত করিয়া আনি নাই; ডাঃ বারোজ সাহেব

সকলের সম্মুখে আমার পরিচয় প্রদান করিবার পর আমি মা সরস্বতী-দেবীকে স্মরণ করিয়া অগ্রসর হইলাম এবং অত্যন্ত আবেগের সহিত কিছুক্ষণ বক্তৃতা করিলাম।" কথিত আছে যে স্বামীজি মহারাজ যখন উক্ত মহাসভায় 'আমেরিকাবাসী ভগ্নী ও ভ্রাতাগণ' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন তখন শ্রোতৃমণ্ডলী ভাবাভিভূত হইয়া পূর্ণ দুই মিনিট কাল করতালি দ্বারা তাঁহাকে সম্বর্ধিত করিয়াছিল।

মানুষের দ্বারা মানুষের পীড়ন ও শোষণ মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তিপ্রসূত নহে। আদিম সমাজে ইহার অস্তিত্বই ছিল না। আদিম সমাজ যখন প্রথম ধন উৎপাদন ও সঞ্চয়ের উপায় উদ্ভাবন করিয়া সভ্যতা ও সংস্কৃতির পত্তন করিল তখন হইতেই অবাঞ্ছিত-ভাবে ইহা সমাজ-ব্যবস্থার ভিত্তি-স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং সভ্যতার ক্রমবিকাশের সমানুপাতে ইহার তীব্রতাও ক্রমিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু স্বাভাবিক বৃত্তি-বিরোধী বলিয়া ইহার অন্যায্যতা সম্বন্ধে বোধ এবং ইহার উপর বিতৃষ্ণা মানুষের মনে স্বতঃই বিদ্যমান। এই স্বভাবসঞ্জাত বিতৃষ্ণা মানুষের অবচেতন মনে সৃষ্টি করে নিরুদ্ধ আবেগ এবং তাহার পরিতৃপ্তির জন্য পীড়ন-শোষণহীন, দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষশূন্য সৌভ্রাত্রমূলক সমাজ-ব্যবস্থার কামনা। ইহারই ফলে মানুষের স্বর্গরাজ্যের কল্পনা, এবং যুগে যুগে বিভিন্ন দেশ ও সমাজে বিপ্লবের বিস্ফোরণ। স্বামীজির ভ্রাতৃ-সম্বোধনে মানব সাধারণের অবচেতন মনের এই সুপ্ত কামনা ধ্বনিত হইয়াছিল। তাই শ্রোতৃ-মণ্ডলীর এই উন্মাদনা ও উল্লাস।

যেদিন স্বামীজি মহারাজ তাঁহার হিন্দুধর্ম নামক সুচিন্তিত বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, সেদিন পাশ্চাত্য জগৎ স্তম্ভিত-চিত্তে ভারতের সনাতন ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হইয়া অসীম আগ্রহে এবং শ্রদ্ধায় তাঁহাকে আচার্য-পদে বরণ করিয়া লইয়াছিল। যে বিবেকানন্দ ভোগবাদের স্বর্গরাজ্যে নিতান্ত দরিদ্র, নিতান্ত কৃপাপাত্র হইয়া পথে পথে ভ্রমণে প্রবৃত্ত ছিলেন, আজ তাঁহাকেই দর্শন করিয়া, তাঁহার

সহিত পরিচিত হইয়া শ্রেষ্ঠ মনীষীবৃন্দও নিজদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিতে লাগিলেন। পরিব্রাজক বিবেকানন্দ—আচার্য বিবেকানন্দে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষিতসমাজ এই উদার জ্ঞান-ভাস্কর সন্ন্যাসীকে সহরের বিভিন্ন অঞ্চলে সাদরে আমন্ত্রণ করিয়া বৈদান্তিক সনাতন ধর্মের তেজোপ্রদ বাণীসকল শ্রবণ করিয়া নিজদিগকে ভাগ্যবান মনে করিতে লাগিলেন। তিনি যেখানেই উপস্থিত হইতেন এবং যে পথে গমন করিতেন সেইখানেই এবং সেই পথের প্রতি দীপাধারে বিবেকানন্দের দীর্ঘাকার প্রতিকৃতি বিলম্বিত হইত এবং পথিপার্শ্বে অপেক্ষমান জনতা তাঁহাকে দর্শন করিয়া অভিনন্দন জানাইত। গুণগ্রাহী আমেরিকাবাসীগণ ভারতীয় এই আচার্যকে যোগ্য সম্মানে ভূষিত করিয়া নিজেদের মহত্বই প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা কিরূপ বিরাট জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল তাহা নিম্নোদ্ধৃত তৎকালীন আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট হইতে বুঝিতে পারা যায়। "...কেবল মহিলা, কেবল মহিলা, কেবল মহিলা। সমস্ত জায়গা জুড়িয়া অগণিত মহিলা, কোণ পর্যন্ত ফাঁক নাই। বিবেকানন্দের বক্তৃতা হইবার পূর্বে যে সকল প্রবন্ধ পঠিত হইতেছিল তাহা ভাল না লাগিলেও কেবল বিবেকানন্দের বক্তৃতা শুনিবার জন্য অতিশয় সহিষ্ণুতার সহিত সকলে বসিয়াছিল। এই সুশ্রী বৈদ্যুতিক-শক্তিশালী অদ্ভুত বক্তাই নিঃসন্দেহে মহাসভার সর্বশ্রেষ্ঠ বক্তার আসন অধিকার করিয়াছেন।" স্বামীজি মহারাজ নিজে লিখিলেন "এইটুকু জানিলেই তোমাদের যথেষ্ট হইবে যে, ইহার পূর্বে প্রাচ্যদেশীয় কোন ব্যক্তিই আমেরিকান সমাজের উপর এরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই।" স্বামীজি মহারাজই ধর্ম-মহাসভার একমাত্র অবিসংবাদিত প্রধান বক্তারূপে নির্বাচিত হইয়াছিলেন এবং তৎকালীন মনীষীবৃন্দের দ্বারা অভিনন্দিত হইয়া জনসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দুধর্মের সার্বজনীনতা প্রতিপাদন পূর্বক যুক্তিপূর্ণ ভাষণ দ্বারা সনাতন হিন্দু-

ধর্মের অধিকতর মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়া বলিলেন "তোমরা ঈশ্বরের সন্তান। তোম্রা পাপী ইহা অসম্ভব। মানবকে পাপী বলাই এক মহাপাপ। বিশুদ্ধ মানবাত্মায় ইহা মিথ্যা কলঙ্কারোপ মাত্র। হে ভ্রাতৃগণ! সিংহস্বরূপ হইয়া নিজদিগকে মেষতুল্য মনে করিতেছ কেন? তোমরা জন্ম-মরণ-রহিত মুক্ত ও নিত্যানন্দময় আত্মা। তোমরা জড় নও, তোমরা দেহ নও। জড় তোমাদের দাস, তোমরা জড়ের দাস নও। অনাদি বেদ এইরূপ ঘোষণা করিতেছেন যে, এই সৃষ্টির ব্যাপার কতকগুলি নির্দয় ও নির্মম নিয়মাবলির প্রবাহ স্বরূপ নয় বা অনন্ত কার্য-কারণের শৃঙ্খলও নয়। এই সকল প্রাকৃতিক নিয়মের আদিতে, প্রত্যেক পরমানু ও শক্তির মধ্যে এমন এক মহাপুরুষ বিদ্যমান আছেন যাঁহার আদেশে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতেছে, মেঘ বারিবর্ষণ করিতেছে, মৃত্যু জগতীতলে পরিভ্রমণ করিতেছে। ভারতবর্ষে মুর্তিপূজা একটা ভয়ানক ব্যাপার নয়। ইহা দুষ্কর্মের অনুষ্ঠানকে প্রশ্রয় দেয় না। বরং ইহা দুর্বল অধিকারীদিগকে ধর্মের উচ্চভাবে উঠিতে সক্ষম করে। হিন্দুদের অবশ্যই দোষ আছে কিন্তু এটি জানা উচিত যে, ইহা তাঁহাদের আত্মদেহ পীড়নেই সীমাবদ্ধ, অন্য ধর্মাবলম্বীদের শিরশ্ছেদনে ব্যাপৃত নহে।"

স্বামীজি মহারাজ ধর্ম সম্মেলনে বিভিন্ন দিনে চারিটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাহার পর হইতেই পাশ্চাত্য দেশ তাঁহার দার্শনিক মতবাদ জানিবার জন্য অধিকতর উৎসাহিত হইয়া উঠিল। বিভিন্ন স্থান হইতে ভাষণের নিমিত্ত আবেদন আসিতে লাগিল এবং স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের আতিথ্য গ্রহণের জন্যও সাদর আমন্ত্রণ আসিতে লাগিল। তিনিও যথা সম্ভব তাহা গ্রহণে অনুরাগীগণের বাসনা পূর্ণ করিয়া তাহাদের সহিত বন্ধুত্বসুত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। "আমেরিকাবাসীর মত, এমন সহৃদয়,

উদার চিত্ত, অতিথি সৎকার-পরায়ণ, নব নব ভাব গ্রহণে একান্ত সমুৎসুক জাতি জগতে আর দ্বিতীয় নাই।" তিনি পরবর্তী কালে আমেরিকান বন্ধুদের সম্বন্ধে বলিতে গিয়া উক্তরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন।

আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্ব ও গুণ-গরিমায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশবাসী মুগ্ধ হইয়া তাঁহার বাণীকে দেববাণী রূপেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। এমন উদার মনোভাব, এমন যুক্তি পরায়ণতা, এমন মহানুভবতা জগৎ কদাচিৎ প্রত্যক্ষ করিয়ছে। তাই পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী সংঘর্ষরত জাতিগুলিও তাঁহাকে আচার্য-পদে বরণ করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। তিনি সহস্র সহস্র লোক সমক্ষে ঘোষণা করিলেন,—"প্রত্যেক জাতি প্রত্যেক জাতিকে সহায়তা করিবে, পরস্পর ভাব বিনিময় দ্বারা আপন আপন ধর্মের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আত্মোন্নতির পথে অগ্রসর হইবে, ইহাই এক মাত্র শ্রেষ্ঠ পন্থা।" হিন্দু ধর্মের এই মহৎ উদার বাণীই তাঁহার মধ্যে উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। ধর্ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়া গেলে শত শত সংবাদ-পত্র তাঁহার প্রশংসায় মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। এই সকল সংবাদ পত্রের মন্তব্য সংগৃহীত হইলে একখানি গ্রন্থ হওয়াই সম্ভব। দুই একটি আংশিক সংবাদ এই স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি। "হিন্দু-দর্শন ও বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত, সমবেত পারিষদের অগ্রগণ্য, প্রচারক স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার অভিভাষণ দ্বারা বিরাট সভাকে যেন সম্মোহিনী শক্তি-বলে মোহিত করিয়া রাখিয়া-ছিলেন। প্রত্যেক খৃষ্টান চার্চের অন্তর্গত ধর্মযাজক এবং ধর্ম-প্রচারকগণ তথায় উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহাদের বক্তব্য উপস্থাপিত করিয়াছিলেন কিন্তু স্বামীজির বাগ্মিতার বাত্যাতরঙ্গে তাঁহাদের বক্তব্য বিষয়সমূহ ভাসিয়া গিয়াছিল।" "হিন্দু-ধর্ম এই মহাসভা এবং জনসাধারণের উপর যে প্রভাব বিস্তার

করিয়াছে, অপর কোন ধর্ম তদ্রূপ করিতে সমর্থ হয় নাই। হিন্দু-ধর্মের একমাত্র আদর্শ-প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দই এই মহাসভার অবিসংবাদিতরূপে সর্বাপেক্ষা লোক-প্রিয় এবং প্রভাবান্বিত ব্যক্তি।"

তিনি আপন যোগ্যতা বলেই আপনি প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন এবং তিনি যে শুধু হিন্দু-ধর্মেরই প্রতিনিধি ছিলেন তাহাও বলিতে পারা যায় না, কারণ তিনি ভারতীয় সকল ধর্ম মতেরই প্রতিনিধিরূপে স্বদেশের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন ভারতীয় সভ্যতার জীবন্ত বিগ্রহস্বরূপ। ভারত বহির্ভূত দেশসমূহ ভারতীয় সভ্যতার স্বরূপের সহিত পরিচিত ছিল না বলিয়াই বিকৃত কল্পনাসমূহের আশ্রয়ে কিম্ভূত-কিমাকার ধারণার পোষকতায় গর্ববোধ :করিত। তিনিই পৃথিবীর সকল প্রাজ্ঞব্যক্তির সমক্ষে ভারতীয় সভ্যতার বিশেষতঃ হিন্দু-ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করিয়া জগতের মধ্যে ভারতের স্থান কোথায় এবং কিরূপ তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। যদিও ভারতীয় অপরাপর ধর্ম-প্রতিনিধিগণ মহাসভায় উপস্থিত ছিলেন এবং নিজ নিজ ধর্ম সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করিবার জন্য বক্তৃতাদি করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন তথাপি তাঁহাদের সম্প্রদায়িক সংকীর্ণ মতবাদ জনসাধারণের হৃদয়ে কোন-প্রকার স্পন্দনই জাগাইতে সমর্থ হয় নাই। স্বামীজির সার্বজনীন আদর্শই সকলের চিত্ত অধিকার করিল, কারণ উহাই বর্তমান কালের একমাত্র উপযোগী আদর্শ। শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক নির্দেশিত এবং বিবেকানন্দ কর্তৃক প্রচারিত এই আদর্শ পাশ্চাত্য চিন্তা-ধারায় প্রবল আলোড়ন তুলিতে সমর্থ হইয়াছিল। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসকে ঈশ্বরাবতার রূপে তুলিয়া ধরিলেন না; তাঁহাকে জগৎসমক্ষে প্রতিষ্ঠা করিলেন সর্বভাবের ধারকরূপে, হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুশ্লিম সকল ভাবের সমন্বয়াচার্যরূপে।

তাঁহারই সর্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ 'যত মত তত পথ'। তাহারই প্রতিধ্বনি—"যুদ্ধ নহে সাহায্য; ধ্বংস নহে সংশোধন করিয়া লওয়া; ভেদাভেদ নহে সামঞ্জস্য ও শান্তি।" স্বামীজির নীতিই ছিল গঠন মূলক। সমাজের দোষ ত্রুটির জন্য তিনি ভাবিতেন না। শুভকর্মের অনুষ্ঠান করিলেই আপনা হইতে সমাজ-সংস্কার হইবে ইহাই তিনি বিশ্বাস করিতেন। কারণ সকল দেশেই সমাজদেহ ত্রুটি-বিচ্যুতি লইয়াই গঠিত, কেবল নিন্দাবাদে তাহার সংশোধন অসম্ভব। অবশ্য আচার্যের কার্য দোষত্রুটি নির্ভীক ভাবে সকলের সম্মুখে তুলিয়া ধরা এবং সুস্থ আদর্শ স্থাপন করা। সমাজ আপন প্রয়োজনবশেই পুনর্গঠিত হইবে। তাঁহার সহিত সমাজ সংস্কারদের মতভেদ শুধু নীতিগত পার্থক্য লইয়া। সংস্কারকগণ চাহেন সমাজদেহ ভাঙ্গিয়া নূতনভাবে গঠন করিতে আর তিনি চাহেন ধর্মের মাধ্যমে সমাজের দোষ-ত্রুটি দূর করিতে, সহায়তা করিতে। তিনি পাশ্চাত্য দেশের দোষ-গুণগুলিও নির্ভীকভাবে সমালোচনা করিয়া তাহাদের সহায়তাই করিয়াছিলেন। কিন্তু সকল দেশে সকল কালেই কতগুলি গোঁড়া স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন, যাহারা নিজ নিজ সঙ্কীর্ণ বুদ্ধিবশে মহান দেশ-নায়কগণের কার্যেরও সমালোচনা ও বিরূদ্ধাচারণ করিতে সতত প্রয়াসী হয়। অবশ্য ইহাতে মহাপুরুষগণের চরিত্রের দৃঢ়তা ও তেজস্বীতাই অধিকতর বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আমেরিকায় স্বামীজি মহারাজের প্রভাব যখন সর্বত্র লক্ষিত হইতে লাগিল এবং তিনি রাজোচিত সম্মানে ভূষিত হইতে লাগিলেন, তখন তদ্দেশীয় তথাকথিত কয়েকটি 'মিশনারী' ও ভারতীয় জনৈক অল্পজ্ঞ ব্রাহ্মসমাজ-নেতা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অশোভন আচরণ ও তাঁহার কার্যের সফলতায় বিদ্বেষপরায়ণ হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে তাঁহার বিরুদ্ধাচারণ করিতে অগ্রসর হইয়া নিজদিগকেই অধিকতর উপহাসাস্পদ করিয়াছিলেন। তিনি অবশ্য এসকলের

জন্য কোন প্রতিবাদই করিতে অগ্রসর হন নাই। কারণ ঈশ্বরের প্রত্যাদেশেই তিনি পাশ্চাত্য দেশে গমন করিয়াছিলেন এবং নিজকে 'বার্তা-বাহক' মাত্র জানিয়া সকল মান-যশ ফলাফল ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে যাহারা তাঁহার নাম ভাঙ্গাইয়া পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠা-অর্জনে প্রয়াসী হইয়াছিল তাহারাই বিদেশে কিরূপে তাঁহাকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার হীন চেষ্টা করিয়াছিল। "খৃষ্টান মিশনারীরা আমার বিরুদ্ধে এরূপ ভয়ানক মিথ্যা সংবাদ রটাইয়াছিল, যাহা কল্পনায়ও আনিতে পারা যায় না। তাহারা আমাকে প্রত্যেক বাড়ী হইতে তাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল এবং যে কেহ আমার বন্ধু হইল, তাহাকেই আমার শত্রু করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহারা আমেরিকাবাসী সকলকে আমাকে লাথি মারিয়া তাড়াইয়া দিতে এবং অনশনে মারিয়া ফেলিতে বলিতে লাগিল। আর আমার বলিতে লজ্জা বোধ হইতেছে যে, আমার একজন স্বদেশবাসী হইাতে যোগ দিয়াছিলেন আর তিনি ভারতের সংস্কারক-দলের একজন নেতা।" আবার থিয়োজফিষ্ট দলের একজন বিশিষ্ট নেতা লিখিয়াছিলেন "শয়তানটা শীঘ্র মরিবে, ঈশ্বরেচ্ছায় বাঁচা গেল।" মানুষ এমন করিয়াই নিজের পরশ্রীকাতরতার পরিচয় প্রদান করিয়া উল্লাস বোধ করে! স্বামীজি মহারাজের দেহান্তের। অনেক কাল পরে থিয়োজফিষ্ট ডাঃ এনি বেসান্ত স্বামীজির প্রতি অবিচারের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ, "আমেরিকায় তাঁহার প্রভাবের" সত্যঘটনা সংবাদপত্র মারফৎ প্রকাশ করিয়া আত্মশুদ্ধি করিয়াছিলেন। স্বামীজি মহারাজ আত্মবলে বলিয়ান্ হইয়াই নির্বিকার-চিত্তে সকল প্রতিকুলতা ও পীড়ন অম্লানবদনে সহ্য করিয়া নিজ-কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি ঈশ্বর কর্তৃক আদিষ্ট। যত বিঘ্নই উপস্থিত হউক না কেন,

তাঁহার গতি কে রোধ করিবে? যিনি একরূপ বিনা আচ্ছাদনেই তাপযন্ত্রের শূন্য ডিগ্রীর ৩০ ডিগ্রী নীচের শীতে বাস করিতে সাহসী হইয়াছিলেন, যাঁহার সেখানেও কাল কি খাইবেন তাহার ঠিক ছিল না, সেই ব্যক্তির কার্যের বিঘ্ন-উৎপাদনের চেষ্টা নিতান্তই হাস্যকর। সাধনায় সার্থক স্বামীজির উজ্জ্বল প্রতিভায় দোষারোপের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছিল। তিনি সনাতন হিন্দু-ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব অপরাপর ধর্মাবলম্বীগণের সম্মুখে অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণভাবে স্থাপন করিয়া বেদান্তই যে "সকল ধর্মের জননী" তাহাও প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। আমেরিকার একখানি বিশিষ্ট পত্রিকা লিখিয়াছেন—"স্বামীজির ন্যায় দার্শনিক ব্যক্তিকে দেখিয়া বুঝিতেছি যে আমরা ভারতে ধর্ম-শিক্ষার জন্য মিশনারীদিগকে পাঠাইয়া কতই না ভুল করিতেছি।" অথচ আশ্চর্য বোধ হইবে যে, শুধু ভারতবর্ষেই মিশনারীদিগের জন্য প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে সাড়ে নয় কোটি টাকা বর্তমানেও ব্যয়িত হয়। যাহাই হউক, তাঁহার প্রখর বাগ্মিতায় ভারতীয় সভ্যতার স্বরূপ ও ধর্মের তত্ত্ব অবগত হইয়া পাশ্চাত্য দেশ ভারতের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়াছেন। একখানি পত্রিকা স্বামীজির প্রতিভার পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছিল—"যে ব্যক্তি স্বামীজিকে তর্ক যুক্তির দ্বারা পরাজিত করিবার প্রয়াসী হইয়াছে, সে দুর্ভাগার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে। তাঁহার প্রত্যুত্তর বিদ্যুৎ-স্ফুরণবৎ সমুদ্গীর্ণ হইত এবং দুঃসাহসিক প্রশ্নকর্তা এই ভারতীয়ের ক্ষুরধার বুদ্ধিদ্বারা আহত হইয়া স্তম্ভিতবৎ প্রতীয়মান হইতেন। তাঁহার মানসিক কার্য প্রণালী এমন তীক্ষ্ণ, এমন সমুজ্জ্বল, এমন তত্ত্ব-পরিপূর্ণ, এমন সুমার্জিত যে, তাহা সময়ে সময়ে শ্রোতৃ-বৃন্দকে তড়িতাহতবৎ করিত, এবং সর্বদাই তাহা সকলের নিকট কৌতুহলোদ্দীপক অনুধাবনযোগ্য বিষয় হইয়া থাকিত।"

পাশ্চাত্য দেশের বিভিন্ন সহরে, সঙ্ঘ সমিতি ও বিভিন্ন

গির্জায় তিনি প্রতিদিনই বক্তৃতা করিতেন। বিভিন্ন বিষয়বস্তু, ধর্ম, সংস্কৃতি ও বেদান্তবাণী সম্বন্ধে তিনি শত শত বক্তৃতা করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার অনেকগুলিই সংরক্ষিত হয় নাই। কারণ তিনি প্রায়শঃ বক্তৃতা লিখিয়া প্রদান করিতেন না। নিয়ত কি অসীম ধৈর্যে, অধ্যবসায় ও আত্মবিশ্বাসে নিজের বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন ভাবিলে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়।

যে কোনও সম্প্রদায়ের ত্রুটী দেখিলে তিনি তাহা উদ্‌ঘাটিত করিয়া কঠোর সমালোচনা করিতেন বলিয়া অনেকে তাঁহার প্রতি অযথা শত্রুভাবাপন্ন হইয়া উঠিতেন। এই জন্য তাঁহার বন্ধুবর্গ কখনও কখনও তাঁহাকে ঐরূপ সমালোচনা হইতে বিরত হইবার অনুরোধ করিতেন। কিন্তু তিনি এইরূপ সদিচ্ছা-প্রণোদিত অনুরোধ হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। কখনও বা দীপ্ত-কণ্ঠে সন্ন্যাসীর আদর্শের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিতেন—"সত্য নিজেই নিজের পথ করিয়া লইবে, বিশ্বাস কর, সত্যই জয়ী হইবে।" তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সকল মানুষের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাইয়াছেন—"অগ্রসর হও, অগ্রসর হও"—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ্ নিবোধত।"

এই আচার্যকে পাশ্চাত্য-দেশবাসী ঈশ্বর-প্রেরিত দূত-রূপে গ্রহণ করিয়াছিল এবং বুঝিয়াছিল যে তিনি তাহাদের সকল প্রকার জাতীয় ও ধর্মীয় অজ্ঞানতা দূরীকরণে সমর্থ। তাঁহার অপূর্ব উদার ধর্ম-ব্যাখ্যানে আকৃষ্ট হইয়া ইতিমধ্যেই কয়েকজন তাঁহার শিষ্যত্বে উন্নীত হইয়া নিয়মিত শিক্ষা-গ্রহণে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিল। ক্রমে এই শ্রেণীর সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সঙ্ঘে পরিণত হইল। নিউইয়র্কের এই নিয়মিত শিক্ষাবিভাগের অনেকেই পরে স্বামীজি মহারাজের প্রচার-কার্যে আত্মোৎসর্গ করিয়া সন্ন্যাসের মহান ব্রতে দীক্ষাগ্রহণে স্বামী অভয়ানন্দ, কৃপানন্দ প্রভৃতি নামে ভূষিত হইয়া সারাজীবন শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শে অতিবাহিত করিয়া-

ছিলেন। অনেক অনুরাগী দীক্ষিত স্ত্রী-পুরুষ স্বামীজি-প্রবর্তিত সঙ্ঘে যোগ দিয়া ভারতীয় জনসাধারণের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিয়া যথার্থ ধর্ম-জীবন যাপনে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

নিউইয়র্কের উক্ত আবাসটি ক্রমে ক্রমে একটি আশ্রম-গৃহে পরিণত হইয়া অনেকেরই ধর্ম-পিপাসা নিবৃত্তির সহায়ক হইয়াছিল। ঐ সময়ে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলিই পরে 'রাজযোগ' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং উহাতে স্বামীজি মহারাজের উচ্চতর চিন্তা ও মনস্তত্ত্বের যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণ পাশ্চাত্য-দেশকে চমৎকৃত করিয়াছিল।

অবিরত বক্তৃতা-প্রদান এবং অনুরাগীবৃন্দের আত্মোন্নতির জন্য তিনি প্রায় সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকিতেন। ফলে তাঁহার ক্লান্ত শরীর-মন নির্জনে বিশ্রাম লইবার জন্য একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি 'সহস্র দ্বীপোদ্যান' নামক একটি মনোরম দ্বীপে কয়েকজন বিশেষ অনুরাগী শিষ্য-সমভিব্যাহারে রওয়ানা হইয়া গেলেন। সত্যই তাঁহার বিশ্রামের একান্ত প্রয়োজনও ছিল। তিনি বলিয়াছিলেন—"বাস্তবিক আমি অবিরাম কাজ ক'রে ক'রে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমি যেরূপ কঠোর পরিশ্রম করেছি, আর কোন হিন্দুকে এরূপ করতে হলে সে এত দিনে রক্ত বমি করে মরে যেত।" তথায় স্বামীজি মহারাজ প্রায় দুই মাস বিশ্রাম করিয়াছিলেন এবং প্রতিদিন শিষ্যগণের ঐকান্তিক ধর্মাকাঙ্ক্ষা মিটাইবার জন্য আচার্যের বেদী হইতে গভীর উপলব্ধ বিষয়সকল বিবৃত করিয়া তাহাদের সকলের মধ্যে অনুভূতির দ্বার খুলিয়া দিয়াছিলেন। যে কয়টি অন্তরঙ্গ শিষ্য ঐ কালে তাঁহার সান্নিধ্যে উপস্থিত হইয়া উপদেশ গ্রহণে কৃতার্থ হইয়াছিলেন তাহাদের তীব্র বৈরাগ্য এবং গুরুভক্তি সত্যই অতুলনীয়। তিনিও এই সময়ে অন্তর্জগতের গভীর প্রদেশে প্রায় সর্বক্ষণ নিজের মনকে নিয়োজিত রাখিয়া ও দিব্যভাবে আরূঢ় থাকিয়া পার্ষদ সহচরগণের সম্মুখে ধর্মানুভূতির এক প্রোজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন। এইরূপে সর্বক্ষণ উচ্চ হইতে উচ্চতর ধর্মতত্ত্ব লইয়া মনকে দীর্ঘ দুইমাস কাল

নিরন্তর সমাহিত করিয়া রাখা স্বামীজি মহারাজের জীবনে বোধ হয় প্রথম।

এই সময়ের বর্ণনাপ্রসঙ্গে পার্ষদগণের একজন লিখিয়াছেন—"যেন জ্বালাময়ী ঐশীশক্তি অবতরণ করিয়া পুরাকালে খৃষ্টশিষ্যগণের ন্যায় আচার্যদেবকেও স্পর্শ করিয়াছিল। তাঁহার গুরুদেবই যেন সূক্ষ্মশরীরে তাঁহার মুখাবলম্বনে আমাদিগকে উপদেশ দিতেন, আমাদের সকল সন্দেহ মিটাইয়া দিতেন, সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেন এবং সমুদয় ভয় দূর করিতেন। অনেক সময়ে স্বামীজি যেন আমাদের উপস্থিতিই ভুলিয়া যাইতেন। আমরা পাছে তাঁহার চিন্তা প্রবাহে বাধা দিয়া ফেলি এই ভয়ে যেন শ্বাসরুদ্ধ করিয়া থাকিতাম।"

ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় কত গভীর আধ্যাত্মভাবে নিমগ্ন থাকিয়া তিনি ঐ সময় সকল প্রকারে শিষ্যগণের আত্মোন্নতির সহায়তা করিয়াছিলেন। শিষ্যগণও যে অত্যন্ত আন্তরিকতা লইয়া তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহাও বেশ বুঝিতে পারা যায়।

একজন বলিয়াছিলেন—"ভগবান ঈশা এখনও পৃথিবীতে বর্তমান থাকিলে যেরূপে আমরা তাঁহার নিকট যাইতাম এবং উপদেশ ভিক্ষা করিতাম, আমরা আপনার নিকট সেইরূপেই আসিয়াছি।" ইহা যে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তির নিদর্শন তাহা কি আর বলিতে হইবে? এইরূপ আন্তরিকতা থাকিলেই তাঁহার ন্যায় শ্রীগুরুলাভে শিষ্য কৃত-কৃতার্থ হন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলিতেন "মা রাশ ঠেলে দিচ্ছেন" তেমনই স্বামীজির মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায় কে যেন তাঁহাকে 'রাশ' ঠেলিয়া দিতেছেন—নূতন নূতন ভাব, নূতন নূতন তত্ত্ব, কত গবেষণাপূর্ণ বিবৃতি উপদিষ্ট হইতেছে। ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম, রাষ্ট্র, সমাজ—কিছুই তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া যায় নাই। এই নবীন সংস্কারক স্বামী বিবেকানন্দ, অতীতের আবর্জনা-

পূর্ণ ধ্বংসাবশেষের মধ্য হইতে জীবনপ্রদ তত্ত্বকে উদ্ধার করিয়া লোকচক্ষুর সম্মুখে স্থাপন করিয়া সতেজ সবল চরিত্র গঠনে সকলকে অনুপ্রাণিত করিতেন। তাই তাঁহার দিব্যসঙ্গে যাঁহারা বাস করিতেন তাহারাও জ্বলন্ত-জীবন্ত চরিত্র গঠনে তৎপর হইতেন। তিনি বলিতেন—"সকলেই আজ্ঞা দিতে চায়, আজ্ঞা পালন করিতে কেহই প্রস্তুত নহে। প্রথমে আজ্ঞা পালন করিতে শিক্ষা কর, আজ্ঞা দিবার শক্তি আপনা হইতেই আসিবে। সর্বদাই দাস হইতে শিক্ষা কর, তবেই প্রভূ হইতে পারিবে।" প্রাচীন কালের ঋষিগণ-প্রদর্শিত বলিষ্ঠ আদর্শে সমাজ-জীবন পুষ্ট হউক ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। তিনি বলিতেন—"যাও, যাও সেই প্রাচীন কালের ভাব লইয়া এস, যখন জাতীয় শরীরে বীর্য ও জীবন ছিল। তোমরা আবার বীর্যবান হও, সেই প্রাচীন নির্ঝরিণীর জল আবার প্রাণ ভরিয়া পান কর। ইহা ব্যতীত ভারতের বাঁচিবার আর উপায় নাই।"

আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ "সহস্র-দ্বীপে" বিশ্রামান্তে শরীর-মনের অধিকতর প্রশান্তি লইয়া পুনরায় কর্মক্ষেত্রে নূতন উদ্যমে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এবার তিনি কেবলমাত্র বক্তৃতা করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। যাহাতে তাঁহার প্রচারকার্য অধিকতর ফলপ্রসু হয় তদ্‌বিষয়ে যত্নশীল হইলেন। ইতিমধ্যে তিনি কয়েক জনকে উপযুক্ত সহকর্মী ও শিষ্যরূপে গঠন করিয়া লইয়াছিলেন। দিন দিন তাঁহার কার্য স্থায়ীরূপে এবং নিশ্চিতরূপে অগ্রসর হইয়া পাকাপাকিভাবে 'কেন্দ্র' গঠন করিয়া লইল। তিনি লিখিলেন—"এখন এদেশে আর বিলেতে আমার গোড়া বেঁধে গেছে, কারু সাধ্যি কি তা টলায়? নিউইয়র্ক এবার তোলপাড়। আস্‌ছে গর্‌মিতে লণ্ডন তোলপাড়! বড় বড় হাতি দিগ্‌গজ ভেসে যাবে। পুঁঠি পাঁঠার কি খবর রে দাদা? তোরা কোমর বেঁধে লেগে যা দেখি, হুহুঙ্কারে দুনিয়া তোলপাড়

ক'রে দেব। এই তো সন্ধ্যে বেলারে ভাই! দেশে কি আর মানুষ আছে? ও শ্মশানপুরী!"

এখন হইতেই স্থায়ীভাবে তাঁহার কাজ প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিল বুঝিতে পারা যায়। আন্তর্জাতিক খ্যাতি, যশ বা প্রতিষ্ঠা নহে পরন্তু গুরু-নির্ভরতা ও ঈশ্বর-নির্ভরতা তাঁহাকে সকল বাধা বিপত্তি জয় করিতে সহায়তা করিয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন—"আমি কোন লোক বা জিনিষের উপর নির্ভর করি না, একমাত্র প্রভুই আমার ভরসা এবং তিনি আমার ভেতর দিয়ে কাজ কর্‌ছেন।"

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ, এই দুই বৎসর বেশীর ভাগ সময় তাঁহাকে অতি কঠোর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। "মরিবার পর্যন্ত সময় নাই; দিবা-রাত্র কাজ, কাজ, কাজ!" এই ভাবেই তাঁহার কার্যের গোড়া পত্তন সম্ভব হইয়াছিল। তাঁহার কঠোর অধ্যবসায়ের ফলেই পাশ্চাত্যে বেদান্ত-জ্ঞানের বিস্তার সম্ভব হইয়াছিল। পাশ্চাত্য জড়বাদ ও ভোগৈষণা পাশ্চাত্যবাসিগণকে তৃপ্তি বা শান্তি দিতে পারে নাই। বেদান্তের অদ্বৈত সাম্য-বাদের নিবৃত্তি-পথে তাহারা অধিকতর শান্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইল।

আমেরিকায় স্বামীজি মহারাজের প্রচারকার্য তড়িৎ-গতিতে চতুর্দিকে ছড়াইয়া তাঁহাকে অধিকতর ব্যস্ততার মধ্যে ব্যাপৃত রাখিলেও লণ্ডনের ভক্ত ও অনুরাগীবৃন্দ তথায় তাঁহার উপস্থিতি বিশেষ ভাবে কামনা করিতেছিলেন। সুতরাং তিনি ভারত হইতে তাঁহার সুযোগ্য গুরুভ্রাতা স্বামী সারদানন্দ মহারাজকে আনাইয়া তাঁহার উপর নিউইয়র্ক বেদান্ত-কেন্দ্র পরিচালনার তথা সমগ্র আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারের দায়িত্ব অর্পণ করিয়া ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। ইংলণ্ডে আসিয়া তিনি সমভাবেই কর্মব্যস্ত হইয়া পড়িলেন এবং ক্রমাগত বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা করিয়া বেদান্ত-মত ও আদর্শ প্রচার করিতে লাগিলেন।

তাঁহার প্রচারকার্য নিশ্চিতভাবে সফলতার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাঁহার ভক্ত ও অনুরাগীর সংখ্যাও দ্রুতগতিতে বাড়িতে লাগিল। মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই ইংলণ্ডের চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ তাঁহার প্রশংসায় মুখর হইয়া তাঁহাকে পরম বন্ধুরূপে গ্রহণ করিলেন।

তাঁহার অতীন্দ্রিয় শক্তি, চরিত্র-মাধুর্য ও অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য ধীসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই তাঁহার অনুগামী হইয়া উঠিত। তিনি আশৈশবই যুক্তি-তর্ক দ্বারা অপরের অযৌক্তিক মত-খণ্ডন ও স্বমত-স্থাপনে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। নানা প্রতিকুলতা সত্ত্বেও তিনি সনাতন ধর্মের গভীর তত্ত্বই জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে পাশ্চাত্য দেশোপযোগী করিয়া সর্ব-সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন।

ভারতীয় আদর্শের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগের জন্য তিনি গর্ব বোধ করিতেন। তিনি যখন ভারতবাসী হিসাবে হোটেলে বা অপর কোন স্থানে অবজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন তখনও নিজকে হেয় জ্ঞান করিয়া অনুতপ্ত হন নাই। ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস তিনি জানিতেন। পরাধীন দুর্বল জাতির প্রতি তাহারা কি প্রকার সমবেদনা-সম্পন্ন তাহাও তাঁহার অবিদিত ছিল না। কাজেই নির্বিকার-চিত্তে সকল অত্যাচার সহ্য করিয়া নিজের পথ প্রশস্ত করিয়া লইয়াছিলেন।

যুক্তিবাদী ইউরোপ ভারতের ধর্ম ও দর্শনের মতবাদকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন অথবা বড় জোর এক প্রকার 'মিষ্টিসিজম্' বলিয়া মনে করিতেন। এই কারণেই তাঁহারা ভারতীয়দিগকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিতেন। স্বামীজি 'মিষ্টিসিজম্' এর পরিবর্তে শুদ্ধ যুক্তিবাদ অবলম্বন করিয়াই ভারতীয় ধর্ম-দর্শনের মতসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। ফলে ইউরোপীয়গণ ভারতীয় ধর্ম-দর্শনের গভীর ও অতি সূক্ষ্ম তত্ত্ব-সকল অনুধাবন করিতে সমর্থ হইলেন এবং তৎপ্রতি

শ্রদ্ধাশীল হইয়া উঠিলেন। ভারতীয়দিগের প্রতি তাঁহাদের অবজ্ঞার ভাবও ধীরে ধীরে মন্দীভূত হইতে লাগিল। ইংলণ্ডে স্বামীজির কার্য স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করিল।

ঐ সময়ে তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য লণ্ডনের ক্যাপ্টেন সেভিয়ারের আগ্রহে ও সমভিব্যাহারে স্বামীজি জেনেভা প্রভৃতি স্থান দর্শন ও আল্পস্ পর্বতাদি পরিভ্রমণ করেন। তৎপরে জার্মানীর কীয়েল নগরীতে পৌঁছিয়া প্রসিদ্ধ অধ্যাপক পল্ ডয়সনের আতিথ্য গ্রহণ করেন। অধ্যাপক মহোদয় বেদান্ত দর্শনে, উপনিষদ প্রভৃতিতে বিশেষ অনুরাগী ও পারদর্শী ছিলেন। তিনি স্বামীজি মহারাজকে নিকটে পাইয়া দর্শনাদি সম্বন্ধে আগ্রহের সহিত আলোচনা করিয়া অত্যন্ত সুখী হইয়াছিলেন। স্বামীজিও তাঁহার গুণগ্রাহিতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে অন্তরঙ্গ সুহৃদ্‌রূপে গ্রহণ করেন।

এই পণ্ডিত অধ্যাপকই একদিন স্বামীজি মহারাজের অদ্‌ভূত স্মৃতিশক্তির পরিচয় পাইয়া অত্যধিক আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলেন। তিনি অধ্যাপকের বৃহৎ একখানি পুস্তক অতি অল্প সময়ের মধ্যে অধ্যয়ন করিয়া পুস্তকের সকল অংশ কণ্ঠস্থ করিয়া লইয়াছেন বলেন। অধ্যাপক স্বামীজি মহারাজের কথায় সন্দিগ্ধ হইলে, তিনি পুস্তকখানি হইতে অনেকাংশ আবৃত্তি করিয়া শুনাইলেন। ইহাতে অধ্যাপক মহোদয় বিস্ময়ের সহিত বলিয়াছিলেন—"কেবলমাত্র চোখ বুলাইয়া চারিশত পৃষ্ঠার একখানি পুস্তক অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে আয়ত্ব করা শুধু দুঃসাধ্য নহে অসাধ্য!"

এই প্রসঙ্গে অনুরূপ আর একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। একবার তাঁহার শিষ্য শরৎচন্দ্র কয়েকখণ্ডবিশিষ্ট কোন বৃহৎ পুস্তক দেখিয়া স্বামীজির সম্মুখে বলিয়াছিলেন এত বৃহৎ পুস্তক এক জীবনে অধ্যয়ন অত্যন্ত কঠিন। তাহাতে স্বামীজি বলিয়াছিলেন "সে কি, আমি কয়েক দিনেই এই পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া ফেলিতে পারি।" বস্তুতঃ স্বামীজি মহারাজ কয়েক দিনেই ঐ

বৃহদাকার পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া কয়েক খণ্ডের প্রতিটি অধ্যায় আবৃত্তি করিয়া শিষ্যকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন।

পাশ্চাত্য দেশে প্রচারকালে স্বামীজি মহারাজের মধ্যে আর একটি অভূতপূর্ব শক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহাকে যখন প্রতিদিন দুই-তিনটি করিয়া কখনও বা ততোধিক বক্তৃতা দিতে হইত তখন প্রায়ই বক্তৃতার বিষয়বস্তু ভাবিবার অবকাশ পর্যন্ত পাইতেন না। ক্লান্ত দেহমনে রাত্রিতে শয়ন করিয়া নিদ্রাভিভূত হইলে তিনি শুনিতে পাইতেন, কে যেন তাঁহার শয্যা-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নূতন নূতন বিষয়বস্তু সম্বন্ধে অনর্গল বক্তৃতা করিয়া চলিয়াছেন। স্বপ্ন-শ্রুত বক্তৃতা তাঁহার মানসপটে দৃঢ় অঙ্কিত হইয়া যাইত এবং ঐ শ্রুত বিষয়ই পর দিবসের বক্তৃতার তালিকায় নির্দিষ্ট হইত।

বাস্তবিক ঐ সময় তাঁহার মধ্যে গুরু বা আচার্য ভাবের যেরূপ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় তেমনটি তৎপূর্বে কখনও দৃষ্ট হয় নাই। এই ভাবের আরও অনেক ঘটনা যেন ঈশ্বরাবেশে নিষ্পন্ন হইয়া স্বামীজি মহারাজের বিবিধ কার্যের সহায়ক হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনে যেমন সকল ভাবের সমন্বয় ও আধ্যাত্মিক ভাবের উচ্চ উচ্চ অবস্থা উপস্থিত হইয়া দিব্যভাবে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, তেমনই স্বামীজি মহারাজের জীবনেও সে সকলের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় নাই। ঐ সময়ে তিনি অনেকের মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চারিত করিয়া বা শ্রীশ্রীঠাকুরের ন্যায় অপরকে স্পর্শ করিয়া তাহার জীবনের গতি এককালে পরিবর্তিত করিয়া দিতেন। ভগিনী নিবেদিতা মিস্ ম্যাক্‌লাউড প্রভৃতি এবং কোন কোন ভারতীয় শিষ্যের জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। স্বামীজি মহারাজ বলিয়াছিলেন—"আমি যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি তা নয়; কিন্তু পরবর্তী অধ্যায় হবে বাক্যে নয়, অলৌকিক স্পর্শে, যেমন

শ্রীরামকৃষ্ণে ছিল।" ইহাতেই অনুমিত হয় এই কালে তাঁহার মধ্যে আধ্যাত্মিকতার চরম পরিণতি উপস্থিত হইয়াছিল।

বক্তৃতাকালে তাঁহার আত্মিক শক্তি শ্রোতাগণের মনে বক্তব্য-বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাইয়া তাহাদিগকে মুগ্ধ করিয়া দিত। একজন পাশ্চাত্য শিষ্য লিখিয়াছেন—"দশ মিনিট যাইতে না যাইতেই অনুভব করিতাম, আমরা সূক্ষ্ম জীবনপ্রদ, রহস্যময় ভাবরাজ্যে নীত হইয়াছি। আমরা মন্ত্র-মুগ্ধবৎ রুদ্ধ-শ্বাসে বক্তৃতার শেষ পর্যন্ত শ্রবণ করিতাম।" শ্রীরামকৃষ্ণের জীবদ্দশাতেই স্বামীজির মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ হইতে আরম্ভ হয়। যখন শ্রীরামকৃষ্ণ অসুস্থ হইয়া কাশীপুর বাগান বাটীতে অবস্থান করিতেছেন তৎকালে স্বামীজি মহারাজ স্বীয় গুরুভ্রাতা স্বামী অভেদানন্দজীকে স্পর্শ করিয়া শক্তি-সঞ্চারে প্রয়াসী হইয়াছিলেন এবং গুরুভ্রাতাও অনুভব করিয়াছিলেন যে স্বামীজির মধ্যে অদ্‌ভুত শক্তির আবির্ভাবে ঘটিয়াছে। কিন্তু এখনকার ন্যায় এমন প্রবল ভাবে আত্মিক শক্তি আর কখনও প্রকাশিত হইয়াছিল কিনা অবশ্যই বলা শক্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার এই মহান শিষ্যটিকে আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চারের দ্বারা সর্ব শ্রেষ্ঠ আচার্যরূপে গঠন করিয়াছিলেন এবং তিনিও যথার্থরূপে অধিকারী হইয়া 'ধর্ম ও প্রেমে' শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায়ই হৃদয়বত্তা লাভ করিয়াছিলেন। এমন অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে যে, কেবল মাত্র দৃষ্টি দ্বারাও তিনি অনেকের চরিত্রের আমূল পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছেন। যুক্তিবাদ, হৃদয়বত্তা এবং আধ্যাত্মিক শক্তিই তাঁহাকে পাশ্চাত্য দেশে ভারতীয় ভাবধারা ও আদর্শ-প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ করিয়াছিল।

ইংলণ্ডে সহস্র কর্মে লিপ্ত থাকিলেও তিনি আমেরিকায় আরব্ধ প্রচারকার্যের পরিচালনা—বিষয়ে সবিশেষ দৃষ্টি রাখিতেছিলেন। তিনি আমেরিকার কার্য পরিচালনার ভার স্বামী সারদানন্দ এবং

যথোপযুক্তভাবে গঠিত কয়েকজন আমেরিকান শিষ্যের উপর ন্যস্ত করিয়া আসিয়াছিলেন। এক্ষণে আমেরিকায় কার্যের ব্যপকতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায়, তিনি গুরুভ্রাতা স্বামী অভেদানন্দ মহারাজকে ভারত হইতে ইংলণ্ডে আনাইয়া তথা হইতে তাঁহাকে আমেরিকায় পাঠাইয়া আমেরিকার প্রচারকার্যকে অধিকতর শক্তিশালী করিবার ব্যবস্থা করিলেন।

অতঃপর তিনি জন্মভূমি ভারতে আসিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। অবশ্য ভারতের শিষ্য-মণ্ডলী, গুরুভ্রাতাগণ ও শুভানুধ্যায়ী বন্ধুগণ তাঁহাকে পুনঃপুনঃ ফিরিয়া আসিবার জন্য লিখিতেছিলেন। ভারতের জনসাধারণও তাঁহার আগমনের জন্য বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনিও ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন। ভারতের দরিদ্র জনসাধারণকে হীনমন্যতার পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়া তাহাদিগকে আত্মমর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তিনি একান্ত উদ্গ্রীব ছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—"এই দরিদ্রদিগকে, ভারতের পদদলিত জনসাধারণকে, তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝাইতে হইবে, জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সবলতা-দুর্বলতার বিচার না করিয়া প্রত্যেক নরনারীকে, প্রত্যেক বালক-বালিকাকে শোনাও ও শিখাও যে, সবল-দুর্বল উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সকলের ভিতর সেই অনন্ত আত্মা রহিয়াছেন। সুতরাং সকলেই মহৎ হইতে পারে, সকলেই সাধু হইতে পারে।"

তিনি আরও বলিয়াছিলেন—"লক্ষ নরনারী পবিত্রতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ভগবানে দৃঢ়-বিশ্বাস-রূপ বর্মে সজ্জিত হইয়া দরিদ্র পতিত ও পদদলিতদের প্রতি সহানুভূতি-জনিত সিংহ-বিক্রমে বুক বাঁধিয়া সমগ্র ভারতে ভ্রমণ করুক। মুক্তি, সেবা, সামাজিক উন্নয়ন ও সাম্যের মঙ্গলময়ী বার্তা দ্বারে দ্বারে প্রচার করুক।"

এই উদ্দেশ্যকে কার্যে পরিণত করিবার জন্যই ভারতে স্থায়ী

কেন্দ্র স্থাপনে তিনি বিশেষ যত্নপর হইয়াছিলেন। বুঝিয়াছিলেন লক্ষ লক্ষ পতিত অজ্ঞ জনসাধারণকে জ্ঞান-বিজ্ঞানালোকে উন্নত করিতে না পারিলে জাতীয় জাগরণ অসম্ভব। বুঝিয়াছিলেন সমাজ বলিতে পতিত নিম্ন শ্রেণী, যাহাদের শতকরা নব্বই জন নিরক্ষর, তাহাদিগকেই বুঝায়; সুতরাং সর্বাগ্রে তাহাদেরই উন্নয়ন আবশ্যক।

এমন মনুষ্যত্বের দাবী লইয়া, এমন বিশাল হৃদয়বত্তা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি জনচিত্ত জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, যাহা তৎকালীন অন্য কোন সমাজ সংস্কারকের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। সমবেদনা ও হৃদয়বত্তার অভাবেই জনচিত্তে কোন আলোড়ন সৃষ্টি করিতে না পারিয়া সংস্কারকগণ ব্যর্থকাম হইয়াছিলেন।

ইংলণ্ড হইতে ভারতে আগমনের জন্য প্রস্তুত হইয়া তিনি যখন নির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা করিলেন তখন ইংলণ্ডবাসী শিষ্য ও শুভানুধ্যায়ীগণ একত্রে তাঁহাদের প্রিয় গুরু আচার্যদেবকে বিদায়-অভিনন্দন প্রদান করিয়াছিলেন। সে দিন একটি বিষাদ-পূর্ণ বিশেষ দিন! শত শত ব্যক্তি যখন অশ্রুসিক্ত-নয়নে তাঁহাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিরা বলিয়া উঠিলেন "স্বামীজি, আপনি আবার আমাদের মধ্যে ফিরিয়া আসিবেন।" তখন তিনিও তাহাদের ভক্তিতে বিগলিত হইয়া বলিয়াছিলেন—"যত দিন পর্যন্ত জগতের প্রত্যেকেই উচ্চতম সত্য উপলব্ধি করিতে না পারিতেছে, ততদিন আমি মানবজাতির কল্যাণ কামনায় ধর্ম-প্রচারে বিরত হইব না।"

তাঁহার এই বিদায়কালীন উক্তি মিথ্যা আশ্বাস নহে। ইহাই তাঁহার অন্তরের অন্তরতম কথা। তিনি ভারতে ফিরিতেছিলেন ভারতবাসীগণকে সত্যলাভে উদ্বুদ্ধ করিতে এবং তাহাদিগকে সর্ব-প্রকার হীনতা ও দীনতা হইতে মুক্ত হইবার জন্য সহায়তা করিতে।

লণ্ডনের ভক্ত ও অনুরাগীবৃন্দকে বিষাদাচ্ছন্ন করিয়া নির্দিষ্ট দিনে স্বামীজি কলম্বো-গামী জাহাজে আরোহণ করিলেন।

* *
*

ছয়

॥ ভারতে প্রত্যাবর্তন ॥

প্রায় চারি বৎসর পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে ভারতের মর্মবানী প্রচারানন্তর বিজয়ের গৌরব-মাল্য কণ্ঠে ধারণ করিয়া তাঁহার একান্ত প্রিয় মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তন-মানসে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১৫:ই জানুয়ারী, নূতন জীবনের বার্তা লইয়া উন্নতশির বিবেকানন্দ সিংহলের কলম্বো বন্দরে পদার্পণ করিলেন। সে এক অপূর্ব ঘটনা!

"প্রিন্স্ লিওপোল্ড" নামক বিরাটাকার জাহাজখানি কলম্বো বন্দরের নিকটবর্তী হইবামাত্র সহস্র সহস্র হিন্দু নরনারী তাঁহাদের ভারতীয় আচার্যদেবকে শ্রদ্ধার সহিত বরণ করিয়া লইল। নাগরিক প্রথায় তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য কলম্বোবাসী সর্বসাধারণ প্রবল উৎসাহে-আনন্দে তাঁহার গমন-

পথে সুন্দর সুন্দর তোরণ প্রস্তুত করিল এবং পথগুলি পত্র, পুষ্প ও পতাকায় শোভিত করিল। বন্দর হইতে বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে তাঁহাকে নির্দিষ্ট বাংলোয় লইয়া যাওয়া হইল। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে বিরাট অভিনন্দন-সভায় ব্যাপস্থাপক সভার সদস্য মাননীয় কুমারস্বামী মহোদয় সিংহলবাসীগণের পক্ষ হইতে শ্রদ্ধার সহিত একটি অভিনন্দন পত্র পাঠে তাঁহার প্রচার-কার্য ও তাঁহাকে সর্বপ্রথম অভিনন্দনের সুযোগ পাইয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞপন করিলেন। স্বামীজিও সংক্ষিপ্ত উত্তরদান-প্রসঙ্গে বলিলেন "যদি হিন্দুজাতি জীবিত থাকিতে চায়, তবে ধর্মকেই তাহার জাতীয় মেরুদণ্ড-স্বরূপ গ্রহণ করিতে হইবে।"

তাঁহার আগমন বার্তা শ্রবণ করিয়া মাদ্রাজবাসী উৎসাহে আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল। এমন কি তাঁহার গুণমুগ্ধ কয়েকজন শিষ্য কলম্বোতে উপস্থিত হইয়া অভ্যর্থনা করিতেও দ্বিধা করিল না। পর দিবস অপরাহ্ণে কলম্বোর বিপুল জনসমক্ষে তিনি একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ভগবান বুদ্ধের পর এইরূপ সহস্র সহস্র জনসমক্ষে ধর্ম-বক্তৃতা ভারত দীর্ঘ দিন শ্রবণ করে নাই। ভগবান বুদ্ধ যেমন পৃথিবীতে জ্ঞানালোক প্রদানে সমর্থ হইয়াছিলেন তেমনই বর্তমান যুগাচার্য বিবেকানন্দও পৃথিবীময় ধর্মপ্লাবন আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। "অতি প্রাচীন কাল হইতেই এখানে বিভিন্ন ধর্মের সংস্থাপকগণ আবির্ভূত হইয়া সমগ্র জগৎকে বারংবার সনাতন ধর্মের পবিত্র আধ্যাত্মিক বন্যায় ভাসাইয়াছেন!" আচার্যদেবও সেই অতীতকালেরই বার্তাবহ, নব্য-ভারতের পথ-প্রদর্শক। তাঁহার সুগভীর জ্ঞানের দীপ্ত আলোকে ধর্ম, রাষ্ট্র ও সমাজে বিপুল আলোড়ন উঠিয়াছিল। তাঁহারই অগ্নিগর্ভ বাণীর প্রভাবে সুদীর্ঘ দাসত্বের মোহে নিদ্রিত জাতির মোহনিদ্রা ছুটিয়া গেল এবং জাতি অগ্নি-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া 'অগ্নিযুগের' জাতীয় আন্দোলনে অগ্রসর হইল। ইহাই মাতৃভূমির জন্য সহস্র বলি প্রদান। এই হিন্দুজাতির

সন্তানগণ যেমন ধর্মের ক্ষেত্রে চরম ও পরম আদর্শ উপলব্ধি করিয়াছেন, তেমনই এই হিন্দুজাতির সন্তানগণ মাতৃভূমিকে পরাধীনতামুক্ত করিবার জন্য ফাঁসীর মঞ্চে উন্নতবক্ষে আত্মাহুতি দিয়া গৌরববোধ করিয়াছেন। তাই স্বামীজি ঘোষণা করিয়াছিলেন—"এই সহিষ্ণু নিরীহ হিন্দুজাতির নিকট জগৎ যতদূর ঋণী, আর কোন জাতিরই নিকট ততদূর নহে।" শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের জনৈক প্রাচীন সন্ন্যাসী লিখিয়াছেন যে—"আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে স্বামীজির অগ্নিময়ী বাণীগুলি তাঁহার পত্রাবলীর মধ্যে মূর্ত হইয়া ভারতের জাতীয় জীবনে এক অপূর্ব শক্তি সঞ্চার করিয়াছে। আরও বলি যে, ইহা পরাধীনতার শৃঙ্খল উন্মোচন করিতে বহুল পরিমাণে সহায়তা করিয়াছে।"

স্বামীজি মহারাজ জাতীয় প্রাণকেন্দ্র ধর্মকে অবলম্বন করিয়া সর্বপ্রকার উন্নতি সাধন করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন বলিয়াই সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁহার আগমনে এককালে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদনে অগ্রসর হইয়াছিল। হিন্দুর গভীরতম, নিবিড়তম তন্ত্রীতে ঝঙ্কার তুলিবার ফলেই হিমাচল হইতে কলম্বো পর্যন্ত জাতীয় জাগরণের তরঙ্গমালা ধীরে হইলেও নিশ্চিতরূপে মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। তাঁহার প্রতিটি বক্তৃতা, প্রতিটি পত্র, জাতীয় সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় জাগরণের মন্ত্রস্বরূপ, ইহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। ভারতের জাতীয় জীবন যে লক্ষ লক্ষ দরিদ্রের কুটিরে পাষাণ-প্রমাণ অত্যাচারে পিষ্ট তাহা অপসারণের জন্য তাঁহার ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা ছিল। তিনি বলিয়াছেন—"আমার জীবনে এই একমাত্র আকাঙ্ক্ষা যে, আমি এমন একটি চক্র প্রবর্তন করিব, যাহা প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট উচ্চ উচ্চ তত্ত্বরাশি বহন করিয়া লইয়া যাইবে ; তাহার পর তাহারা নিজেরা ভাবুক। আন্তরিক সহানুভূতি, চিন্তা ও কার্যের স্বাধীনতাই জীবন, উন্নতি এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের একমাত্র সহায়।" এইজন্যই তিনি চাহিয়াছিলেন দরিদ্র ও পদদলিতদের অবনতির কারণগুলি

তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া হউক। উহা বুঝিতে পারিলে তাহারা নিজেরাই নিজেদের পথ করিয়া লইবে। এই শতধা বিচ্ছিন্ন জাতির মধ্যে সংহতি ও সাম্য সংস্থাপন মানসে সহানুভূতি ও ভালবাসা সকল স্তরে বিস্তৃত হওয়া আবশ্যক। তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন—"এমন 'পরশ্রীকাতরতা' পৃথিবীর কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না—এইজন্যই আমাদের ভারতবাসীর বিভিন্ন গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও এত অবনতি।"

পূজ্যপাদ স্বামীজি মহারাজ কলম্বো সহরের বিভিন্ন স্থান ও সিংহলের কাণ্ডি, অনুরাধাপুর, ভাভোনিয়া, জাফ্‌না প্রভৃতি স্থানেও বক্তৃতাদি করায় সহস্র সহস্র ব্যক্তি তাঁহার গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়াছিল। কয়েক দিবস সিংহল-বাসীগণের মধ্যে আনন্দে কাটাইয়া তিনি ভারতের অন্তর্গত পাম্বান নামক দ্বীপে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার শিষ্য রামনাদ-রাজা ও অপর শিষ্যবর্গ পাম্বানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের প্রিয় গুরু ও আচার্যদেবকে স্বাগত অভিনন্দন করিলেন। এই স্থানেও পাম্বান অধিবাসীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হইল এবং এই স্থানেই রামনাদের রাজা স্বামীজির নামে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। পর দিবস রামনাদ সহরাভিমুখে রওয়ানা হইয়া বিপুল জনতা দর্শনে স্বামীজি মহারাজ পুলকিত হইলেন। রাজাবাহাদুরের মূল্যবান বাহনে তাঁহাকে বহন করিয়া বিরাট জনতাসহ রামনাদরাজ পদব্রজে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়াছিলেন। পথে নানা প্রকার মঙ্গলচিহ্ন-সহ পতাকা শোভা পাইতেছিল, মশাল জ্বালান হইয়াছিল এবং বিভিন্ন প্রকারের 'হাউই বাজি' ছোড়া হইতেছিল। রামনাদ পৌঁছান মাত্র তোপধ্বনি করিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হইয়াছিল। স্বামীজি মহারাজের অনুগমন করিয়া দুইদল বিলাতি বাদ্যবাদক 'হের, এসেছেন বিজয়ী বীর' এই গান গাহিতে গাহিতে অগ্রসর হইতে-ছিল। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে নির্দিষ্ট সভা-

মণ্ডপে আনন্দ উৎসাহের মধ্যে তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হইল এবং বিরাট জনতা জয়ধ্বনি সহকারে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করিল। স্বামীজি মহারাজকে বিশেষ প্রশংসাবাদ করিয়া সুন্দর একটি অভিনন্দন-পত্র রাজ-ভ্রাতা কর্তৃক সভায় পঠিত হইল এবং একটি কারুকার্য খচিত রৌপ্যাধারে ঐ অভিনন্দনটি তাঁহাকে প্রদান করা হইল। স্বামীজি মহারাজ অভিনন্দনের উত্তরে ভারতবাসীগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"সুদীর্ঘ রজনী প্রভাত-প্রায়া বোধ হইতেছে। মহাদুঃখ অবসান-প্রায় প্রতীত হইতেছে। ইতিহাসের কথা দূরে থাকুক, কিংবদন্তী পর্যন্ত সুদূর অতীতের ঘনান্ধকার ভেদে অসমর্থ। তথা হইতে এক অপূর্ব বাণী যেন শ্রুতিগোচর হইতেছে। জ্ঞান, ভক্তি, কর্মের অনন্ত হিমালয়-স্বরূপ আমাদের মাতৃভূমি ভারতের প্রতিশৃঙ্গে প্রতিধ্বনিত হইয়া যেন ঐ বাণী মৃদু অথচ দৃঢ় অভ্রান্ত ভাষায় কোন্ অপূর্ব রাজ্যের সংবাদ বহন করিতেছে। যতই দিন যাইতেছে, ততই যেন উহা স্পষ্টতর, ততই যেন উহা গভীরতর হইতেছে। যেন হিমালয়ের প্রাণপ্রদ বায়ুস্পর্শে মৃতদেহের শিথিল-প্রায় অস্থিমাংসে পর্যন্ত প্রাণ সঞ্চার করিতেছে, নিদ্রিত শব জাগ্রত হইতেছে। তাহার জড়তা ক্রমশঃ দূর হইতেছে। অন্ধ যে, সে দেখিতেছে না, বিকৃত-মস্তিষ্ক যে সে বুঝিতেছে না যে আমাদের এই মাতৃভূমি গভীর নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জাগ্রত হইতেছেন। আর কেহই এক্ষণে ইহার গতিরোধে সমর্থ নহে। আর ইনি নিদ্রিতা হইবেন না। কোন বহিঃস্থ শক্তিই এক্ষণে আর ইঁহাকে চাপিয়া রাখিতে পারিবে না। কুম্ভকর্ণের দীর্ঘ-নিদ্রা ভাঙ্গিতেছে।" ধীরে ধীরে হইলেও দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর পর স্বামীজি মহারাজের ভবিষ্যৎ-বাণী বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছে। "আগামী পঞ্চশত বৎসর জননী জন্মভূমিই তোমাদের আরাধ্য দেবতা হউক" তাঁহার এই বাণী ধ্রুবতারার ন্যায় জাতির পথ নির্দেশ করিতেছে।

রামনাদের বিরাট জনসভায় আবেগপূর্ণ ভাষায় তিনি ঘোষণা

করিলেন—"তোমরা আপন আপন ধর্মকে পরিত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্য জড়বাদ অনুকরণে জাতীয় মহাসমৃদ্ধিপূর্ণ সভ্যতাকে বিসর্জন দিলে হিন্দু-সংস্কৃতি, হিন্দুধর্ম সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়া যাইবে।" বাস্তবিক অন্ধ অনুকরণে জাতীয় সম্পদের সমৃদ্ধি না হইয়া তৎস্থলে দৈন্যই দেখা দেয়। তিনি আরও বলিলেন—"এক হস্তে দৃঢ়ভাবে ধর্মকে ধর এবং অপর হস্ত প্রসারিত করিয়া অন্যান্য জাতির নিকট যাহা শিক্ষা করিবার তাহা শিক্ষা কর। কিন্তু মনে রাখিও যে, সেই-গুলিকে হিন্দু জীবনের সেই মূল আদর্শের অনুগত রাখিতে হইবে—তবেই ভবিষ্যৎ ভারত অপূর্ব মহিমা-মণ্ডিত হইয়া আবির্ভূত হইবে।"

তিনি রামনাদ রাজভবনে কয়েক দিবস অবস্থান করিয়া তথা হইতে পরমকুডি নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। তথাকার অধিবাসীগণও সাদরে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া অভিনন্দন পত্রাদি দ্বারা স্বাগত করিয়াছিলেন। অভিনন্দনের উত্তরে আচার্যদেব মনোজ্ঞ বক্তৃতায় বলিলেন—"আমি আগ্রহের সহিত সেই দিনের প্রতীক্ষা করিয়া আছি, যে দিন মহামনীষী ধর্মবীরগণ অভ্যুত্থিত হইয়া, ভারত হইতে বহির্গত হইয়া, জগতের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ভারতের অরণ্যরাজী হইতে সমুত্থিত ও ভারতভূমির নিজস্ব সেই আধ্যাত্মিকতা ও ত্যাগতত্ত্ব প্রচার করিবেন।" স্বামীজি মহারাজের এই আন্তরিক প্রত্যাশা আজিও যথার্থ সফল হয় নাই। জগতে যদি কোন চিন্তারাশীই নষ্ট না হইয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহার চিন্তাও একদিন না একদিন ফলপ্রসূ হইবেই হইবে।

কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য উভয় দেশেই উভয়ের সহায়তায় নূতন সঞ্জীবিত সমাজ জীবন গঠিত হইলেই উভয় দেশের কল্যাণ। প্রাচ্যের জন্য আবশ্যক সাম্যবাদযুক্ত ঐশ্বর্য-সম্পদ, পাশ্চাত্য দেশে আধ্যাত্মিকতা। মানব জাতির মহত্তর কল্যাণের জন্যই ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষগণ জন্ম-গ্রহণ করিয়া দেশ ও কালের গণ্ডি অতিক্রম পূর্বক পৃথিবীর জনগণের কল্যাণের পথ প্রদর্শন করেন। স্বামী

বিবেকানন্দ এইরূপ এক সার্থক সর্বজনবরেণ্য, সর্বশক্তির আধার-স্বরূপ মহাপুরুষ।

স্বামীজি মহারাজ পরমকুডিতে বক্তৃতাদি করিয়া মনমাদুরায় উপস্থিত হইলে তথাকার জনসাধারণও তাঁহাকে পরমশ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছিল এবং তিনিও বক্তৃতা ও উপদেশাদি দ্বারা সকলকে উৎসাহ প্রদান করিয়া তথা হইতে মাদুরা সহরে উপস্থিত হইলেন। এ স্থলেও মহতী সভায় অভিনন্দন প্রদানকালে স্বামীজি মহারাজ উত্তর দিতে গিয়া ধর্মের বিভিন্ন দিক, দেশকালোপযোগী আহারাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। মাদুরার প্রসিদ্ধ মন্দিরাদি দর্শন করিয়া ট্রেনযোগে কুম্ভকোনম সহরে রওয়ানা হইলে পথিমধ্যে প্রতিটি ষ্টেশনে শত শত ব্যক্তি তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য উপস্থিত ছিল। ভোর চারিটার সময় স্বামীজি মহারাজ ত্রিচিনপল্লী ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে বিপুল জনতা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিল এবং এক অভিনন্দন-পত্র তাঁহার হস্তে প্রদান করিল। তিনিও তথায় সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রদানে তাহাদের উৎসাহ বৃদ্ধি করিলেন। এইরূপে বিভিন্ন ষ্টেশনে জনতা কর্তৃক অভিনন্দিত হইয়া কুম্ভকোনমে উপস্থিত হইলেন। তথায় তিনদিন অবস্থান করিয়া তত্রত্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানাদির সহিত পরিচিত হইলেন। তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার জন্য আহুত মহতী সভায় বেদান্ত সম্বন্ধে তত্ত্বপূর্ণ দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া বলিলেন যে—“বেদান্তই কেবল আমাদের কেন, সকল মানব জাতির যথার্থ কল্যাণ সাধন করিতে পারে এবং সকল ধর্মের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া সকল প্রকার সঙ্কীর্ণতা দূরীকরণে সমর্থ। আর এই মহৎ উদার বেদান্ত ধর্মই মানব জাতির কল্যাণের জন্য পৃথিবীর সর্বত্র বিতরণ করিতে হইবে। তবেই ভারত অপরাপর সভ্যজাতির মধ্যে নিজের আসন প্রতিষ্ঠার গৌরব অর্জন করিয়া বাঁচিবার মত বাঁচিবে।” তিনি আরও বলিলেন—“সর্ব প্রকার বিস্তারই জীবন; সর্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতাই মৃত্যু। যেখানে প্রেম সেইখানেই

বিস্তার ; যেখানে স্বার্থপরতা সেইখানেই সংকোচ। প্রেমই জীবনের একমাত্র বিধি। যিনি প্রেমিক, তিনিই জীবিত ; যিনি স্বার্থপর তিনি মৃত।"

স্বামীজি মহারাজ কুম্ভকোনম সহর হইতে মাদ্রাজ রওয়ানা হইলেন। পথিমধ্যে প্রতিটি রেল ষ্টেশনে পূর্বের ন্যায়ই সহস্র সহস্র ব্যক্তি তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য সমবেত হইয়া অভিনন্দন প্রদান করিয়াছিল। ট্রেন মাদ্রাজ ষ্টেশনে পৌঁছিবার পূর্বেই স্বামীজিকে দর্শন করিবার ও অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিবার জন্য বিশাল জনতা সমগ্র ষ্টেশন-অঞ্চলকে জনারণ্যে পরিণত করিয়াছিল। সমবেত জনতা তাঁহার গাড়ী নিজেরাই টানিয়া লইয়া চলিল। তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য মাদ্রাজবাসীগণ প্রধান প্রধান রাজ পথে সতেরটি মনোহর তোরণ প্রস্তুত করিয়াছিল। মাদ্রাজ-বাসীগণের এই স্বতোৎসারিত আন্তরিক সম্বর্দ্ধনার বিপুলতায় স্বামীজি বিশেষভাবে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাকে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিনন্দনপত্র প্রদান করিবার জন্য আহূত সভায় সমবেত সহস্র সহস্র নরনারীকে উদ্দেশ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—"কলম্বো হইতে মাদ্রাজ পর্যন্ত লোক আমার প্রতি যেরূপ অপূর্ব সদয় ব্যবহার করিয়াছে সমগ্র ভারতবাসীই সেরূপ করিবে বলিয়া বোধ হইতেছে। আমি কল্পনায়ও এরূপ অভ্যর্থনা পাইবার আশা করি নাই।" স্বামীজি মহারাজ যে কিরূপভাবে জনসাধারণ কর্তৃক অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন তাহা কল্পনা করা ছাড়া বর্ণনা করিবার উপায় নাই। জনগণের উৎসাহ উদ্দীপনার আতিশয্যে কোন কোন স্থলে নিয়মিত সভা করা পর্যন্ত অসম্ভব হইয়াছিল।

ভারতবর্ষে পদার্পণ করিবার পর হইতেই তিনি আমাদিগকে কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করিয়া আমাদের শ্রেয়-লাভের পথ নির্দেশ করিতেছিলেন। তিনি পাশ্চাত্যদেশে অবস্থানকালে বিভিন্ন

স্থানে বক্তৃতা ও আলোচনা প্রসঙ্গে ঐ দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের সহিত মেলামেশার ফলে তদ্দেশে কি প্রয়োজন তাহা বিশেষভাবে বুঝিয়াছিলেন এবং নির্দেশও করিয়াছিলেন। ভারতেও রাজা-মহারাজা হইতে আরম্ভ করিয়া অতি সাধারণ দরিদ্র ব্যক্তির সহিত মেলামেশার ফলে আমাদের জাতীয় প্রয়োজনীয় বস্তু কি তাহাও তিনি সম্যক বুঝিয়াছিলেন এবং পুনঃ পুনঃ নির্দেশ করিতেও অন্যথা করেন নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে বেদান্তে যে অপূর্ব সত্য নিহিত আছে তাহারই ভিত্তিতে আমাদের জাতীয় জীবন গঠন করিতে পারিলে উন্নতি সম্ভবপর। তাই তিনি বলিয়াছিলেন—"ভারতকে সামাজিক বা রাজনৈতিক ভাবের বন্যায় ভাসাইতে গেলে প্রথমে এদেশকে আধ্যাত্মিক ভাবের বন্যায় ভসাইতে হইবে।" আরও বলিয়াছিলেন—"উপনিষদ্‌-সমূহ শক্তির বৃহৎ আকর-স্বরূপ। উপনিষদের সত্যই সমগ্র জগৎকে পুনরুজ্জীবিত তথা শক্তি ও বীর্যশালী করিতে সমর্থ। সকল জাতির সকল মতের, সকল সম্প্রদায়ের দুর্বল, দুঃখী এবং পদদলিত জনগণকে উঠিয়া দাড়াইবার জন্য, স্বীয় মুক্তি অর্জন করিবার জন্য, উহা উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান করিয়াছে। মুক্তি বা স্বাধীনতা—দৈহিক স্বাধীনতা, মানসিক স্বাধীনতা আত্মিক স্বাধীনতা, ইহাই উপনিষদের মূল মন্ত্র। ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে স্বামীজি বেদান্তের এই মন্ত্রই প্রচার করিয়াছিলেন। মাদ্রাজে অবস্থানকালে স্বামীজি 'আমার সমর নীতি,' 'জাতীয় জীবনে বেদান্তের কার্য-কারিতা,' 'ভারতীয় মহাপুরুষগণ', 'আমাদের উপস্থিত কর্তব্য,'—এই পাঁচটি বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রতিটি বক্তৃতাই সুচিন্তিত এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের জাতীয় জীবনে বক্তৃতাগুলির উপযোগিতা ও কার্য-কারিতা এখনও সমভাবে বর্তমান রহিয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজ একমাসকাল মাদ্রাজ বিভাগের

বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়া তাঁহার শক্তিশালী বাণী সমূহ প্রচারান্তে ষ্টীমার যোগে জন্মভূমি কলিকাতা নগরীতে উপস্থিত হইলেন। বাংলাদেশ বিশেষ করিয়া কলিকাতা সোৎকণ্ঠে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। তিনি যখন খিদিরপুর ডকে উপস্থিত হইলেন তখন দেখিতে পাইলেন একখানি স্পেশাল ট্রেন তাঁহাকে শিয়ালদহ লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। তিনি শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে উক্ত ট্রেন-যোগে শিয়ালদহ ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে সহস্র সহস্র ব্যক্তি কর্তৃক আনন্দ-উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে অভ্যর্থিত হইলেন এবং তিনিও জনতার উদ্দেশ্যে আনন্দদীপ্ত প্রণাম জানাইলেন। দারভাঙ্গা মহারাজের সভাপতিত্বে যে নাগরিক অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছিল, তাহার পক্ষ হইতে মাল্য প্রদান ও স্বাগত সম্ভাষণ যথারীতি সম্পন্ন হইলে সমবেত জনতা শোভাযাত্রা সহকারে তাঁহাকে রিপন কলেজের একখানি সুন্দর গৃহে লইয়া গেল। তথায় স্বামীজি মহারাজ কিছুক্ষণ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সহিত প্রীতি-সম্ভাষণাদি বিনিময়পূর্বক শোভাযাত্রা পরিত্যাগ করিয়া গুরুভ্রাতাগণ-সহ শোভাবাজার রাজবাটিতে সম্মানিত অতিথিরূপে উপস্থিত হইলেন। তথায় বিশ্রামাদি করিয়া ও দর্শনাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিবর্গের সহিত দিবসের অধিকক্ষণ কাটাইয়া সন্ধ্যায় আলমবাজারে গুরুভ্রাতাগণের সহিত মিলিত হইলেন।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারী স্বামীজি মহারাজকে কলিকাতা নাগরিক অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষ হইতে শোভাবাজারস্থ রাজবাটী-প্রাঙ্গণে প্রায় পাঁচ-ছয় সহস্র ব্যক্তির উপস্থিতিতে একখানি মানপত্র প্রদান করা হয়। অভিনন্দনের উত্তর-দান প্রসঙ্গে তিনি দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া আমাদের বর্তমান কর্তব্য সম্বন্ধে সুচিন্তিত ইঙ্গিত করেন। তাঁহার উদাত্ত কণ্ঠে বাংলার যুবকগণের নিকট উপনিষদের মহান বলপ্রদ বাণী "উত্তিষ্ঠত

জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নি বোধত” ঘোষণা করিয়া বলিলেন ‘উঠ, জাগ, যতদিন না অভীষ্ট বস্তু লাভ হইতেছে ততদিন চলিতে ক্লান্ত হইও না।’ অভী হও, নির্ভীক হও। উঠ, জাগ, কারণ তোমাদের মাতৃভূমি মহাবলি প্রার্থনা করিতেছেন। যুবকগণের দ্বারাই এই কার্য সাধিত হইবে।” তিনি চাহিয়াছিলেন বাঙ্গালী যুবকগণ ‘উত্তিষ্ঠ’ হোক; “এই হৃদয়বান উৎসাহী বঙ্গীয় যুবকগণের ভিতর হইতেই শত শত বীর উঠিবে।” অপর একদিন বেদান্ত সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা দান করেন। তাহাতে বেদান্তই যে সকল মতের এবং পথের মিলন ভূমি তাহা প্রতিপন্ন করিয়া তিনি বলিলেন—“আমি নিঃসঙ্কোচে বলিতেছি, মানব আধ্যাত্মিক রাজ্যের যাহা কিছু পাইয়াছে বা পাইবে, ইহাই তাহার প্রথম ও ইহাই শেষ। বেদান্তই হিন্দু ধর্মের অন্তর্গত সকল সম্প্রদায়ের ভিত্তি। তুমি দ্বৈতবাদী হও, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী হও, শুদ্ধাদৈতবাদী হও, অদ্বৈতবাদী হও, অথবা যে কোন প্রকারের অদ্বৈতবাদী বা দ্বৈতবাদী হও অথবা তুমি যে নামেই আপনাকে অভিহিত করনা কেন, তোমাকে উপনিষদের প্রামাণ্য স্বীকার করিতেই হইবে।” বেদান্তে আলোচিত ও প্রতিপাদিত হইয়াছে সেই চরম এবং পরম তত্ত্ব যাহার অধিগম ব্যতীত আমিত্ব-বিলয় এবং সংস্কার-মুক্তি কোন প্রকারেই সম্ভব নহে। সেই জন্যই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল ভারত-বহির্দেশে বেদান্তের তত্ত্ব প্রচারিত হোক, আর উহাকেই ভিত্তি করিয়া সমগ্র মানব-জাতিকে এক প্রেমের সূত্রে গ্রথিত করা হোক।

* *

*

সাত

॥ সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা ॥

স্বামীজি বলিতেন—"আপনার ভাল কেবল পরের ভালয় হয়, আপনার ভক্তি ও মুক্তি পরের মুক্তি ও ভক্তিতে হয়,—তাহাতে লেগে যাও, মেতে যাও, উন্মাদ হয়ে যাও। বিশ্বাস ও দৃঢ়তার সহিত লেগে থাক। সত্যনিষ্ঠ, সাধু ও পবিত্র হও আর নিজেদের ভিতর বিবাদ করোনা। ঈর্ষাই আমাদের জাতির অভিশাপ স্বরূপ।" এই ঈর্ষার বশ হওয়ার ফলে আমাদের সকল প্রকার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। এই জন্যই স্বামীজি মহারাজ বিভিন্ন স্থানে দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন—'ঈর্ষাই জাতীয় পাপ'। সম্প্রদায়গত হইলেই আমরা যেন অধিকতর ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠি। আচার্যদেব এই জন্য কোন প্রকার সম্প্রদায়ের পক্ষপাতী ছিলেন না। মঠ মিশন গঠনেও এই ভয় তাঁহার বরাবর ছিল। আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে সম্প্রদায় বা সঙ্ঘ তাঁহার অভিপ্রেত নহে। কারণ সঙ্ঘ স্থাপন করিলেই নানা দোষক্রুটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আসিবার সম্ভাবনা। তিনি বলিতেন—"যারা এসব দলের পরিচালক হবে তারা ক্ষমতা, অর্থ ও প্রতিপত্তি চাইবে। অপরের উপর প্রভুত্বের জন্য তারা প্রায়ই চেষ্টা করবে। এমন কি ক্ষমতা হস্তগত করবার জন্য নিজেদের মধ্যেই পরস্পর লড়াই করবে।" তাঁহার এই উক্তি হইতেই বুঝিতে পারা যায় তিনি প্রতিষ্ঠানাদির জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলেন না। তবে এমন একটি কর্মি-সঙ্ঘ তিনি চাহিয়াছিলেন যাহারা যথাসম্ভব এই সকল দোষক্রুটির ঊর্ধ্বে থাকিয়া মানব জাতির হিত-সাধনে সর্বদা তৎপর থাকিবেন।

কোন বৃহৎ কার্য সম্পন্ন করিতে হইলেই সজ্ঘ-শক্তির নিতান্ত প্রয়োজন। এই জন্যই পরবর্তীকালে তাঁহাকে সজ্ঘ গঠন করিয়া বিশেষ নিয়মাবলী প্রবর্তন করিতে হইয়াছিল, যাহাতে অল্প দোষত্রুটি লইয়া সজ্ঘ-শক্তি পরিচালিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ ও উদ্দেশ্য রূপায়িত করিবার জন্যই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-সজ্ঘ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার কঠিন দায়িত্ব সন্ন্যাসীদিগের উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দী নব্যভারতের আবির্ভাব-যুগ, যে যুগে অধঃপতিত ভারতবর্ষকে পুনরুজ্জীবিত ও পূর্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বহু মনীষীর যুগপৎ আবির্ভাব হইয়াছিল। নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় স্বামী বিবেকানন্দ এই সকল মনীষীগণের অগ্রণী। যে কয়জন জননায়ক জন-চিত্ত জয় করিয়া ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার উদ্বোধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যেও তিনিই ছিলেন যোগ্যতম ব্যক্তি। গভীর অনুভূতি ও অন্তর্দৃষ্টি লইয়া স্বামী বিবেকানন্দ সমগ্র ভারতে যে বিরাট কর্মপ্রবাহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাঁহার আদর্শ ও উদ্দেশ্য কতদূর কার্যকরি হইয়াছে তাহা জনসাধারণই স্থির করিবেন।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ৫ই মার্চ স্বামীজি মহারাজ রামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠার জন্য বেলুড় গ্রামে গঙ্গাতীর-সংলগ্ন ২২ বিঘা জমি চল্লিশ হাজার টাকায় ক্রয় করিয়াছিলেন। কয়েক মাস পরে (১২ই নভেম্বর) সজ্ঘ-জননী শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর দ্বারা ঐ স্থানে ঠাকুরের আলেখ্য প্রতিষ্ঠা ও পূজাদি সম্পন্ন করান হইয়াছিল। এই দিনের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী কর্তৃক ভগিনী নিবেদিতা বিদ্যালয়ের উদ্বোধন।

স্বামীজি মহারাজ ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করিবার পর একটি দিবসও বিশ্রাম লাভ করিতে পারেন নাই, সর্বদা বক্তৃতা ও আলোচনাদিতে ব্যাপৃত থাকিতেন। শরীর ক্লান্ত, শ্রান্ত। স্থির করিলেন কিছু দিন বিশ্রাম লইয়া পুনরায় কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ

হইবেন। তদুদ্দেশ্যে কয়েক দিনের মধ্যেই দার্জিলিং রওয়ানা হইয়া গেলেন, যাহা তাঁহার দীর্ঘ কালের অভিপ্রেত ছিল। ইতিমধ্যে যে কয়দিন অবসর মিলিয়াছে তাহাতেও তিনি আলমবাজার মঠের গুরুভ্রাতা ও শিষ্যগণের মধ্যে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা লইয়া আলোচনা ও কি ভাবে অগ্রসর হইতে হইবে ইত্যাদি লইয়া সর্বদা যুক্তি ও পরামর্শ করিতেন। দার্জিলিং হইতে ফিরিয়া আলমবাজার মঠে অবস্থান কালে বর্তমান মঠ ও মিশনের কতকগুলি নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কারণ যখন তিনি উক্ত মঠে ফিরিয়া আসিলেন তখন নূতন ও পুরাতন অনেকগুলি সাধু ব্রহ্মচারী মঠে অবস্থান করিতেছিলেন কাজেই সঙ্ঘের নিয়মাবলী প্রণয়নের প্রয়োজন দেখা দেয়। ঐ নিয়মাবলীতে স্বামীজি মহারাজ একস্থানে লিখিয়াছেন—"এই মঠটিকে ধীরে ধীরে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করিতে হইবে। তাহার মধ্যে দার্শনিক চর্চা ও ধর্ম-চর্চার সঙ্গে সঙ্গে একটি পূর্ণ 'টেক্‌নিক্যাল ইনষ্টিটিউট' করিতে হইবে; এইটি প্রথম কর্তব্য। পরে অন্যান্য অবয়ব ক্রমে ক্রমে সংযুক্ত হইবে।" তিনি যেমন বলিতেন 'আগে অন্নদান' তারপর 'জ্ঞানদান,' তাহারই নির্দেশ ইহাতে সূচিত হয়।

মিশনের প্রতিষ্ঠা করিয়াই কতকগুলি বিধি-নিষেধ অবলম্বনে যাহাতে নিয়মের মধ্যে থাকিয়া জীবন গঠিত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিলেন। এই নিয়মের উদ্দেশ্য ইহা নহে যে কাহারও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণ করা; প্রথমেই লিখিলেন—"আমাদের স্বভাবতই কতকগুলি কুনিয়ম রয়েছে। সুনিয়মের দ্বারা সেই কুনিয়ম-গুলিকে দূর করে দিয়ে শেষে সব নিয়মের বাইরে যাবার চেষ্টা করতে হবে। 'যেমন কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলে ছুটি কাঁটাই ফেলে দিতে হয়।' এই ভাবে কতকগুলি নিয়ম আলমবাজার মঠে এবং কতকগুলি পরে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া যান। সমাজ সংস্কারাদি

সম্বন্ধে মঠ কোন পন্থা অবলম্বন করিবে তাহাও নির্দেশ করিতে তিনি ক্রটি করেন নাই। এ বিষয়ে তাঁহার স্পষ্ট নির্দেশ এইরূপ—

"সমাজ সংস্কারের উপর মঠের অধিক দৃষ্টি থাকিবে না, কারণ সামাজিক দোষ ও কুরীতি সমাজ শরীরের ব্যাধি-বিশেষ। ঐ শরীর বিদ্যা ও অন্নের দ্বারা পুষ্ট হইলে ঐ সকল কুরীতি আপনা-আপনি চলিয়া যাইবে। অতএব সামাজিক কুরীতির উদ্‌ঘোষণে বৃথা শক্তিক্ষয় না করিয়া সমাজ শরীর পুষ্ট করাই এই মঠের উদ্দেশ্য।"

কয়েক মাস দার্জিলিংএ বিশ্রাম করিয়া যখন শুনিলেন যে কলিকাতায় ভীষণ ভাবে প্লেগ দেখা দিয়াছে তখনই তিনি পুনরায় কলিকাতা ফিরিয়া বেলুড় মঠের নিকটবর্তী ভাড়াবাটিতে আসিয়া উঠিলেন। অবশ্য ইতিমধ্যে আলমবাজার মঠ এস্থানে উঠাইয়া আনা হইয়াছিল। তিনি এস্থানে আসিয়াই প্লেগের সেবা-কার্যে আত্মনিয়োগের জন্য তাঁহার সহকর্মী, অনুগামী এবং ভক্তগণকে আহ্বান করিলেন। সেবাকার্যে প্রচুর অর্থের আবশ্যক। সহকর্মীগণের মধ্যে কেহ কেহ প্রশ্ন তুলিলেন এত অর্থ এখনই কোথা হইতে সংগ্রহ হইবে? স্বামীজি মহারাজ তৎক্ষণাৎ উত্তর প্রদান করিলেন—"কেন! প্রয়োজন হয় মঠের জমি বিক্রয় করিয়া দিব!" অবশ্যই তাঁহার অভিপ্রায় অনুযায়ী অর্থ সংগৃহীত হইয়া প্লেগ সেবাকার্য সম্পন্ন হইয়াছিল। জমি বিক্রয় করিবার আবশ্যক হয় নাই। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে যেদিন বেলুড় মঠের প্রতিষ্ঠা কার্য সম্পন্ন হয় তখন তিনি বলিয়াছিলেন— "ঠাকুরের ইচ্ছায় আজ ধর্মক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা হল। বার বৎসরের চিন্তা আজ আমার মাথা থেকে নামলো।" এমন গুরুত্বপূর্ণ যে মঠ তাহার জন্য সংগৃহীত জমি তিনি জনসেবার জন্য প্রয়োজন হইলে বিক্রয় করিয়া ফেলিবার কথা চিন্তা করিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করেন নাই। ইহাই স্বামী বিবেকানন্দের বৈশিষ্ট্য।

তখনকার দিনের কলিকাতার বিশেষতঃ উহার যে অংশে ভারতীয় জনগণ বাস করিতেন তাহার পরিবেশ এখনকার তুলনায় অনেক বেশী অস্বাস্থ্যকর ও অপরিচ্ছন্ন ছিল। ভয়াবহ প্লেগ রোগের আবির্ভাবের পর পরিবেশ বহুগুণ বেশী অস্বাস্থ্যকর ও অপরিচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। রাস্তার আবর্জনা এবং ড্রেন পরিস্কার করিবার লোক-সমূহ প্রাণভয়ে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়াছিল। বস্তির ভিতর সঙ্কীর্ণ গলিগুলি ও ড্রেনগুলি আবর্জনায় পরিপূর্ণ হইয়া আবহাওয়াকে অধিকতর বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে ফেলিয়া রাখিয়া তাহাদের আত্মীয় স্বজন পলায়ন করিতেছিল। যথা সময়ে মৃতদেহ সৎকার করাও প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। সরকারী 'সিগ্রিগেশান' ক্যাম্পে রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে লইয়া গেলে তাহার মৃত্যু নিশ্চিত এইরূপ অমূলক ধারণা জনসাধারণের মনে প্রতিষ্ঠিত থাকায় পরিবারের কেহ রোগাক্রান্ত হইলে সকলে উহা গোপন রাখিবার চেষ্টা করিতেন। ফলে রোগ দ্রুত ছড়াইয়া পড়িতেছিল। এইরূপ বিশৃঙ্খলাপূর্ণ অবস্থায় স্বামীজির পরিচালনায় মঠের যুবক সন্ন্যাসীগণ ও তাঁহার অনুগামী ভক্তগণ কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। আতঙ্কগ্রস্ত নগরবাসীগণ স্ববিস্ময়ে লক্ষ্য করিলেন, ভদ্রঘরের শিক্ষিত এই যুবকেরা স্বহস্তে বস্তি, গলি এবং ড্রেনের আবর্জনা পরিস্কার করিতেছে, মৃতদেহের সৎকার করিবার ব্যবস্থা করিতেছে, রোগাক্রান্ত ব্যক্তির সেবার জন্য তাহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত থাকিতেছে। এই নির্বাক কর্মিদলের নির্ভীকতা লক্ষ্য করিয়া নগরবাসীগণও ধীরে ধীরে তাহাদের মনোবল ফিরিয়া পাইলেন এবং সর্বান্তঃকরণে তাঁহাদের সহিত সহযোগিতা করিতে লাগিলেন। এই ভাবে স্বামীজি সঙ্ঘের কর্মিগণকে সেবাধর্মে দীক্ষিত করিয়া তাঁহাদিগকে ভবিষ্যৎ কর্মধারার বাস্তবরূপের সহিত পরিচিত করাইয়াছিলেন। স্বামীজিই সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে সুসংগঠিত

'জনসেবা' (রিলিফ) কার্যের প্রবর্তন করেন। ইহা জাতীয় জীবনে তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান।

কলিকাতা প্লেগমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘদিন নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রম করিবার ফলে স্বামীজির ক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। সহকর্মী এবং ভক্তগণ বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে তাঁহাদের পীড়াপীড়িতে স্বামীজি হিমালয়ের আলমোড়া অঞ্চলে গমন করিলেন। কয়েকজন গুরুভ্রাতা এবং পাশ্চাত্যদেশীয় দুইজন শিষ্য তাঁহার সঙ্গী হইলেন।

ইউরোপের সৌন্দর্যভূমি আল্পস্ পর্বত পরিভ্রমণ করিবার সময় প্রসঙ্গক্রমে স্বামীজি এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে সম্ভব হইলে তিনি হিমালয়ের নিভৃত প্রদেশে অদ্বৈত-তত্ত্ব চিন্তা করিবার উপযোগী এমন একটি আশ্রম স্থাপন করিবেন, যাহা প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যবাসী শিষ্যবর্গ ও সাধু ব্রহ্মচারীগণের তপশ্চর্যার শিক্ষাকেন্দ্র হইয়া উঠিবে। গুরুদেবের এই অভিপ্রায় পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যেই পাশ্চাত্যবাসী শিষ্যদ্বয় স্বামীজির সঙ্গী হইয়াছিলেন। আলমোড়ার নৈসর্গিক সৌন্দর্য এবং শান্ত পরিবেশে বিশেষ ভাবে ধ্যানানুকুল প্রতিভাত হওয়ায় ঐ স্থানে অবস্থান স্বামীজির বিশেষ প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল। স্বামীজির এই প্রীতি লক্ষ্য করিয়াই উক্ত পাশ্চাত্যবাসী শিষ্যদ্বয় নিজ অর্থব্যয়ে তথায় অদ্বৈত আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাদের গুরুদেবের অভিপ্রায় পূর্ণ করিবার সুযোগ পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

আলমোড়ায় তিনি পূর্ণ একমাস বিশ্রাম করিয়া কাশ্মীর রওয়ানা হইয়া গেলেন। তাঁহার সহিত পাশ্চাত্য কয়েকজন শিষ্য-শিষ্যা ও ভারতীয় কয়েক জন শিষ্যও গিয়াছিলেন। তথায় সকলেই পৃথক পৃথক 'হাউস বোটে' অবস্থান করিয়া স্বামীজি মহারাজের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতেছিলেন। ঐ সময়েই কাশ্মীরের চিফ্ জাষ্টিস ঋষিবর মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে নিজের

গৃহে লইয়া আগ্রহের সহিত সেবাযত্ন করিয়াছিলেন। তাঁহারই মাধ্যমে স্বামীজি কাশ্মীরের রাজা রামসিং বাহাদুরের সহিত পরিচিত হন। তিনি স্বামীজিকে অত্যন্ত সম্মানের সহিত সাদর সম্ভাষনান্তে চেয়ারে উপবেশন করাইয়া নিজে পরিষদ্‌বর্গসহ ভূমিতে আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। কাশ্মীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দর্শনে এবং জল-বায়ুগুণে স্বামীজির শরীর-মন অনেকটা সুস্থ হইয়াছিল। আলমোড়া হইতে কাশ্মীর যাইবার কালে পথিমধ্যে বিভিন্ন স্থানে যেমন তাঁহাকে অভ্যর্থনা ও মান পত্র দেওয়া হইয়াছিল তেমনই কাশ্মীরেও প্রদান করা হয় এবং তিনিও প্রত্যুত্তরে যথাযোগ্য ভাষণাদি দিয়াছিলেন।

ইহা ব্যতীত প্রায় প্রত্যহই বহু ব্যক্তি তাঁহার উপদেশ ও দর্শন লাভ করিবার জন্য সমবেত হইত। ভগিনী নিবেদিতা প্রভৃতি যে কয়জন শিষ্য-শিষ্যা তাঁহার সঙ্গে ছিলেন তাহারাও প্রায় প্রত্যহ তাঁহার উপদেশ প্রাপ্ত হইতেন। তবুও এইকালে তিনি প্রায় সর্বদাই ধ্যানস্থ হইয়া অন্তর্জ্যোতিতে উদ্‌ভাসিত হইয়া থাকিতেন। কেহ সাহস করিয়া তাঁহার ধ্যান-তন্ময়তা ভঙ্গ করিতে অগ্রসর হইতে পারিতেন না। কাশ্মীরের ঘটনাবলি ভগিনী নিবেদিতা যে ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। কাশ্মীরে তিনি সত্যই যেন মহাযোগীর জীবন যাত্রা নির্বাহ করিয়াছিলেন। স্থানীয় প্রধান তীর্থ অমরনাথ ও ক্ষীরভবানীতে তাঁহার দিব্যদর্শন ও অনুভূতি এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা। দেবী ভবানীর মন্দিরে এক সপ্তাহ নির্জন বাস করিয়া তিনি প্রত্যহ স্বহস্তে দেবী-পূজা সমাপন করিতে এবং পায়সান্ন রন্ধন করিয়া ভোগ প্রদান করিতেন। দেবীর প্রতিমাটি যবনের অত্যাচারে ধ্বংস হইয়াছিল। তদবধি কোন মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই এবং মন্দিরও নির্মাণ করা হয় নাই। চতুর্দিক বাঁধানো একটি জলপূর্ণ কুণ্ডে দেবীর উদ্দেশ্যে প্রত্যহ পূজাদি নিবেদিত হইয়া

থাকে। একদিন স্বামীজি মহারাজ মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দর্শনে দুঃখিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"যদি আমি বর্তমান থাকিতাম তবে দেখিতাম কি করিয়া মন্দির ধ্বংস হয়।" তখনই দৈববাণী শুনিতে পাইলেন—"আমার ইচ্ছাতেই যবনেরা মন্দির ধ্বংস করিয়াছে। আমার ইচ্ছা আমি জীর্ণ মন্দিরে বাস করিব। ইচ্ছা করিলে আমি কি এক্ষণে এখানে সপ্ততল সোনার মন্দির তুলিতে পারিনা? তুই আমাকে রক্ষা করবি—না আমি তোকে রক্ষা করব?" স্বামীজি মহারাজ ঐ দৈববাণী শ্রবণ করিবার পর হইতেই যেন অপর এক ব্যক্তি হইয়া গেলেন। তখন হইতেই তিনি "মায়ের যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে" বলিয়া সকল প্রচেষ্টা হইতে বিরত হইয়াছিলেন। অমরনাথে গিয়া তাঁহার যে, দর্শন ও উপলব্ধি হইয়াছিল তাহাই তাঁহাকে অন্তর্মুখী ও ভাবস্থ করিয়া রাখিয়াছিল। এখন আবার এই দৈববাণী শ্রবণে তিনি আরও অন্তর্মুখী হইয়া পড়িলেন। অমরনাথ দর্শনের পর স্বামীজি বলিয়াছিলেন—দর্শনের পর হতে আমার মাথায় চব্বিশ ঘণ্টা যেন শিব বসে আছেন, কিছুতেই নাবছেন না"—। অমরনাথ দর্শন সময়ে স্বামীজি মহারাজ সমাধিস্থ হইয়া পড়েন, নিজকে সামলাইতে না পারিয়া গুহা হইতে সত্বর বহির্গত হইয়া প্রকৃতিস্থ হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। যাহারা ভাগ্যবশে ঐ সময়ে তাঁহার সমভিব্যাহারে অমরনাথ দর্শনে গিয়েছিলেন, তাহাদের মধ্যে ভগিনী নিবেদিতা যে ভাবে উক্ত দর্শন বিষয়ে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা সত্যই অপূর্ব। দর্শনাদির পর স্বামীজি মহারাজ নিবেদিতাকে বলিয়াছিলেন—"দেবাদি-দেব মহাদেব:আমাকে আজ ইচ্ছামৃত্যু বর দিয়াছেন।" অমরনাথ হইতে ফিরিয়া ক্ষীরভবানী দর্শনান্তে 'হাউস বোটে' বসিয়াই ধ্যানস্থ অবস্থায় "মৃত্যুরূপা কালী" নামক ইংরেজী কবিতায় মায়ের অপূর্ব ভাবদ্যোতক অভিব্যক্তিটি রাখিয়া গিয়াছেন। কাশ্মীরের ধ্যান-গম্ভীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাঁহাকে

মুগ্ধ করিয়াছিল। তাই তিনি লিখিয়াছিলেন—"জীবনে বহু সুন্দর সুন্দর স্থান দেখেছি কিন্তু কাশ্মীরের সহিত তুলনা হয়না এবং এস্থান ত্যাগ করিতে আমার মনে সত্যই কষ্ট হইয়াছিল।" ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় কাশ্মীরের বৈরাগ্যোদ্দীপক স্থানটি তাঁহাকে আনন্দ দান করিয়াছিল। বলিতেন—"কাশ্মীরের ন্যায় তপোভূমি, কুত্রাপি দেখিতে পাই নাই।" তাঁহার ইচ্ছা ছিল তথায় একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। কাশ্মীর হইতে প্রত্যবর্তনের পথে তিনি বিভিন্ন স্থানে অভিনন্দন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং বহু বক্তৃতাও করিয়াছিলেন। যদিও তাঁহার শরীর সুস্থ ছিলনা তবুও বিশ্রাম সম্ভব হয় নাই। বরং "বীর আমি যুদ্ধক্ষেত্রে মরব" তাঁহার এই বাণীর দ্বারাই বরাবর পরিচালিত হইয়া পাঞ্জাব, লাহোর, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে বক্তৃতাদি প্রদান করিয়া কলিকাতা ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু যে বিশ্রামের জন্য গিয়াছিলেন তাহা সম্পন্ন হইল না। অসুস্থতা লইয়াই ফিরিয়া আসিলেন এবং অধিকতর ত্বরান্বিত হইয়া ভবিষ্যৎ মঠের কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন। আমেরিকা হইতে ফিরিয়া গুরুভ্রাতাগণের মধ্যে সাদরে অভ্যর্থিত হইলেও সকলেই তৎপ্রচারিত আদর্শ শ্রদ্ধার সহিত মানিয়া লইতে পারেন নাই। গুরুভ্রাতাগণ মনে করিয়াছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে প্রচার করিলেই যথার্থ প্রচার করা হইল। অথচ স্বামীজি মহারাজ ঠাকুরের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু প্রচার করেন নাই। সেই দিক হইতে বলিতে গেলে প্রকাশ্য-ভাবে একমাত্র 'মদিয় আচার্যদেব' নামক বক্তৃতা করেন ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ২৭শে ফেব্রুয়ারী, যখন তিনি পাশ্চাত্যদেশে। কেহ কেহ মন্তব্যও করিলেন ইহা ঠাকুরের অভিপ্রেত নহে যে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীগণ সমাজের বা মানবের কল্যাণের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়া নিজদের মোক্ষ-প্রাপ্তির প্রতিকুল অবস্থা সৃষ্টি করিবে। তাঁহারা প্রশ্ন তুলিলেন যে, সন্ন্যাসীর চিরাচরিত আদর্শ যে মুক্তি, ইহা কি

তাহার পরিপন্থী নহে ? স্বামীজি মহারাজ দৃঢ়তার সহিত পুনঃপুনঃ বলিলেন—"যথার্থ সন্ন্যাসী নিজের মুক্তি পর্যন্ত ত্যাগ করিয়া অপরের হিত সাধন করিবে।" সকলের সহিত আলোচনার দ্বারা ঠাকুরের বাণীর গভীরতম মর্ম উদ্‌ঘাটন করিয়া বুঝাইলেন যে তিনি যাহা বলিতেছেন তাহা শ্রীশ্রীঠাকুরেরই বাণী। তিনি নূতন ধারায় উহার ব্যাখ্যা করিতেছেন মাত্র। তিনি যখন ঠাকুরের প্রতিটি উপদেশ নিজের প্রতিভার আলোকে বুঝাইয়া দিলেন তখন :অনেকেই তাঁহার মতবাদ এবং 'যত্র জীব তত্র শিব' শ্রীশ্রীঠাকুরের এই বাণীর সার্থকতা কি ও কোথায় তাহা অনুধাবন করিয়া স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গুরুভ্রাতা হরি মহারাজ (স্বামী তুরিয়ানন্দ) ধ্যান-ভজনকেই আদর্শ ও উদ্দেশ্য করিয়া কেবলমাত্র তৎন্নিমিত্ত প্রযত্ন করাকেই শ্রেয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং স্বামীজি মহারাজের সন্ন্যাসীর নববিধানকে মানিয়া লইতে পারিতেছিলেন না। স্বামীজি তাঁহাকে যুক্তি তর্কের দ্বারা ঠাকুরের উপদেশের গভীর অর্থ বুঝাইতে গিয়া বলিলেন—"ঠাকুরের এক একটি কথার দ্বারা বেদ-বেদান্ত লেখা যায়।" আলমবাজার মঠে অবস্থান-কালে স্বামীজি ঠাকুরের একটি উপদেশকে অবলম্বন করিয়া সাত-দিন বক্তৃতাও করিয়াছিলেন। যাহাই হউক হরি মহারাজ যখন কোন যুক্তিই মানিতে চাহিলেন না তখন স্বামীজি মহারাজ তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন—"হরি ভাই, তুমি আমার দুঃখ বুঝিলে না ? আমার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ঠাকুরের ন্যস্ত মহান দায়িত্ব পালনে ব্যয়িত করিয়া এখন মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি। তুমি কি আমার সহায়তা করিবে না ?" হরি মহারাজ তাঁহার সহৃদয়তায় মুগ্ধ হইয়া সকল বাদ-প্রতিবাদ ভুলিয়া গেলেন। পরে তিনিও স্বামীজির অভিপ্রায়ে পাশ্চাত্য-দেশে গমন করিয়া বেদান্ত প্রচারে অদ্‌ভুত দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

এইভাবে স্বামীজি মহারাজের নেতৃত্বে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। তিনি বলিতেন—"আচার্যের নিরন্তর কর্তব্য হচ্ছে অত্যন্ত 'অধিক' লোকদের ভিতর থেকে 'ঠিক ঠিক' লোক তৈয়ারী করে নেওয়া।" এই মূল-নীতির অনুসরণে তিনি এই সময় অত্যন্ত পরিশ্রমে কর্মি-গঠন ও উপযুক্ত প্রণালীতে শিক্ষাদান, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নির্ধারণ প্রভৃতি কাজে নিমগ্ন থাকিতেন। নূতন নূতন ব্রহ্মচারীদিগকে লইয়া তিনি যেমন শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন-অধ্যাপনা এবং সর্বোপরি চরিত্রগঠনে মনোনিবেশ করিতেন, তদ্রূপ ধ্যান-ভজনেও তাহাদিগকে পবিত্রতা-মণ্ডিত করিয়া লইতে নিরন্তর চেষ্টা করিতেন। তিনি সর্বক্ষণ কাজে ব্যাপৃত থাকিয়া তাঁহার আরব্ধ কর্ম সম্পাদন করিয়া লইতে ছিলেন, কারণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন তাঁহার সময় সংক্ষিপ্ত। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১৯ই আগষ্ট প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছিলেন—"আমি আর ৫-৬ বৎসর মাত্র জীবিত থাকিব।" এই ভবিষ্যৎ বাণীর পরে তিনি পাঁচ বৎসর মানব শরীরে বর্তমান ছিলেন।

কাশ্মীর হইতে কলিকাতা প্রত্যাবর্তনের পথে স্বামীজি মহারাজ বিভিন্ন স্থানে অনেকগুলি বক্তৃতা প্রদান করেন তন্মধ্যে লাহোরের কয়েকটি বক্তৃতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐ সকল বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন—শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে নিজের অন্তর পরিশুদ্ধ করিয়া নিজকে পবিত্র-স্বরূপ জানিয়া এবং সর্বদা নিজকে ঈশ্বরের অংশ ভাবিয়া অভীমন্ত্রে ভয়শূন্য হইতে হইবে। নিজকে যাহারা সর্বদা অপবিত্র বা পাপী বলিয়া ভাবিবে, তাহারা তাহাই হইয়া যাইবে। নিজকে সর্বদা পবিত্র ভাবা ও পবিত্র আচরণ করা ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। কায়মনোবাক্যে যাহারা পবিত্র তাহারাই ঈশ্বরতত্ত্ব অনুধাবন করিতে সমর্থ হইবে। তিনি বলিতেন—"যখন লোকে মন হইতে সমুদয় অসৎ চিন্তা দূর করিয়া দিয়া নির্মল পবিত্রতার বায়ু সেবন করিতে থাকে, তখন তাহারা মূর্খ হইলেও শাস্ত্রের অতি জটিল

ভাষারও রহস্য ভেদ করিতে সমর্থ হয়।" শুদ্ধমন হইলেই কেবল-মাত্র ঈশ্বরের মহিমা গোচরীভূত হওয়া সম্ভব, "মহিমা তব গোচর শুদ্ধমনে।" স্বচ্ছ কাঁচ-গাত্রে পারদ বিশেষ না থাকিলে যেমন কোন প্রতিবিম্বই প্রতিফলিত হওয়া সম্ভব নহে, তেমনই হৃদয়রূপ দর্পণ পবিত্রতারূপ পারদ দ্বারা আবৃত না হইলে ঈশ্বর প্রতিবিম্বন সম্ভব নহে। সেইজন্যই শাস্ত্রকার বলিয়াছেন 'ষট্ সম্পত্তি-সম্পন্ন' শুদ্ধ-স্বরূপ, পবিত্র-স্বরূপ ব্যক্তিই কেবল সৎ-চিৎ-আনন্দ প্রেমঘনমূর্তি ভগবানকে লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারেন।

অদ্বৈতবাদের জটিল তত্ত্ব বুঝাইতে গিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়া-ছিলেন—"বেদান্তের অভীমন্ত্র 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ভাবিতে ভাবিতে মানুষ তাহাই হইয়া যায়। ইহা অহঙ্কারের কথা নহে, আত্মপ্রত্যয়ের কথা।" তিনি বলিতেন—"কুম্‌ড়ে পোকা ভাবিতে ভাবিতে অপর কীট সকল যেমন ঐ স্বরূপ প্রাপ্ত হয়" তেমনই নিজকে পবিত্র-স্বরূপ অনুধ্যান করিতে করিতে সময়ে যথার্থ ই পবিত্রতায় আরূঢ় হইয়া কৃতার্থ হওয়া সম্ভব। স্বামীজি মহারাজ বলিতেন—"তুমি যাহা চিন্তা কারবে, তুমি তাহাই হইবে। যদি তুমি আপনাকে দুর্বল ভাব, তবে তুমি দুর্বল হইবে; তেজস্বী ভাবিলে তেজস্বী হইবে। যদি তুমি আপনাকে অপবিত্র ভাব, তবে তুমি অপবিত্র; আপনাকে বিশুদ্ধ ভাবিলে বিশুদ্ধই হইবে।" ইহাই সকল দুর্বলতা, সকল অপবিত্রতা দূর কবিবার শ্রেষ্ঠ উপায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছিলেন—"নরেন আমাকে কাঁধে করিয়া যেখানে রাখিবে আমি সেখানেই থাকিব।" মঠের নূতন জমিতে স্বামীজি মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের পুতাস্থি-নিধান তাম্র কৌটাটি দক্ষিণ স্কন্ধে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন এবং ভূমিতে আসনোপরি স্থাপন করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া বলিয়াছিলেন—"নিশ্চয় জানবে, বহুকাল পর্যন্ত 'বহুজন হিতায়' ঠাকুর এই স্থানে স্থির হয়ে থাকবেন।" ঐ দিন স্বামীজি মহারাজ স্বহস্তে পূজা ও হোমাদি

সম্পন্ন করিয়া পায়সান্ন ভোগ দিয়াছিলেন এবং পূজা-শেষে সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—"আপনারা আজ কায়মনোবাক্যে ঠাকুরের পাদপদ্মে প্রার্থনা করুন যেন মহাযুগাবতার ঠাকুর আজ থেকে বহুকাল 'বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়' এই পুণ্য ক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া ইহাকে সেবাধর্মের অপূর্ব সমন্বয় কেন্দ্র করিয়া রাখেন।" অবশ্য, সর্বপ্রথম নিয়মতান্ত্রিক ভাবে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা ও নামকরণ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১লা মে কলিকাতা বলরাম বসু মহাশয়ের বাটিতে হইয়াছিল। তথায় স্বামীজি মহারাজ গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতাগণকে আহ্বান করিয়া যথাবিহিত প্রস্তাবাদি উত্থাপন এবং মিশন স্থাপনের উদ্দেশ্য ও কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে আলোচনাদি করিয়া মিশন-কেন্দ্র পরিচালনার জন্য নিয়মাবলীও প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ইহার কয়েক মাস পরে বেলুড় মঠের জমি ক্রয় করা হয় এবং শ্রীশ্রীমা নবেম্বর মাসে মঠ-ভূমিতে শুভ পদার্পণ করেন।

ভবিষ্যৎ মঠ পরিচালনার জন্য স্বামীজি মহারাজ যে সকল নিয়মাবলী প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা বিশেষ দূরদর্শিতার পরিচায়ক এবং সে সকল নিয়মাবলীতে মহৎ উদার আদর্শ প্রতিফলিত। ঐ নিয়মাবলী হইতে কয়েকটি এস্থানে উদ্ধৃত করিলে সম্ভবতঃ অশোভন হইবে না ঃ

"আমাদের ঠাকুর মানের জন্য আসেন নাই। আমরা তাঁহার দাস, আমরাও মান ভোগের আকাঙ্ক্ষী নহি। নিজে সতত পবিত্র থাকিয়া পবিত্রতা শিক্ষা দিয়া তাঁহার আজ্ঞা পালন করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

ভগবান রামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত প্রণালী অবলম্বন করিয়া নিজের মুক্তি সাধন করা ও জগতের সর্বপ্রকার কল্যাণ-সাধনে শিক্ষিত হওয়ার জন্য এই মঠ প্রতিষ্ঠিত হইল। স্ত্রীলোকদিগের জন্যও ঐ প্রকার আর একটি মঠ স্থাপিত হইবে।

যে কেহ কাম-কাঞ্চন ত্যাগ করিয়া নিষ্কাম কর্ম, ভক্তি, যোগ, জ্ঞান—ইহাদের এক, দুই বা সমস্ত অভ্যাস করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে চান, যিনি সচ্চরিত্র, ঈর্ষাশূন্য ও অধ্যক্ষের এবং গুরুর আদেশ পালনে প্রাণপণ তৎপর, তিনি এই মঠের অঙ্গরূপে গৃহীত হইতে পারিবেন।” স্বামীজি এই ভাবের অনেকগুলি নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ যে কয়জন সন্ন্যাসীকে সেবাধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই অপূর্ব আত্মত্যাগের সাহায্যে ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গ শিষ্য স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের বাচনিক শুনিয়াছি ঠাকুর তাঁহাদের মধ্যে মাত্র বারজন ত্যাগী যুবককে সন্ন্যাসের ‘প্রেষ মন্ত্র’ প্রদানে সন্ন্যাসের উচ্চভূমিতে আরূঢ় করিয়া দিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে স্বামীজি মহারাজের নেতৃত্বে বিরজা-হোমের অনুষ্ঠান করিয়া এই দ্বাদশজন সন্ন্যাসী হন এবং স্বামীজিই তাঁহাদের সন্ন্যাসাশ্রমের নামকরণ করেন। তৎপরে অপর কয়েকজন গুরুভ্রাতাও স্বামীজির নেতৃত্বে বিরজা-হোমে আহুতি প্রদান করিয়া সঙ্ঘভূক্ত হইয়াছিলেন।

উপদেশ ও উপদেষ্টার আচরণের মধ্যে সঙ্গতি থাকিলে, প্রদত্ত উপদেশ প্রবল শক্তিসমন্বিত হইয়া উপদিষ্টকে প্রভাবান্বিত ও চালিত করে। শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ ও আচরণের মধ্যে পূর্ণ সঙ্গতি ছিল বলিয়াই শিষ্যগণের প্রতি তাঁহার নির্দেশ ও উপদেশাবলী তাঁহার তিরোধানের পরেও যেন জীবন্ত হইয়াই প্রবল শক্তিতে শিষ্যগণকে পরিচালিত করিতেছিল। তাঁহার নির্দেশ ও উপদেশে শিষ্যগণের আন্তরিক শ্রদ্ধা ক্রমে নিষ্ঠায়, নিষ্ঠা তৎপরায়ণতায়, তৎপরায়ণতা তন্ময়তায় পরিণত হইয়া শিষ্যগণের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার বাণীকে অভিন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। শিষ্যগণের বিভিন্ন উক্তি হইতে ইহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। স্বামীজি মহারাজ বলিয়াছিলেন—“আমার পিছনে আমি এমন

একটা শক্তি দেখছি যা মানুষ দেবতা বা শয়তানের শক্তির চেয়ে অনেকগুণ বড়।" স্বামী অভেদানন্দ বলিতেন—"এ শরীর রামকৃষ্ণময় হইয়া গিয়াছে।" মহাপুরুষ মহারাজ (স্বামী-শিবানন্দ) বলিয়াছিলেন—"যে আমাকে দেখেছে, সে তাঁকেই (ঠাকুরকেই) দেখেছে। তিনি আর তাঁর ছেলেরা কি পৃথক ?"

শ্রীরামকৃষ্ণের উদার ভাবধারাই তাঁহার সন্তানগণের মধ্যে সক্রিয় ছিল। তাঁহাদের মধ্যে কোন সঙ্কীর্ণতা বা সম্প্রদায়গত বুদ্ধি ছিল না। বিনীতভাবে সর্ব-মানবের সেবা করাই তাঁহাদের আদর্শ ছিল। স্বামীজি মহারাজ বলিয়াছেন—"তুমি কাহাকেও সাহায্য করিতে পার না। তুমি কেবল সেবা করিতে পার। ঈশ্বরের অনুগ্রহে যদি তাঁহার কোন সন্তানের সেবা করিতে পার, তবে তুমি ধন্য হইবে। নিজকে একটা কেষ্ট বিষ্টু ভাবিও না। তুমি ধন্য যে তুমি সেবা করিবার অধিকার পাইয়াছ, অপরে পায় নাই। উহাই তোমার ঈশ্বরপূজা।"

এই বিনীত মনোভাবই ছিল স্বামীজির সেবা-ধর্মের ভিত্তিভূমি। এই উদ্দেশ্যে তিনি একটি সন্ন্যাসী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন, যে সন্ন্যাসীরা "নিজের মুক্তি কামনার সাথে সাথে পরার্থে আত্মোৎসর্গ করিবে।" পরার্থে আত্মোৎসর্গ করাকে তিনি কিরূপ গুরুত্বপূর্ণ মনে করিতেন নিম্ন বর্ণিত ঘটনা হইতে তাহা পরিস্ফুট হইবে।

একদিন স্বামীজি বেলুড় মঠে তাঁহার প্রকোষ্ঠসংলগ্ন পূর্বদিকস্থ বারান্দায় বিশ্রাম করিতেছিলেন ঐ সময়ে গঙ্গায় যাত্রিপূর্ণ একখানি নৌকা প্রবল বায়ুবেগে নিমজ্জিত হয় এবং যাত্রিগণ তীব্র আর্তনাদ করিয়া উঠে। ঐ আর্তধ্বনি তাঁহার কর্ণে আসিবামাত্র তিনি তড়িৎ-গতিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বিপন্ন যাত্রিগণকে উদ্ধার করিবার জন্য চঞ্চল হইয়া নিকটস্থ সন্ন্যাসীগণকে উচ্চকণ্ঠে আহ্বান করিয়া বলিলেন—"যে নিজের জীবন বিপন্ন

করে এদের রক্ষা করবে, আমি বল্‌ছি সে নিশ্চিতই মুক্ত হবে।” তাঁহার এই কথা শুনিবামাত্র কয়েকজন যুবক-সন্ন্যাসী গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া যাত্রিগণকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইলেন। তাহাদের চেষ্টায় অনেকেরই জীবন রক্ষা পাইয়াছিল। একজন বলিষ্ঠ সন্ন্যাসী দুইজনকে উদ্ধার করিয়া দুই বগলে লইয়া মঠের প্রাঙ্গণে পৌঁছিয়াই বলিয়া উঠিলেন—“স্বামীজি দুজনকে রেখেছি আর পারলুম না।” স্বামীজি আনন্দে অধীর হইয়া তাহাদিগকে আলিঙ্গন ও আশীর্বাদ দিয়াছিলেন।

ত্রিতাপপীড়িত জনগণের দুঃখে ব্যথিতচিত্ত হইয়া যাঁহারা তাহাদের ক্লেশমুক্তির উপায় উদ্‌ভাবন এবং পথনির্দেশ করেন তাঁহারাই জগতে মহাপুরুষ নামে খ্যাত হন। যতদিন তাঁহাদের মতবাদ বা ভাবধারা জনসমাজে অনুসৃত হয় ততদিন তাঁহারা জীবিত ব্যক্তির ন্যায়ই জনসমাজকে প্রভাবিত করেন। এই কারণেই বলা হয় মহাপুরুষগণ তাঁহাদের মতবাদ বা ভাবধারার মধ্যেই জীবিত থাকেন। মহাপুরুষগণের ভাবধারা বাস্তবে রূপায়িত করিতে হইলে তাঁহাদের সাক্ষাৎ শিষ্যদিগের পক্ষে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান গঠন এবং জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের উপযোগী প্রচারাদির আবশ্যক হয়। প্রথমটি উদ্দেশ্য, সুতরাং মুখ্য। দ্বিতীয়টি উপায়, সুতরাং গৌণ। বহু প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে যে কালক্রমে উপায়ই মুখ্য স্থান অধিকার করে এবং উদ্দেশ্য গৌণ হইয়া পড়ে। বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠার সময় স্বামীজির মনে এই আশঙ্কা উদয় হইয়াছিল। সে জন্য তিনি বলিয়াছিলেন—“স্থির জেন যতদিন তাঁর (শ্রীরামকৃষ্ণের) নামে অনুগামীরা পবিত্রতা, আধ্যাত্মিকতা এবং সর্বমানবে সমপ্রীতির আদর্শ রক্ষা করতে পারবে ততদিন ঠাকুর এই মঠকে তাঁর দিব্য উপস্থিতির দ্বারা ধন্য করে রাখবেন।” বিষয়টি আরও পরিস্ফুট করিবার জন্য তিনি বলিয়াছিলেন—“যদি জগত হইতে

শ্রীরামকৃষ্ণ মূর্তি অন্তর্হিত হইয়া যায় তাহাতে আমার কিছুমাত্র দুঃখ নাই যদি তাঁহার বাণী জগতে বর্তমান থাকে।"

আদর্শ যাহাতে ধারাবাহিক ভাবে রক্ষিত হইতে পারে সেই জন্য স্বামীজি উপযুক্ত 'মানুষ' তৈয়ার করিয়া লইবার জন্য অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতেছিলেন। ভাবী কর্মিগণের সম্মুখে মহান আদর্শ তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন—"শোন বৎসগণ, শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন, জগতের কল্যাণকামনায় দেহ বিসর্জন করে গেছেন। আমি, তুমি, আমাদের প্রত্যেকে অনুরূপভাবে জগতের কল্যাণের জন্য দেহ বিসর্জন কর্তে হবে। বিশ্বাস কর, আমাদের হৃদয়মোক্ষিত প্রতিটি রক্তবিন্দু হতে ভবিষ্যতে মহা মহা কর্মবীর উদ্‌ভূত হয়ে জগৎ আলোড়িত করে দেবে।"

কিরূপ মানুষ তিনি চাহিতেন তৎ প্রসঙ্গে তিনি বলিতেন—"রমনী-সুলভ কোমল-হৃদয় অথচ শক্তিমান ও বলীয়ান; স্বাধীনতা-প্রিয় অথচ বিনীত ও আজ্ঞাবহ—ইহাই মানুষের লক্ষণ। পরের দুঃখে অশ্রুবিসর্জন করিতে হইবে অথচ দৃঢ়চিত্তও থাকিতে হইবে।"

দীর্ঘদিন শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও স্বামীজি শ্রীগুরুদেবের মহাব্রত উদ্‌যাপন করিবার জন্য কঠোর পরিশ্রম করিতে বিরত হন নাই। বরং এই জন্য তিনি বিশেষ তৃপ্তি বোধ করিতেন। তাঁহার গুরুভ্রাতাগণ ও মঠের তরুণ সাধুবৃন্দ মিশনের দায়িত্ব পালনে যথোচিত তৎপর হওয়ায় স্বামীজি বিশেষ আশান্বিত হইয়াছিলেন। মিশনে কর্মিদিগের আত্মত্যাগমূলক কর্ম ভারতকে প্রবুদ্ধ করিতে সাহায্য করিবে ইহাই ছিল তাঁহার আশা। তাই তিনি বলিতেন—"আমি জীবনে যাহা কিছু ঘা খেয়েছি, যাহা কিছু যন্ত্রণা ভোগ করেছি, সবই পরমানন্দে পরিণত হবে যদি মা আবার ভারতের দিকে মুখ তুলে চান।"

মানসিক বল অটুট থাকিলেও তাঁহার অসুস্থ শরীর অবিশ্রান্ত কঠোর পরিশ্রম সহ্য করিতে পারিল না, স্বাস্থ্য দ্রুত ভাঙ্গিয়া

পড়িতে লাগিল। শুভানুধ্যায়ী এবং ভক্তগণ উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ পরামর্শ দিলেন যে বিদেশে যাত্রা করিলে সুদীর্ঘ সমুদ্র ভ্রমণে একান্ত আবশ্যক বিশ্রাম লাভ সম্ভব হইবে এবং ফলে স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে। শুভানুধ্যায়ী বন্ধুবর্গ ও পাশ্চাত্য শিষ্যবর্গ তাঁহাকে পাশ্চাত্যদেশে যাইবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার পাশ্চাত্যদেশে যাওয়াই স্থিরীকৃত হইল। তিনি মনে করিলেন এই উপলক্ষে শেষ বারের মত বিদেশের কার্য সমাধা করিয়া আসিবেন।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী তখন বাগবাজারে অবস্থান করিতেছিলেন। স্বামীজি মঠ হইতে গুরুভ্রাতাগণের সহিত জননীর আশীর্বাদ-প্রার্থী হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং আহারাদি-অন্তে মায়ের আশীর্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

ঐ দিনই মঠবাসী সকলে সমবেত হইয়া এক আনন্দ সম্মিলনে স্বামীজিকে তাহাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার উপদেশ ও নির্দেশ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ঐ উপলক্ষে স্বামীজি 'কর্মী এবং কর্ম' সম্বন্ধে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদান করেন। বিশিষ্ট দেশকাল-পাত্র লক্ষ্য করিয়া প্রদত্ত হইলেও ভাষণটিতে প্রতিফলিত হইয়াছে দেশকাল-পাত্র নিরপেক্ষ এক মহাসত্য যাহা তীব্র-সংবেগ-সম্পন্ন নিদিধ্যাসনের ফলে আমিত্ব (আমি কর্তা এই বোধ) ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইলে সাধকের প্রায়-বিক্ষেপ-শূন্য চিত্তে স্বতঃই উদ্‌ভাষিত হইয়া উঠে। ভাষণটি শুধু আয়তনে সংক্ষিপ্ত নহে, উহা স্বামীজির জীবন-দর্শনের সংক্ষিপ্ত-সার এবং 'সূত্রগ্রন্থ'-স্থানীয়। এই কালের পূর্ববর্তী তাঁহার রচনাবলী ও বক্তৃতা সমূহে স্থানে স্থানে এই জীবন দর্শনের ছায়াপাত হইয়াছে। তাঁহার পরবর্তী কালের রচনাবলী এবং বক্তৃতাসমূহ উহার আংশিক ভাব সম্প্রসারণ মাত্র আর তাঁহার কর্ম এবং আচরণ উহার জীবন্ত ভাষ্য। স্বামীজিকে যথাযথ বুঝিতে

হইলে ভাষণটির মর্ম অনুধাবন একান্ত আবশ্যক। সেই জন্য স্বামীজির জীবন-গতি অনুসরণের ধারা ভঙ্গ করিয়া আমরা ভাষণটির বিশদ আলোচনা করা বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করি।

* *

*

আট

॥ স্বামীজির জীবন-দর্শন ॥

পূর্ব-অধ্যায়ে মঠবাসীর সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণটিকে স্বামীজির জীবন-দর্শনের সূত্রগ্রন্থ বলা হইয়াছে, কারণ উহাতে সল্পকথায় গূঢ় তত্ত্ব-সকলের ইঙ্গিত করা হইয়াছে। বোধ-সৌকর্যার্থে ভাষণটিকে অনুচ্ছেদে বিভক্ত করিয়া যথাশক্তি উহার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইতেছি। উপরের অংশে বক্তৃতার মূল এবং নিম্নে উহার ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইতেছে।

(মূল বক্তৃতা)

১। এখন দীর্ঘ বক্তৃতা করিবার অথবা বক্তৃতা শক্তি প্রকাশ করিবার সময় নহে।

২। আমি তোমাদিগকে কয়েকটি বিষয় বলিতে ইচ্ছা করি। আশা—তোমরা এইগুলি কার্যে পরিণত করিবে।

(ব্যাখ্যা)

১। বক্তব্য বিষয়ের গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন করিবার জন্য বলিতেছেন—"এখন দীর্ঘ বক্তৃতা ইত্যাদি।" দীর্ঘ বক্তৃতায় অবশ্যম্ভাবীভাবে পুনরুক্তি, অতিশয়োক্তি এবং বিষয় বিশেষের উপরে আবশ্যকাতিরিক্ত গুরুত্বপ্রদান প্রভৃতি দোষ আসিয়া পড়ে। বক্তৃতাশক্তি প্রকাশ করিতে গেলে ভাষার আড়ম্বর, বুদ্ধির চমক এবং আবেগের আশ্রয় লইতে হয়। উভয়ক্ষেত্রেই বক্তব্য তত্ত্ব আচ্ছাদিত হইয়া পড়ে। যেহেতু এখন অনাবৃত সত্যকেই প্রকাশ করা হইবে সুতরাং দীর্ঘ বক্তৃতা বা বক্তৃতাশক্তির প্রকাশ উহার পক্ষে অনুপযোগী ইহাই সূচিত হইল। 'এখন' এই শব্দের দ্বারা সূচিত হইল যে ইতিপূর্বে দীর্ঘ বক্তৃতা এবং বক্তৃতাশক্তি প্রকাশ করা হইয়াছে এবং উহাতে অনাবৃত সত্য প্রকাশিত হয় নাই। ইহার পর যাহা বলিবেন এই প্রথম উক্তিতে তাহার অসাধারণ গুরুত্ব সূচিত হইল।

২। তত্ত্ব-অনুসারে জীবনকে পরিচালিত করিবার জন্য আগ্রহশীল ব্যক্তির নিকটেই তত্ত্বপ্রকাশ সার্থক হয়। আগ্রহহীনের নিকট তত্ত্ব-প্রকাশ নিষ্ফল। সুতরাং ঐরূপ ক্ষেত্রে স্বতঃই বক্তার তত্ত্ব-প্রকাশে বাধা উপস্থিত হয়। উপস্থিত ক্ষেত্রে শ্রোতাগণ সতপক্ষ। সুতরাং তত্ত্ব-সাধনে তাহাদের আগ্রহ থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু তথাপি তত্ত্ব-প্রকাশের ঈষৎ বাধা বোধ করিতেছেন। সেইজন্য বলিতেছেন—"আমি তোমাদিগকে ইত্যাদি।" 'বলিতে ইচ্ছা করি' এই উক্তির দ্বারা গূঢ়তত্ত্ব-প্রকাশ বিষয়ে ঈষৎ দ্বিধা সূচিত হইয়াছে। 'আশা' এই শব্দের দ্বারা সূচিত হইয়াছে যে মনের এই দ্বিধাকে পরিহার করিয়াই তিনি তত্ত্ব-প্রকাশে উদ্যত হইতেছেন। প্রকাশ্য তত্ত্ব শুধু কথার-কথা নহে, উহা একান্তভাবে আশ্রয়ণীয় ইহাই বুঝাইবার জন্য বলিতেছেন—"আশা তোমরা ইত্যাদি।"

৩। প্রথমতঃ আমাদের আদর্শ কি, তাহা বুঝিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ উহা কার্যে পরিণত করিবার উপায়গুলি কি, তাহাও বুঝিতে হইবে।

৪। তোমাদের মধ্যে যাহারা সন্ন্যাসী, তাহাদিগকে পরের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করিতেই হইবে—কারণ, সন্ন্যাসী বলিতে তাহাই বুঝাইয়া থাকে।

৩। সাধ্য অর্থাৎ উদ্দেশ্য এবং সাধন অর্থাৎ উপায় সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকিলে, সাধনা বা কর্ম নিরর্থক এবং নিষ্ফল হইয়া পড়ে। সেইজন্য বলিতেছেন—"আমাদের আদর্শ ইত্যাদি।" অর্থ সুস্পষ্ট।

৪। সর্বমানবের কি আদর্শ (সাধ্য) হওয়া উচিত তাহা পরে ব্যক্ত করিবেন। সাধারণ সাংসারিক মানুষ অপেক্ষা আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাসীদিগের পক্ষে সাধ্য ও সাধন সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা অধিক আবশ্যক। আবার সাধারণতঃ তাহাদের মানসিক প্রস্তুতি সংসারীদিগের অপেক্ষা অধিক। সেই কারণে প্রথমেই সন্ন্যাসীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—"তোমাদের মধ্যে যাহারা ইত্যাদি।" সাধ্য পরে বলা হইবে বলিয়া প্রথমেই তাহাদের (সন্ন্যাসীদের) সাধন সম্বন্ধে বলিতেছেন—"পরের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করিতেই হইবে।" ইহাই সাধন বা আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হইবার উপায়। সন্ন্যাসীদিগকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইলেও ইহা সর্বমানবের পক্ষে প্রয়োজ্য। 'পরের কল্যাণ' বলিতে কি বুঝায় তাহা পরে প্রকাশ করিবেন। প্রসঙ্গতঃ প্রকৃত সন্ন্যাসীর লক্ষণ বলিতেছেন "সন্ন্যাসী বলিতে তাহাই বুঝাইয়া থাকে।"

ইহার অর্থ এই যে যাহারা নিত্য পরের কল্যাণে রত তাহারাই প্রকৃত সন্ন্যাসী। অপরের বল্যাণ করিতে গেলে নিজের স্বার্থ সঙ্কুচিত করিতে হয়। স্বার্থবোধ এবং অহংবোধ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। পুনঃপুনঃ স্বার্থবোধ সঙ্কুচিত হওয়ার ফলে অহংবোধ (আমি কর্তা এই বোধ) শীর্ণতা প্রাপ্ত হয়। অহংভাব ত্যাগ অথবা ত্যাগের প্রচেষ্টার নামই প্রকৃত সন্ন্যাস।

৫। ত্যাগ সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিবার এখন সময় নাই। আমি সংক্ষেপে ইহার লক্ষণ নির্দেশ করিতে চাই—মৃত্যুকে ভালবাসা।

৬। সাংসারিক ব্যক্তিগণ বাঁচিতে ভালবাসে সন্ন্যাসীকে মৃত্যু ভালবাসিতে হইবে।

৫। ত্যাগ কি উহাই আরও পরিস্ফুট করিবার জন্য বলিতেছেন— 'ত্যাগ সম্বন্ধে ইত্যাদি।' ত্রিগুণভেদে এবং বাহ্য ও আন্তরভেদে ত্যাগের বহু প্রকারে ভেদ হয়। গীতাদি শাস্ত্রে উহা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং ঐ আলোচনার পুনরুক্তি না করিয়া সংক্ষেপে ত্যাগের লক্ষণ বলিতেছেন—'মৃত্যুকে ভালবাসা।' মৃত্যু বলিতে যে দেহপাত লক্ষ্য করা হইতেছে না, ইহা পরের অনুচ্ছেদে বলিবেন। তাহা হইলে 'মৃত্যুকে ভালবাসা, বলিতে কি বুঝায়? যাহাকে ভয় করা যায় তাহাকে ভালবাসা যায় না, আবার যাহাকে ভালবাসা যায় তাহাকে কেহ ভয় করে না। মৃত্যুকে সকলেই ভয় করে। কেন ভয় করে? কারণ মৃত্যুতে আমিত্বের (আমি কর্তা, আমি ভোক্তা এই বোধের) বিলয়ের আশঙ্কা থাকে। এই আশঙ্কা নিরস্ত করিবার জন্যই মানুষ পরলোক এবং জন্মান্তরের কল্পনা করিয়া আশ্বস্ত হয়। কিন্তু আমিত্বের বিলয়ই সাধনার উদ্দেশ্য। যে আমিত্বের বিলয়ের আশঙ্কায় সাধারণ মানুষ মৃত্যুকে ভয় করে, সাধক স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া সেই আমিত্বের বিলয়ের জন্য চেষ্টিত হয়। সুতরাং তাহার পক্ষে মৃত্যুকে ভয় করিবার কিছুই থাকে না। এইরূপে মৃত্যুভয় দূর হওয়াকে মৃত্যু-জয় বলে। এই অবস্থাকেই বিগতভীঃ, অভীঃ প্রভৃতি সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়। 'মৃত্যুকে ভালবাসা' বলিতে ইহাই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

৬। সংসারী ব্যক্তিগণ কেন মৃত্যুকে ভয় করে তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। ঐ কারণেই তাহারা বিপরীত অবস্থা অর্থাৎ জীবনকে তথা পরলোক ও জন্মান্তরের কল্পনাকে ভালবাসে। প্রকৃত সন্ন্যাসী হইতে হইলে কি করিতে হইবে তাহাই বলিতেছেন—'মৃত্যু ভালবাসিতে হইবে।' 'মৃত্যুকে ভালবাসা' বলিতে কি লক্ষ্য করা হইয়াছে তাহা পূর্বে বলা

৭। তবে কি আমাদিগকে আত্মহত্যা করিতে হইবে? তাহা কখনই হইতে পারে না। কারণ আত্মহত্যাকারিগণ প্রকৃত পক্ষে মৃত্যুকে ভালবাসে না। দেখাও যায়—আত্মহত্যা করিতে চেষ্টা করিয়া যদি কেহ তাহাতে অকৃতকার্য হয়, সে পুনরায় ঐ চেষ্টা প্রায় করে না।

৮। তবে মৃত্যুকে ভালবাসার অর্থ কি? তাৎপর্য এই আমাদিগকে মরিতে হইবে—ইহা অপেক্ষা ধ্রুব সত্য কিছুই নাই। তবে আমরা কোন মহৎ ও সৎ উদ্দেশ্যের জন্য দেহপাত করি না কেন? আমাদের সকল কার্য, আহার-বিহার, অধ্যয়ন প্রভৃতি যাহা কিছু আমরা করি সবগুলিই যেন আমাদিগকে আত্মত্যাগের অভিমুখ করিয়া দেয়।

৯। তোমরা আহারের দ্বারা শরীর পুষ্ট করিতেছ কিন্তু শরীর পুষ্টি করিয়া কি হইবে, যদি উহাকে আমরা অপরের কল্যাণের জন্য

হইয়াছে। এখানে পুনর্বার বলিবার কারণ সংসারীদের পূর্বোক্ত যে বিশ্বাস ও কল্পনা আমিত্বের ধারক ও পোষক তাহা সন্ন্যাসীকে পরিত্যাগ করিতে হইবে এইটি বুঝাইবার জন্য।

৭। 'মৃত্যুকে ভালবাসা' বলিতে যে দেহপাত লক্ষ্য করা হইতেছে না, তাহাই পরিস্ফুট করিবার জন্য বলিতেছেন—'তবে কি আমাদিগকে ইত্যাদি।' অর্থ স্পষ্ট।

৮। মৃত্যুকে ভালবাসার প্রকৃত ও চরম তাৎপর্য পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই তাৎপর্যগ্রহণ উচ্চাধিকারীর পক্ষেই সম্ভব, নিম্নাধিকারীর পক্ষে নহে। নিম্নাধিকারী কোন্ অর্থে উহা গ্রহণ করিবেন তাহাই এ স্থলে প্রকাশ করিতেছেন—'আমাদিগকে মরিতে হইবে ইত্যাদি।' মৃত্যু ধ্রুব এবং অপরিহার্য। দেহ যখন থাকিবে না তখন সৎকার্যে উহা পাত করাই সমীচীন। সৎকার্য বলিতে নিজের স্বার্থ-ত্যাগ এবং অপরের কল্যাণ-সাধন লক্ষ্য করা হইতেছে উহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

৯। উপদিষ্ট বিষয়ে শ্রোতাগণের শ্রদ্ধা দৃঢ়তর করিবার জন্য স্বার্থ

উৎসর্গ করিতে না পারি ? তোমরা অধ্যয়নাদির দ্বারা মনের পুষ্টি বা বিকাশ সাধন করিতেছ—তাহাতেই বা কি হইবে, যদি ইহাতেও অপরের কল্যাণের জন্য উৎসর্গ করিতে না পার ?

১০। কারণ, সমগ্র জগৎ এক অখণ্ড সত্ত্বা-স্বরূপ, তুমি ত ইহার নগণ্য ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। সুতরাং এই ক্ষুদ্র আমিত্বটাকে না বাড়াইয়া তোমার কোটী কোটী ভাইয়ের সেবা করাই তোমার পক্ষে স্বাভাবিক কার্য না করাই অস্বাভাবিক।

কৃত কর্মের হেয়তা প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন—"তোমরা আহারের দ্বারা ইত্যাদি।" অর্থ সুস্পষ্ট।

১০। অপরের কল্যাণ-সাধন কি কারণে আবশ্যক তাহা বুঝিতে হইলে সমগ্র ও অংশের স্বরূপ, তথা উহাদের সম্বন্ধই বা কি তাহা বুঝিতে হইবে। জগৎই বা কি আর উহার মূলই বা কি উহাও বুঝিতে হইবে। এইজন্য প্রথমেই বলিতেছেন—"সমগ্র জগৎ অখণ্ড সত্তাস্বরূপ।" কিরূপে ইহা বুঝিব ?

ব্যবধান বা অবকাশ না থাকিলে খণ্ডের বোধ সম্ভব হয় না। ব্যবধান এবং খণ্ডসমূহ অবিনাভাবী। উভয়েরই সত্তা অর্থাৎ বিদ্যমানতা আছে। অন্য কথায় বলিতে গেলে উভয়ই সত্তার দ্বিবিধ প্রকাশ মাত্র। সুতরাং জগৎ বিভক্ত বা খণ্ডিতের ন্যায় মনে হইলেও সত্তা অর্থাৎ বিদ্যমানতা খণ্ডিত হইতেছে না।

প্রকারতা, বিশেষ্যতা এবং সংসর্গতাংশূণ্য অস্তিত্বই ব্যবধান বা অবকাশরূপে আমাদের উপলব্ধিতে আসে। সুতরাং উহা সর্বত্রই এবং সর্বদাই একরূপ। পক্ষান্তরে প্রকারতা, বিশেষ্যতা এবং সংসর্গতা-যুক্ত অস্তিত্বই ভিন্ন ভিন্ন পদার্থরূপে অর্থাৎ খণ্ডরূপে আমাদের উপলব্ধিতে আসে। প্রকারতা, বিশেষ্যতা ও সংসর্গতার আনন্ত্য-প্রযুক্ত খণ্ড-অস্তিতের বা পদার্থ-সমূহের রূপের ও গুণের আনন্ত্য সিদ্ধ হয়। উহা নিষ্প্রাণ (Inanimate) এবং সপ্রাণ (Animate) উভয়বিধ পদার্থের সম্বন্ধে সমভাবে প্রযোজ্য।

এখন বিজ্ঞানের দিক হইতে বিষয়টি দেখা যাক্। বিভিন্ন বস্তুর চরম বিশ্লেষণে (এখনও পর্যন্ত যতদূর করা সম্ভব) আমরা পাই কয়েকটি মাত্র

মৌলিক কণিকা (Fundamental particle) উহাদের মধ্যে একটি হইল প্রোটন, উহা ধন-তাড়িত-চার্জ-যুক্ত। আর একটি হইল ইলেকট্রন, উহা ঋণ-তাড়িত-চার্জ-যুক্ত। আর একটি হইল নিউট্রন, উহা তাড়িত-চার্জ-শূণ্য। প্রথম দুইটির তাড়িত-চার্জ বিপরীত হইলেও সম-পরিমাণ। কণিকাগুলির পিণ্ড বা ভর (Mass) এর মধ্যে গুণগত কোন ভেদ নাই কিন্তু পরিমাণগত ভেদ আছে। দ্বিতীয়টি অপেক্ষা প্রথম এবং তৃতীয়টি প্রায় ১৮০০ গুণ ভারী। প্রধানতঃ এই তিনটি কণিকা লইয়াই বিভিন্ন মূল-পদার্থের (Elements) পরমাণুগুলি গঠিত। প্রোটন এবং ইলেকট্রনের মধ্যে এক বিশিষ্ট সম্পর্ক আছে। উহা এই যে কোন বিশেষ পরমাণুতে (Atom) যতগুলি প্রোটন থাকিবে ততগুলি ইলেকট্রন অবশ্যই থাকিবে। বিভিন্ন মূল-পদার্থের পরমাণুতে প্রোটন সংখ্যা বিভিন্ন। ঐ সংখ্যা ক্রমিক অর্থাৎ ১. ২. ৩. ইত্যাদি। প্রোটন সংখ্যার বিভিন্নতার জন্য মূল পদার্থ-সমূহের গুণ (Chemical property) বিভিন্ন। ইলেকট্রনের সংখ্যা এবং বলয়-বিন্যাসের বিভিন্নতার উপর মূল পদার্থ-সমূহের রূপ এবং উহাদের পরস্পরের সহিত যোগ-সম্ভাবনা নির্ভর করে। প্রোটন এবং নিউট্রনের সংখ্যার বিভিন্নতার উপর মূল পদার্থের ভারের বিভিন্নতা নির্ভর করে। এই পরমাণু-সমূহ মিলিত হইয়া বিভিন্ন যৌগিক পদার্থের অণু, এবং বিভিন্ন শ্রেণীর অণু মিলিত হইয়া বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ গঠন করিয়াছে। সুতরাং বিশ্বের সমূদায় পদার্থের মূলে আমরা পাইলাম পিণ্ড বা ভর (Mass) এবং শক্তি (Energy)। পিণ্ড বা ভর শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। বিপরীতক্রমে শক্তিও পিণ্ড বা ভরে রূপান্তরিত হয় (যদিও পরীক্ষাগারে ইহা করা এখনও সম্ভব হয় নাই)। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় যে এখনও পর্যন্ত অজ্ঞাত, অথবা অজ্ঞেয় এমন এক পরম বস্তু আছে, যাহার এক রূপ পিণ্ড বা ভর (Mass) এবং অপর এক রূপ শক্তি (Energy)। সেই পরম-বস্তু অবশ্যই অব্যাকৃতা (Undifferentiated)। ইহাই আদ্যাশক্তি। অন্য সব শক্তি ইহার রূপান্তর মাত্র। ইহাও 'আছে' বলিয়া ইহারও প্রতিষ্ঠাভূমি নির্বিশেষ 'অস্তিত্ব'। অনির্দেশ্য বলিয়া ঐ অস্তিত্ব 'তৎ' এবং নিত্য বলিয়া তাহা 'সৎ'। এই তৎ বা সৎ অখণ্ড। সুতরাং 'অখণ্ড স্বরূপতা' সিদ্ধ হইল।

জগৎ হইল যুগপৎ অব্যাকৃতা আদ্যাশক্তির (মূলা প্রকৃতির) ব্যাকৃতি-প্রক্রিয়া (Process of manifestation) এবং তদর্থীয় সংস্থান (System)।

প্রক্রিয়া বলিয়া উহা (অজ্ঞেয়) লক্ষ্যাভিমুখী-গতিযুক্ত। সংস্থান বলিয়া উহার যাবতীয় খণ্ড খণ্ড পদার্থ সমগ্রের সহিত তথা পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট এবং পরস্পরের উপর নির্ভরশীল ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া-রত। ব্যাকৃতির উদ্দেশ্যে স্বগতভেদের সাহায্যে প্রকৃতি নানাত্ব বা খণ্ডত্ব সাধিত করেন। শক্তির ধ্বংসও নাই, সৃষ্টিও নাই, মাত্র রূপান্তর আছে। সুতরাং সমগ্রভাবে জগতের বস্তু পরিমাণ পরিমিত (Constant)। এই কারণে খণ্ড বিশেষে পরিমাণের আধিক্য হইলে অপর খণ্ড সমূহে পরিমাণের ন্যূণতা অবশ্যই হইবে ।

পরিমিত বস্তুর সাহায্যে সর্বাধিক (Maximum) ব্যাকৃতি (Manifestation) প্রকৃতির উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য লয়-উৎপত্তির শৃঙ্খল প্রবর্তিত হইয়াছে। এই জন্যই দেখা যায় এক বস্তুর লয় হইতেই অপর বস্তুর উৎপত্তি হইতেছে। প্রাণিবর্গের মধ্যে এই শৃঙ্খল ত্যাগ-গ্রহণ-রূপে জীব-ধারাকে পোষণ করিতেছে। একশ্রেণী যাহা ত্যাগ করিতেছে অপর শ্রেণী তাহা গ্রহণ করিয়া পুষ্ট হইতেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উদ্ভিদ এবং অন্য প্রাণীদের মধ্যে অক্সিজেন এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড ‘ত্যাগ-গ্রহণ’ চক্রের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এইরূপ বহু চক্র প্রবর্তিত আছে। উহাদের মধ্যে কতকগুলির আবর্তন অনধিক রূপান্তরের মধ্য দিয়া সঙ্ঘটিত হয় বলিয়া সল্পকাল-সাপেক্ষ। সুতরাং সহজেই উহা আমাদের বুদ্ধিগোচর হয়। অপর কতকগুলির আবর্তন অধিক বা অত্যধিক রূপান্তরের মধ্য দিয়া সঙ্ঘটিত হয় বলিয়া দীর্ঘকাল-সাপেক্ষ। সুতরাং এইরূপ আবর্তন সহজে আমাদেয় বুদ্ধিগোচর হয় না। আমাদের বুদ্ধিগোচর হউক বা না হউক ‘ত্যাগ-গ্রহণের’ এই চক্র আবর্তিত হইবেই। ইহাই প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক বিধি। এই বিধির অনুবর্তনই কর্ম।

এইরূপে কর্মের প্রকৃত রহস্য বা স্বাভাবিক বিধি ব্যক্ত করিলেন। কিন্তু তত্ত্ব-প্রতিষ্ঠ না হইলে এই বিধির উপলব্ধি বা অনুবর্তন সম্ভব নহে। সুতরাং অনুষ্ঠাতার সাধন (Means) অনুযায়ী সাধ্যের (End) সঙ্কোচ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। নিম্ন-অধিকারীও যাহাতে ক্রমিক চিত্ত-শুদ্ধির দ্বারা কালে তত্ত্ব লাভ করিতে, তথা উক্ত স্বাভাবিক বিধির অনুবর্তন করিতে সক্ষম হয় সেই জন্য তাহাকে প্রথমে উক্ত আদর্শ সঙ্কুচিত করিয়া সম-জাতীয় জীবের সেবায় বা কল্যাণকর কর্মে অভ্যস্ত হইতে হয়। এই জন্যই বলিতেছেন—“তুমি ত ইহার ক্ষুদ্র অংশ মাত্র ইত্যাদি।”

১১। উপনিষদের সেই মহতী বাণী কি স্মরণ নাই ?

সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষি শিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥

১২। এইরূপে তোমাদিগকে আস্তে আস্তে মরিতে হইবে। মৃত্যুতেই স্বর্গ—মৃত্যুতেই সকল কল্যাণ অধিষ্ঠিত আর ইহার বিপরীত বস্তুতে সমুদয় অকল্যাণ ও আসুরিক ভাব নিহিত।

১৩। তারপর এই আদর্শটিকে কার্যে পরিণত করিবার উপায়গুলি কি, তাহা বুঝিতে হইবে। প্রমথমতঃ এইটি বুঝিতে হইবে যে অসম্ভব আদর্শ রাখিলে চলিবে না। অতিমাত্রায় উচ্চ আদর্শে জাতিকে দুর্বল ও হীন করিয়া ফেলে। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম সংস্কারের পর এইটি ঘটিয়াছে।

১১। পূর্বোক্ত 'তৎ' এর সর্বাত্মতা-বোধ দৃঢ় করিবার জন্য বলিতেছেন—'সর্বতঃ পাণিপাদং ইত্যাদি।' অর্থ স্পষ্ট।

১২। আমিত্বের (আমি কর্তা, আমি ভোক্তা এই বোধের) বিলয়ই সাধনার উদ্দেশ্য। ইহা ৫ অনুচ্ছেদে বলিয়াছেন। ইহার গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন করিবার জন্য পুনরায় বলিতেছেন—"এইরূপে তোমাদিগকে ইত্যাদি।" 'মৃত্যু' বলিতে কি লক্ষ্য করিতেছেন তাহাও ৫ এবং ৬ অনুচ্ছেদে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। যাহার অহংকৃত ভাব নাই (অর্থাৎ যাহার আমি কর্তা বোধ ক্ষীণতা প্রাপ্ত বা বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে) তাহার অনুষ্ঠিত কর্ম কল্যাণ-দায়ক হয়। ইহাকে দৈবীভাব বলা হয়। যাহারা বিপরীত ভাব-যুক্ত তাহাদের অনুষ্ঠিত কর্ম অপরের অকল্যাণকর হয়। ইহাকেই আসুরিক ভাব বলা হয়। এই জন্য বলিতেছেন—"মৃত্যুতেই সকল কল্যাণ ইত্যাদি।"

১৩। কেন আদর্শ-সঙ্কোচ করা আবশ্যক হয় তাহা ১০ অনুচ্ছেদে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সাধন এবং সাধ্যের সামঞ্জস্য না থাকিলে আরব্ধ কার্য অসমাপ্ত, বিশৃঙ্খল ও শ্রীহীন হইয়া পড়ে। এই জন্য বলিতেছেন—'অসম্ভব আদর্শ রাখিলে চলিবে না। অতিমাত্রায় উচ্চ আদর্শে জাতিকে দুর্বল এবং হীন করিয়া ফেলে।" ইহার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্ম-সংস্কারের উচ্চ আদর্শের কথা উল্লেখ করিলেন।

১৪। অপরদিকে আবার অতিমাত্রায় 'কাজের লোক' হওয়াও ভুল। যদি এতটুকুও কল্পনাশক্তি তোমার না থাকে, যদি তোমাকে নিয়মিত করিবার একটা আদর্শ না থাকে, তবে তুমি ত একটা পশুমাত্র। অতএব আমাদিগকে আদর্শ খুব খাট করিলেও চলিবে না, আবার যেন আমরা কর্মকেও অবহেলা না করি। এই ছুইটি 'অত্যন্তকে' ছাড়িতে হইবে।

১৫। আমাদের দেশের প্রাচীন ভাব এই—কোন গুহায় বসিয়া ধ্যান করিতে করিতে মরিয়া যাওয়া। কিন্তু এখন এই বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে যে, আমি অমুকের চেয়ে শীঘ্র শীঘ্র মুক্তি লাভ করিব—এ ভাবটিও ভুল। মানুষ শীঘ্র বা বিলম্বে বুঝিতে পারে যে, যদি সে নিজের ভাইয়ের মুক্তির চেষ্টা না করে, তবে সে কখনই মুক্ত হইতে পারে না।

১৪। কোন আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া তৎ-সিদ্ধির জন্য যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহা একমুখী, সুশৃঙ্খল এবং ফলপ্রসূ হয়। পক্ষান্তরে আদর্শ সম্মুখে না রাখিয়া কর্ম অনুষ্ঠিত হইলে উহা ইতঃস্তত-বিক্ষিপ্ত, গতানুগতিক এবং অল্পফল-প্রসূ হয়। প্রথমটি করণীয়, দ্বিতীয়টি পরিত্যাজ্য। ইহাই বুঝাইবার জন্য বলিতেছেন—"যদি এতটুকুও কল্পনাশক্তি ইত্যাদি।" আদর্শবিহীন কর্ম এবং কর্ম-বিহীন আদর্শ উভয়ই অল্পফলপ্রসূ। সুতরাং উভয়কে পরিত্যাগ করিয়া আদর্শ-যুক্ত কর্মের অনুষ্ঠানই শ্রেয়। ইহাই বুঝাইবার জন্য বলিতেছেন— "অতএব আমাদিগকে—ছাড়িতে হইবে ইত্যাদি।"

১৫। আমিত্ব বিলয় না হইলে মুক্তি হয় না। চিত্তশুদ্ধি না হইলে আমিত্ব বিলয় হয় না। অপরের কল্যাণে রত না হইলে চিত্তশুদ্ধি হয় না। এই কারণে জনসমাজকে বর্জন করিয়া নিভৃত স্থানে বসিয়া মুক্তি প্রচেষ্টা বিফল হয়। ইহাই বুঝাইবার জন্য বলিতেছেন—"আমাদের দেশের ইত্যাদি।" অপরের মঙ্গল-চেষ্টা না করিলে কেন মুক্তি হয় না তাহা ১০ অনুচ্ছেদের শেষ অংশে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

১৬। তোমাদের জীবনে যাহাতে প্রবল ভাবপরায়ণতার সহিত প্রবল কার্যকারিতা সংযুক্ত থাকে, তাহা করিতে হইবে। তোমাদিগকে গভীর ধ্যান-ধারণার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, আবার পরমূহূর্তেই এই মঠের জমিতে যাইয়া চাষ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। তোমাদিগকে শাস্ত্রীয় কঠিন সমস্যাসমূহের সমাধানের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে, আবার পরমূহূর্তেই এই জমিতে যে ফসল হইবে, তাহা বাজারে বিক্রয় করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। তোমাদিগকে খুব সামন্য কাজ, যেমন পাইখানা সাফ পর্যন্ত করিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে, শুধু এখানে নহে অন্যত্রও।

১৭। তারপর তোমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে এই মঠের উদ্দেশ্য মানুষ প্রস্তুত করা। অমুক ঋষি এই কথা বলিতেছেন- শুধু এইটি শিখিলেই চলিবে না। সেই ঋষিগণ এখন আর নাই। তাঁহাদের সহিত তাঁহাদের মতবাদও চলিয়া গিয়াছে।

১৬। প্রতিগ্রহ আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিপন্থী। এই কারণে সাধককে যথাসম্ভব অপ্রতিগ্রাহী হইতে হয়। অপ্রতিগ্রাহী হইবার উপায় নিজের (সঙ্ঘের ক্ষেত্রে নিজেদের) কায়িক শ্রমে শরীর যাত্রা নির্বাহ করা। মানসিক কর্ম (অধ্যয়ন ও ধ্যান-ধারণাদি) কায়িক কর্ম (শরীর-যাত্রার জন্য শ্রম) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এইরূপ ধারণা আত্মোন্নতির প্রতিবন্ধক। শুধু তাহাই নহে এই ভ্রান্ত ধারণা সমাজ-জীবনে সংক্রামিত হইলে, সমাজ ক্রমে ক্রমে পঙ্গু হইয়া পড়ে। সুতরাং ঐরূপ ধারণা পরিত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে যুগপৎ উভয়বিধ কর্মই করণীয়। সেই জন্য নির্দেশ দিতেছেন—"তোমাদের জীবন ইত্যাদি"। অর্থ স্পষ্ট।

১৭। মঠে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তাহা পুনর্বার স্মরণ করাইয়া বলিতেছেন—"মানুষ প্রস্তুত করা।" ইহার অর্থ এই যে যাহারা মঠে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছেন বা হইবেন তাহারা নিজদিগকে পূর্বোক্ত আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করিবেন এবং অপরকে ঐ আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হইতে সাহায্য করিবেন। প্রথমটি না হইলে দ্বিতীয়টি সম্ভব নহে, ইহাও এখানে সূচিত হইল।

১৮। তোমাদিগকে ঋষি হইতে হইবে। ঋষি বা মহাপুরুষ যেমন মানুষ, তোমরাও তেমনি মানুষ। এমন কি, অবতার পর্যন্ত যেমন মানুষ, তোমরাও সেই মানুষ। তোমাদিগকে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে হইবে। কেবল শাস্ত্র পাঠে কি হয়? এমন কি ধ্যান-ধারণাতেই বা কতদূর হইবে? মন্ত্র-তন্ত্রেইবা কি করিতে পারে?

বুদ্ধি উন্মেষিত ও চিন্তাশক্তি সক্রিয় না হইলে কোন বিষয়েই প্রকৃত জ্ঞান লাভ সম্ভব নহে। গ্রন্থ-পাঠ, আলোচনা, বা ঘটনা-পর্যবেক্ষণ প্রভৃতি যখন চিন্তাশক্তিকে উদ্রিক্ত (Stimulated) করে তখন মনে জিজ্ঞাসা জাগে। জিজ্ঞাসা জাগিলে চিন্তাশক্তি সক্রিয় হইয়া বুদ্ধির সাহায্যে অনুসন্ধান ও প্রশ্ন সমাধানে অগ্রসর হয়। ফলে তৎ-বিষয়ক জ্ঞানলাভ সম্ভব হয়। গ্রন্থ-পাঠে যদি চিন্তাশক্তি উদ্রিক্ত না হয় তবে পূর্বোক্ত জ্ঞানক্রিয়া ঘটিতে পারে না। সুতরাং গ্রন্থ-পাঠের মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়। ঐরূপ হইলে তোতা-পাখির মত অপরের উক্তি আবৃত্তি করার ক্ষমতা ব্যতীত অন্য কিছু লাভ হয় না। ইহাই বুঝাইবার জন্য বলিতেছেন—"অমুক ঋষি এই কথা বলিয়াছেন শুধু এইটি শিখিলেই চলিবে না।" এখানে 'ঋষি' শব্দের দ্বারা সমস্ত চিন্তাশীল ব্যক্তিই উপলক্ষিত হইয়াছে।

নিজে চিন্তা না করিয়া কেবল অপরের উক্তি আবৃত্ত করার অপর দোষও দেখাইতেছেন—"সেই ঋষিগণ ইত্যাদি।" কোনও সিদ্ধান্তকর্তা বা মতপ্রবর্তকের প্রাচীনতা বা শ্রেষ্ঠত্ব- খ্যাতি আছে বলিয়াই তাঁহার সকল সিদ্ধান্ত বা মত সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। প্রাচীন কালের মতপ্রবর্তক অনেক মনীষীর মতই তথ্য-সঙ্গত বলিয়া পরবর্তীকালে প্রতিপন্ন না হওয়ায় পরিত্যক্ত হইয়াছে। এই জন্যই বলিতেছেন—"ঋষিগণ এখন আর নাই। তাঁহাদের সহিত তাঁহাদের মতবাদও চলিয়া গিয়াছে।"

১৮। আধুনিক মানুষের আকৃতি যেরূপ, লক্ষ লক্ষ বৎসর পুর্বে আদিম মানুষের আকৃতি সর্বাংশে সেরূপ ছিলনা। পরিবর্তন হইয়াছে এবং হইতেছে। এই পরিবর্তন সাধারণতঃ-মন্থর ক্রমবিবর্তনের ফল। আকৃতিগত এই পরিবর্তনের সমান্তরালভাবে মনোগত পরিবর্তনও হইয়াছে এবং হইতেছে।

আদিম মানুষের ধারণা এবং সংস্কারাদি হইতে আধুনিক মানুষের ধারণাও সংস্কারাদি বহুলাংশে ভিন্ন।

সমস্ত প্রাণীই প্রাণের সহভাবী প্রাণরক্ষার প্রবৃত্তির (Impulse) তাড়ণায় অধিষ্ঠানের (Environment) পরিচয় ও জ্ঞান (অল্পবিস্তর) লাভ করিতে বাধ্য হয়। মানুষের মধ্যে এই পরিচয় ও জ্ঞানের সীমা ক্রমবিস্তৃত হয়। আদিম অবস্থায় এই পরিচয় ও জ্ঞান পদার্থ এবং ঘটনার (Phenomena) বহিরাংশেই নিবদ্ধ থাকে। পরস্পর-বিচ্ছিন্ন মানব-গোষ্ঠী-সমূহের এই জ্ঞান সঞ্চিত, রক্ষিত এবং পরবর্তী পুরুষে (Generation) সঞ্চারিত হয়। পূর্বাগত জ্ঞানসমষ্টি পরবর্তীদের পর্যবেক্ষণের ফলে আবিষ্কৃত নূতন তথ্য বিষয়ক জ্ঞান অথবা পদার্থ ও প্রাকৃতিক শক্তি ব্যবহারের নূতন প্রয়োগ কৌশলের (Technology) জ্ঞান দ্বারা সমৃদ্ধ হয় এবং সমগ্র জ্ঞান-সমষ্টি তৎপরবর্তী পুরুষে সঞ্চারিত হয়। এইরূপে জ্ঞানভাণ্ডার ক্রম-সমৃদ্ধ হয়।

ব্যবহারিক জ্ঞানের প্রসার বৃদ্ধির ফলে কালে বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী-সমূহের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয় এবং তাহাদের মধ্যে জ্ঞানের এবং প্রয়োগ-কৌশলের আদান-প্রদান সঙ্ঘটিত হয়। ইহার ফলে জ্ঞান-সমষ্টি অখণ্ডতা ও বিশ্বজনীনতা লাভ করে।

এইরূপে জ্ঞানের এবং প্রয়োগ কৌশলের ভিত্তি ব্যাপকতর হইলে উহাদের বৃদ্ধির গতিও দ্রুততর হয়। এইরূপ অবস্থায় মানুষের দৃষ্টি কেবলমাত্র পদার্থের অথবা ঘটনার বহিরাংশে বা কার্যে (Effect) নিবদ্ধ থাকিতে পারে না। অনিবার্যভাবে তাহার দৃষ্টি পদার্থের বা ঘটনার অন্তর্দিকে বা কারণে (Cause) আকৃষ্ট হয়। ইহারই ফলে তত্ত্বগত জ্ঞান-লাভ সম্ভব হয়।

তত্ত্বগত জ্ঞান আবার প্রয়োগ কৌশলকে উন্নততর করিয়া তোলে। ইহার ফলে নূতন নূতন তথ্য উদ্ঘাটিত বা আবিস্কৃত হয়। পূর্বাগত তত্ত্বের সহিত নব-আবিষ্কৃত তথ্য সমূহের সঙ্গতি না থাকিলে পূর্বপ্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব পরিত্যক্ত হয় অথবা নূতন তথ্যের আলোকে উহাকে পরিমার্জিত (Miodified) করা হয় অথবা নূতন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এইরূপে তত্ত্বগত ও তথ্যগত জ্ঞান এবং প্রয়োগ-কৌশলের জ্ঞান, পরস্পরকে পুষ্ট করিয়া মানব-জ্ঞানের সীমাকে ক্রমবর্দ্ধিত করিতেছে।

সমাজের চিন্তাশীল অংশই এই প্রসারণ কার্যে অংশ গ্রহণ করিয়া

১৯। তোমাদিগকে নূতন প্রণালীতে মানুষ প্রস্তুত করিতে হইবে।

থাকে। সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া অসংখ্য মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানে সমষ্টিগত জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধতর হইয়া জগতের কল্যাণ সাধন করে। এই কার্যে অংশ গ্রহণ করাতেই মনুষ্য জীবনের সার্থকতা।

ইচ্ছাশক্তি, চেষ্টা এবং অধ্যবসায়ের দ্বারা ধীশক্তি উন্মেষিত করিয়া সকলেই এই কার্যে অংশ গ্রহণের যোগ্য হইতে পারে। এই কারণে শ্রোতাদিগকে তদ্‌বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করিয়া বলিতেছেন—তোমাদিগকে 'ঋষি' অর্থাৎ চিন্তাশীল হইতে হইবে। যে শক্তিবলে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ (ঋষি, অবতার ইত্যাদি) জ্ঞান-সম্প্রসারণ কার্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন, সেই শক্তি সকলের মধ্যেই বর্তমান। কিন্তু ইচ্ছা, চেষ্টা, অনুশীলন ও অধ্যবসায়ের অভাবে সাধারণ মানুষের মধ্যে ঐ শক্তি জাগরিত বা সক্রিয় হইতে পারে না। ইহারই ফলে তাহারা গতানুগতিক জীবন যাপন করিতে বাধ্য হয়, অপরের (ঋষি, অবতার ইত্যাদি) মতের উপর অযৌক্তিকভাবে নির্ভরশীল হয়, অলৌকিকত্বে তথা মন্ত্র তন্ত্রে এবং আনুষ্ঠানিক (আভাসিক) ধ্যান ধারণার উপর আস্থাশীল হয়। ধীশক্তি বা বুদ্ধির উন্মেষ হয় না বলিয়া তাহাদের পক্ষে বস্তু বা তত্ত্ব-বিবেক (Act of isolating and differentiating) সম্ভব হয় না। সুতরাং তাহারা জ্ঞান-সম্প্রসারণ কার্যে অংশ গ্রহণেও সমর্থ হয় না। তাহাদের জীবন এবং মৃত্যু উভয়ই নিরর্থক। এই নিরর্থকতার গ্লানি হইতে মুক্ত হইতে হইলে বুদ্ধিকে উন্মেষিত করিবার জন্য সচেষ্ট ও তৎপর হইতে হয়। ইহাই প্রকৃত মনুষ্যত্বের উদ্বোধন। এতদুদ্দেশ্যে শ্রোতাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্যই বলিতেন—"ঋষি মহাপুরুষ যেমন মানুষ, তোমরাও তেমনি মানুষ ইত্যাদি।"

১৯। মনুষ্যত্ব উদ্বোধনের প্রণালী কি তাহা ১৮ অনুচ্ছেদে ব্যক্ত করা হইয়াছে। প্রণালীটি স্বাভাবিক সুতরাং নূতন নহে। কিন্তু "নূতন" এই শব্দ প্রয়োগ করিবার হেতু এই যে আমাদের দেশে স্বাভাবিক জ্ঞান-সম্প্রসারণ বিধির অনুবর্তন না করিয়া তৎস্থলে গুরুবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং উহার ফলে জ্ঞান-সম্প্রসারণ রুদ্ধ হইয়াছিল। সেই জন্য যদিও স্বাভাবিক বিধিকে অনুবর্তন করিতে উপদেশ দিয়াছেন তথাপি উহাকে 'নূতন' বলিয়া অভিহিত করিতেছেন।

২০। মানুষ তাহাকেই বলা যায়, যে এত বলবান যে, তাহাকে বলের অবতার বলা যাইতে পারে, আবার যাহার হৃদয়ে রমনী-সুলভ কোমলতা আছে—তাহাদের দুর্বলতা নহে। তোমাদের চারিদিকে যে কোটী কোটী প্রাণী রহিয়াছে, তাহাদের জন্য যেন তোমাদের হৃদয় কাঁদে অথচ তোমাদিগকে দৃঢ় চিত্ত হইতে হইবে।

২১। কিন্তু আবার এইটি বুঝিতে হইবে যে, স্বাধীন চিন্তা যেমন আবশ্যক, তদ্রুপ আজ্ঞাবহতাও অবশ্যই চাই। আপাততঃ এই দুইটি পরস্পর বিরোধী বোধ হইতে পারে, কিন্তু তোমাদিগকে এই দুইটি আপাতবিরুদ্ধ ধর্ম আশ্রয় করিতে হইবে।

২০। বক্তব্য উপসংহার করিবার পূর্বে কিরূপ মানুষরূপে নিজকে তথা অপরকে গঠন করিতে হইবে তাহাই পুনরায় বলিতেছেন—"মানুষ তাহাকেই বলা যায় ইত্যাদি।" এই সম্বন্ধে পূর্ব পূর্ব অনুচ্ছেদে বিস্তৃত আলোচনা হইয়াছে।

২১। গুরুবাদ (অপরে মত বা নির্দেশের উপর নির্ভরশীলতা) জ্ঞান-সম্প্রসারণের স্বাভাবিক বিধির প্রাথমিক স্তর। এই প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করিবার পর মানুষ চেষ্টা ইত্যাদির সাহায্যে স্বাধীন বা মৌলিক চিন্তা করিবার যোগ্যতা লাভ করে। প্রাথমিক স্তরে গুরুবাদ অবশ্যই আশ্রয়নীয়। গুরুবাদ বিশুদ্ধ অর্থাৎ বিধি-অনুগত হইলে স্বাভাবিকভাবেই শিষ্য দ্বিতীয় স্তরে উন্নীত হইবে ,অর্থাৎ তাহার ধীশক্তি উন্মেষিত হইয়া তাহাকে স্বাধীন বা মৌলিক চিন্তার যোগ্যতা-সম্পন্ন করিবে। এইরূপ হইলে বহু ক্ষেত্রেই শিষ্যের জ্ঞান ও কুশলতা গুরুর জ্ঞান ও কুশলতাকে অতিক্রম করিয়া যাইবে। জ্ঞান-সম্প্রসারণ বিধি বিস্তৃত ভাবে ১৮ অনুচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে।

স্বাভাবিক বিধির এই স্বাভাবিক স্তরকে সমগ্র বিধি বলিয়া গ্রহণ করিলে স্বাভাবিক বিধির ক্রম ভঙ্গ হয় এবং জ্ঞানধারা রুদ্ধ হইয়া যায়। এই অবস্থায় গুরুবাদ ও স্বাভাবিক বিধি পরস্পর বিরোধী হইয়া উঠে। এই তত্ত্ব লক্ষ্য করিয়াই বলিতেছেন—"কিন্তু আবার এইটি বুঝিতে হইবে ইত্যাদি।' এইখানে "আজ্ঞাবহতা" এই শব্দের দ্বারা গুরুবাদ উদ্দিষ্ট হইয়াছে।

২২। যদি অধ্যক্ষগণ নদীতে ঝাঁপ দিয়া কুমীর ধরিতে বলেন, তবে প্রথমে তোমাদিগকে তাঁহার কথামত কাজ করিতে হইবে, তাহার পর তাঁহাদিগকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পার। যদি সেই আদেশ অন্যায়ও হয় তথাপি প্রথমে তাঁহাদের কথানুসারে কার্য কর, তাহার পর প্রতিবাদ করিও।

* * *

স্বামীজির 'জীবনদর্শনে' একতত্ত্ব-অভ্যাসের ইঙ্গিত স্পষ্ট। যোগশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে যোগলাভের অন্তরায় নয়টি। যথা—

১। ব্যধি—শারীরিক ও মানসিক ভেদে ইহা দুই প্রকার। সাধারণতঃ শরীরগত হইলে উহাকে ব্যাধি কহে এবং মনোগত হইলে উহাকে আধি কহে।

২। স্ত্যান—গভীরভাবে কোন বিষয়ে চিন্তা করিবার অপ্রবৃত্তি।

৩। সংশয়—অবলম্বিত উপায় অভীষ্ট-ফলপ্রদ হইতেও পারে, আবার নাও হইতে পারে চিত্তের এইরূপ দ্বৈধভাব।

৪। প্রমাদ—অবহিত হওয়ার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কর্তব্য-বিষয়ে অবহিত না হওয়া।

৫। আলস্য—শরীর ও মনের তামসিক জড়তা, শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম-বিমুখতা।

২২। ধীশক্তি উন্মেষিত হওয়ার ফলে তত্ত্ব-নির্ণয়ের যোগ্যতা আবির্ভূত হয়। ঐরূপ হইলে প্রাথমিক স্তরের আজ্ঞাবহতার (অপরের মত বা নির্দেশের উপর নির্ভরশীলতার) আবশ্যকতা স্বতঃই বিলুপ্ত হয়। কিন্তু তথাপি কোন সমাজ বা প্রতিষ্ঠানভুক্ত হইয়া থাকিলে প্রাথমিক স্তরে স্থিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে আজ্ঞাবহতার অনুষ্ঠান করিতে হয়। প্রাথমিক স্তরে স্থিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে অবশ্য আজ্ঞাবহতা একান্তভাবেই আবশ্যক। এই কারণেই বলিতেছেন—"যদি অধ্যক্ষগণ নদীতে ইত্যাদি।"

৬। অবিরতি—বিষয়ান্তরে রতির অভাব না হওয়া।

৭। ভ্রান্তিদর্শন—অলীক বস্তুকে অভীষ্টরূপে গ্রহণ।

৮। অলব্ধভূমিকত্ব—উন্নততর অবস্থা প্রাপ্তির উপলব্ধির অভাব।

৯। অনবস্থিতত্ব—অলব্ধভূমিকত্বের ফলে জাত চিত্তের অনিবার্য দোদুল্যমানতা।

যোগপ্রসঙ্গে উক্ত হইলেও এইগুলি যে কোন বিষয়ে সাফল্য-লাভের পথে অন্তরায়। এইগুলি বিদূরিত করিবার উপায়ও তদ্রূপ সর্বক্ষেত্রে একরূপ। একতত্ত্ব-অভ্যাসই উপরোক্ত অন্তরায় সমূহের প্রতিষেধের (বিদূরিত করিবার) উপায় বলিয়া যোগশাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। একতত্ত্ব-অভ্যাসের প্রথম ফল মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষার প্রতিষ্ঠা।

মৈত্রী-প্রতিষ্ঠা হইলে যে কোন ব্যক্তির অভ্যুদয়ে প্রাণে স্বতঃই আনন্দ উপস্থিত হয়।

করুণা-প্রতিষ্ঠা হইলে অপরের দুঃখে দুঃখ-বোধ এবং উহা বিদূরিত করিবার চেষ্টা স্বতঃই উপস্থিত হয়।

মুদিতা-প্রতিষ্ঠা হইলে যে কোন ব্যক্তিই সৎকার্য করুক না কেন তাহাতে চিত্ত স্বতঃই হর্ষান্বিত হয়। নিজে ঐরূপ করিতে পারিলাম না বলিয়া কোনরূপ মনঃক্ষোভ উপস্থিত হয় না।

উপেক্ষা-প্রতিষ্ঠা হইলে অসৎকার্য প্রতিরোধে শাক্তিক্ষয় না করিয়া স্বয়ং সৎকার্য অনুষ্ঠান করিবার প্রচেষ্টা হয়।

'জীবনদর্শনে' স্বামীজির প্রদত্ত উপদেশাদি মৌখিক নহে পরন্তু অনুভব-সিদ্ধ। তাঁহার আচরণ বিশ্লেষণ করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে তাঁহার জীবনে মৈত্রাদি চতুঃশীলের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল এবং উহা একতত্ত্ব-অভ্যাসের ফল।

গুরুভ্রাতাগণের, ভক্ত ও শিষ্যগণের এবং স্বদেশী ও বিদেশী পরিচিত এবং অনুরাগী ব্যক্তিগণের মানসিক বা আধ্যাত্মিক উন্নতি হইতেছে দেখিলে তিনি পরম আনন্দিত হইতেন। এই বিষয়ে বহু

ঘটনা এবং উক্তি পূর্বসূরিগণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং সেইগুলির পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। ইহা মৈত্রী-প্রতিষ্ঠার নিদর্শন।

সকল মানুষের সকল প্রকার দুঃখে তিনি দুঃখ বোধ করিতেন। সেবা-কার্য প্রবর্তন তথা জ্ঞান-দানের সাহায্যে মানুষের দুঃখ বিদূরিত করিবার জন্য তাঁহার প্রবল কর্ম-প্রচেষ্টা সকলেরই সুবিদিত। ইহা করুণা-প্রতিষ্ঠার নিদর্শন।

পরিচিত বা অপরিচিত যে কোন ব্যক্তি কোন সৎকার্যের অনুষ্ঠান করিলে তাঁহার হর্ষের অবধি থাকিত না। এই সম্বন্ধে বহু ঘটনা এবং উক্তির উল্লেখও পূর্বসূরিগণ করিয়াছেন। ইহা মুদিতা-প্রতিষ্ঠার নিদর্শন।

সমাজ সংস্কার বিষয়ে মঠের প্রতি তাঁহার নির্দেশ (১২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) উপেক্ষা-প্রতিষ্ঠার নিদর্শন।

'জীবনদর্শনে' অন্য বিশেষ লক্ষ্যণীয় বিষয় হইল একতত্ত্ব-অভ্যাসে অসমর্থ ব্যক্তিদিগের প্রতি 'পরার্থে কর্ম' অনুষ্ঠানের নির্দেশ। এই 'পরার্থে কর্ম' অর্থাৎ অনাসক্ত কর্ম আচরণের ফলে চিত্ত ক্রমশঃ শুদ্ধ হয় এবং একতত্ত্ব-অভ্যাসের সামর্থ্য জন্মে।

এই 'জীবনদর্শন' হইতে অতীতে বহু ব্যক্তি প্রেরণালাভ করিয়া তথা প্রকৃত পথের সন্ধান পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। বর্তমান ও ভবিষ্যতেও শ্রেয়োলাভেচ্ছু ব্যক্তিগণ ইহা হইতে অনুরূপ প্রেরণা-লাভ করিবেন এবং প্রকৃত পথের সন্ধান পাইবেন।

'জীবনদর্শনের' যথা সম্ভব আলোচনা সমাপ্ত হইল। এখন আমরা পুনরায় স্বামীজি মহারাজের জীবনধারা অনুসরণে প্রবৃত্ত হইব।

*   *

*

নয়

॥ দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যদেশে গমণ ॥

প্রধানতঃ চিকিৎসকগণের পরামর্শে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য পাশ্চাত্যদেশে যাওয়ার কথা স্থিরীকৃত হইয়াছিল ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। স্বামীজি মহারাজ দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যদেশে গমণ করেন ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি। ইহাই তাঁহার শেষবারের মত বিদেশ পরিভ্রমণ। শরীর গুরুতররূপে অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও পাশ্চাত্যে আরব্ধকার্য সুপরিচালনার বিষয়ে তিনি সজাগদৃষ্টি রাখিতেছিলেন। এই সময়ের কিছু পূর্বে স্বামীজি মহারাজের নির্দেশক্রমে পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ আমেরিকা হইতে ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া ভারতে কার্য পরিচালনার সহায়তায় নিযুক্ত হন। সুতরাং স্বামী অভেদানন্দ মহারাজকে একাকী অক্লান্ত পরিশ্রমে আমেরিকার সকল কার্য পরিচালনা করিতে হইতেছিল। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের এই গুরুভার লাঘব করিবার জন্য তিনি গুরুভ্রাতা হরি মহারাজকে (স্বামী তুরীয়ানন্দ) আমেরিকায় কার্য-পরিচালনার সহায়করূপে রাখিবেন স্থির করিলেন। এই কারণে এবার পাশ্চাত্য-যাত্রায় হরিমহারাজ তাঁহার সঙ্গী হইবেন এইরূপ ব্যবস্থা হইল। শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতাও তাঁহার বিদ্যালয়ের কার্য-ব্যাপদেশে তাঁহার সঙ্গে ইংলণ্ড যাইবেন এইরূপ স্থির হইল।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুন স্বামীজি মহারাজ, হরি মহারাজ এবং নিবেদিতাকে সঙ্গে লইয়া প্রিন্‌সেপ ঘাট হইতে গোলকুণ্ডা জাহাজ-যোগে ইংলণ্ড যাত্রা করেন। তিনি ঘাটে উপস্থিত হইবার পূর্বেই গুরুভ্রাতাগণ, শিষ্য ও ভক্তগণ এবং অনুরক্ত বহু ব্যক্তি তাঁহাকে

বিদায় জ্ঞাপন করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি গুরুভ্রাতাগণের সহিত সানন্দ ও সাদর সম্ভাষণ বিনিময় করিয়া, এবং উপস্থিত অন্যান্য সকলকে যথাযোগ্য আশীর্বাদ ও অভিবাদন জানাইয়া জাহাজে আরোহণ করিলেন। বিদায়ক্ষণে উপস্থিত সকলের চক্ষুই অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়াছিল। তবুও সমুদ্রভ্রমণে তাঁহার শরীর সুস্থ হইয়া উঠিতে পারে এই আশায় সকলে কথঞ্চিত সান্তনা লাভ করিয়াছিলেন।

চিকিৎসকগণ আশা করিয়াছিলেন দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রায় স্বামীজির পর্যাপ্ত বিশ্রাম লাভ সম্ভব হইবে, কিন্তু কার্যতঃ ঐ আশা সম্পূর্ণ সফল হয় নাই। যাত্রাপথে জাহাজ যে সকল বন্দরে অপেক্ষা করিয়াছিল তাহার অধিকাংশ স্থানেই তিনি জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া তত্রত্য অনুরাগী এবং ভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়া বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা এবং উপদেশদান করিয়াছিলেন। ইহাতে অবশ্যই তাঁহার বিশ্রামের ব্যাঘাত হইয়াছিল। তথাপি দীর্ঘ ছয়মাস সমুদ্রভ্রমণের অধিকাংশকাল বিশ্রামলাভে বাধ্য হওয়ার ফলে তাঁহার শরীর অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া উঠিয়াছিল।

লণ্ডনে পৌঁছিয়াই তিনি তাঁহার পূর্বপরিচিত বিভিন্ন ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তথায় তাঁহার আগমনবার্তা সংবাদপত্রে প্রচারিত হইবার পর বহু ব্যক্তি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন ও আলোচনার সাহায্যে নিজ নিজ সংশয়ের নিরসন করিয়া লইতে লাগিলেন। তাঁহার স্বাস্থ্যের জন্য একান্ত আবশ্যক বিশ্রাম এইভাবে ব্যাহত হইতে লাগিলেও তিনি তাহা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া অপরের মঙ্গল ও কল্যাণ-সাধনে আত্মনিয়োগ করিলেন। এইবারে তিনি বক্তৃতা যথাসম্ভব পরিহার করিয়া প্রধানতঃ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তত্ত্ব-প্রচারে যত্নবান হইয়াছিলেন।

স্বামীজির দৃঢ় ধারণা ছিল যে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী ব্যতীত কেহই সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে মানবসাধারণের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ-সাধনে

সমর্থ হয় না। সেইজন্যই তিনি কি ভারতে, কি পাশ্চাত্যে, সর্বত্রই পবিত্রতা-মণ্ডিত ব্রহ্মচর্য-ব্রতধারী 'জ্বলন্ত পাবক সদৃশ' জন-কল্যাণে উৎসর্গীকৃত সন্ন্যাসীদল গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন। এইরূপ মানুষ গঠনের জন্য তিনি ভারতে বিরাম-বিহীন কঠোর পরিশ্রম করিয়াছিলেন। এখন পাশ্চাত্যেও অনুরূপ কর্মি-গঠন করিবার জন্য অবিরাম পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। তাঁহার পরিশ্রমের সুফল ফলিতে বিলম্ব হইল না। ইপ্সিত কর্মিদল ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতে লাগিল।

এইরূপে ইংলণ্ডের কার্য অপেক্ষাকৃত দৃঢ়মূল করিয়া তিনি তথা হইতে আমেরিকা যাত্রা করিলেন। আমেরিকা পৌঁছাইবার পূর্বেই তাঁহার আগমন-সংবাদ তথায় প্রচারিত হইয়াছিল। ফলে নিউইয়র্কে উপস্থিত হইবামাত্র বহু শিষ্য, ভক্ত এবং গুণগ্রাহী ব্যক্তি তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। স্বামীজি মহারাজ এবার প্রকাশ্য সভায় খুব বেশী বক্তৃতা না করিয়া আলোচনা এবং প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুদিগের আকাঙ্খা চরিতার্থ করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ডের ন্যায় এখানেও শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি পুরাতন বন্ধু, শিষ্য ও নবাগত ব্যক্তিগণের নানা সংশয় বিদূরিত করিয়া ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্বসকল প্রাঞ্জল-ভাষায় বুঝাইয়াদিতে তিনি কখনও এতটুকু বিরক্তি বোধ করিতেন না। এইরূপে অনুরক্ত শিষ্য-মণ্ডলীর সহিত এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সহিত আলোচনায় রত থাকিয়া তিনি নিউইয়র্ক, বোষ্টন, ডেট্রয়েট, ব্রুক্‌লীন প্রভৃতি নগর ভ্রমণান্তে কালিফোর্নিয়ার পথে চিকাগো সহরে অবতরণ করিয়া তথাকার সকলের আনন্দ-বর্ধন করিয়া-ছিলেন। কালিফোর্নিয়াতে তিনি কয়েক মাস অবস্থান করিয়া তথাকার বিভিন্ন সহরে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি তথাকার প্রধান সহর লস্‌এঞ্জেলসে উপস্থিত হইলে সেখানকার অধিবাসী-দিগের মধ্যে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। এখানকার

বিশিষ্ট নাগরিকগণের অনুরোধে তিনি কয়েকটি সাধারণ সভায় বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। এই সংবাদ প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন স্থান হইতে তাঁহার উপস্থিতির জন্য অনুরোধপত্র আসিতে লাগিল। প্রথম বার পাশ্চাত্যদেশে তাঁহার প্রচারকার্যে কেহ কেহ বিরুদ্ধাচারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এবার আর কোন প্রতিবাদ বা বিরুদ্ধাচারণ হয় নাই। বরং খৃষ্টান ধর্ম-যাজকগণও সাগ্রহে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া গির্জার মধ্যেই বক্তৃতার স্থান করিয়া দিয়া বক্তৃতার পর বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

প্রথম বারের ন্যায় এবারেও তাঁহার প্রচার, প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাইতেছিল। কালিফোর্নিয়ার রাজধানী সান্‌ফ্রান্‌সিস্কোর বক্তৃতায় সহস্র সহস্র ব্যক্তি উপস্থিত থাকিতেন এবং প্রতিদিন শত শত ব্যক্তি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিত। তথাকার এক শিষ্য তাঁহাকে বেদান্ত আশ্রম স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ১৬০ একর জমি দান করিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বারা উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত গুরুভ্রাতা স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজের চেষ্টায় ঐ ভূমিখণ্ডের উপর স্থায়ী কেন্দ্র গড়িয়া উঠে এবং উহাই "শান্তি আশ্রম" নামে পরিচিত হইয়া আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারের অন্যতম প্রধান-কেন্দ্রে পরিণত হয়। স্বামী অভেদানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের এই দুই দিক্‌পাল তখন পাশ্চাত্যের বিভিন্ন স্থানে বেদান্তাদি প্রচার ও স্থায়ী প্রতিষ্ঠানাদি গঠন করিরা কৃতিত্ব অর্জন করেন। স্বামীজি মহারাজ বিভিন্ন স্থানে স্থায়ী কর্মি-গঠনে ও কেন্দ্র-প্রতিষ্ঠায় বেশী উদ্‌যোগী হইয়াছিলেন। বিভিন্ন সহরে তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিলেও সকল স্থানে তিনি যাইতে পারেন নাই এবং বক্তৃতাও করিতে সমর্থ হন নাই। তবুও অন্ততঃ পঁচিশ ত্রিশটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় ঐ সকল বক্তৃতার কোন অনুলিপি রাখা সম্ভব হয় নাই।

এইরূপে তিনি আমেরিকা-ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া ইংলণ্ডের পথে ভারত-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে লণ্ডন, প্যারী, ভিয়েনা, কনষ্টান্টিনোপল্, এথেন্স, কাইরো প্রভৃতি নগরে যাত্রাভঙ্গ করিয়া তত্রত্য পূর্বপরিচিত এবং নবাগত বহু ব্যক্তির সহিত ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। এইভাবে প্রায় দেড় বৎসর পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ, বক্তৃতা ও উপদেশ-দান এবং তত্ত্ব-প্রচার সমাপনান্তে তিনি কাইরো হইতে ভারত অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

তৎপরে পূর্বে কোনরূপ সংবাদ প্রদান না করিয়াই ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর রাত্রিকালে তিনি বেলুড় মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মঠবাসীগণ তখন নৈশ আহারে ব্যাপৃত। মঠের দ্বার রুদ্ধ। দ্বার খুলিয়া দিবার অপেক্ষা না করিয়া স্বামীজি প্রাচীর উল্লঙ্ঘন-পূর্বক একেবারে আহারের স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার এই অপ্রত্যাশিত উপস্থিতিতে সকলেই মুহূর্তকাল বিস্ময়াভিভূত থাকিয়া পরমুহূর্তেই আনন্দে হর্ষ-ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। তিনিও সকলকে যথাযোগ্য সম্ভাষণাদি করিয়া আনন্দ-উল্লাসের মধ্যে সকলের সহিত একযোগে আহারে প্রবৃত্ত হইলেন

দীর্ঘ বিরহের পর অপ্রত্যাশিতভাবে প্রিয়-সম্মিলন হইলে মনে যেরূপ আবেগ ও উত্তেজনা উপস্থিত হয়, স্বামীজির অপ্রত্যাশিত প্রত্যাবর্তনে মঠবাসীগণের মনও সেইরূপ আবেগ ও উত্তেজনায় দুলিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার পথশ্রান্তি লক্ষ্য করিয়া মঠবাসীগণ তাঁহাদের দুর্দম আসঙ্গলিপ্সা দমন করিয়া তাঁহার বিশ্রামের ব্যবস্থা করিলেন এবং পরদিবস প্রাতেই তাঁহার সঙ্গলাভ করিবার অধীর আগ্রহ লইয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইলেন।

*　　*

*

দশ

॥ দীপ-নির্বাণ ॥

অধীর আগ্রহে রাত্রি অতিবাহিত করিয়া পরদিন প্রত্যূষেই মঠবাসী সকলে স্বামীজির নিকট সমবেত হইলেন এবং যথাযোগ্য অভিবাদনাদি করিলেন। স্বামীজি পূর্বের ন্যায়ই সহাস্যবদনে সকলের সহিত কথা বলিতে লাগিলেন কিন্তু সকলেই সবিস্ময়ে অনুভব করিলেন যে স্বামীজির মধ্যে যেন গুরুতর কোন পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে। যখন তিনি মঠ হইতে পাশ্চাত্যদেশে গিয়াছিলেন তখন তিনি কর্ম-উন্মাদনায় চঞ্চল, সুতরাং মঠবাসীদিগের পক্ষে সুবোধ্য ছিলেন। আর এখন সকলের মনে হইতে লাগিল যে সহাস্য হইলেও তিনি যেন প্রশান্ত, গম্ভীর ও অন্তঃস্মিত ; দৃষ্টি যেন তাঁহার স্ব-অন্তর-অবগাহী ; তাঁহার যে প্রবল শক্তি বহির্মুখে প্রধাবিত হইয়া তাঁহার-সংস্পর্শে-আসা প্রত্যেক মানুষকে অল্পাধিক অভিভূত করিত, তাহা যেন প্রত্যাহৃত হইয়া কোন অব্যক্ত কেন্দ্রে সমাহৃত হইয়াছে। সুতরাং নিকটে আসিয়াও তিনি যেন বহুদূরে চলিয়া গিয়াছেন, মঠবাসীদিগের পক্ষে দুর্বোধ্য হইয়াছেন। সকলে আরও অনুভব করিলেন যে তাঁহার 'জন-সংসদে অরতি' এবং 'বিবিক্ত-দেশ-সেবার আকাঙ্খা' তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছে। কোনপ্রকার কোলাহল বা আন্দোলন যেন তিনি সহ্য করিতে পারিতেছেন না। সকলেই তাঁহার এই অদৃষ্টপূর্ব ভাবকে সমীহ করিয়া সন্ত্রস্তভাবে চলা-ফেলা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেহই বুঝিলেন না যে সূর্যের প্রখর রশ্মিসমূহের উপসংহরণ

তাহার অস্তাচল-গমনের পূর্বাভাস; বহিঃ এবং অন্তর উভয়মুখে অত্যধিক প্রজ্বলনের ফলে জীবন-বর্তিকা নিঃশেষিত-প্রায়।

যাহা হউক কয়েকদিন মাত্র মঠে বিশ্রাম করিয়াই স্বামীজি হিমালয়ের নিভৃত প্রদেশে অবস্থিত আলমোড়ার অদ্বৈত আশ্রমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। এখানে অবস্থানকালে তিনি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা 'প্রবুদ্ধ ভারতের' জন্য কয়েকটি মূল্যবান সন্দর্ভ রচনা করেন। স্থানটি তাঁহার তৎকালীন মানসিক অবস্থার পক্ষে বিশেষ অনুকূল ছিল। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা বৃদ্ধি হওয়ায় তাঁহার পক্ষে বেশীদিন তথায় অবস্থান করা সম্ভব হইল না। জানুয়ারী মাসেই তিনি মঠে ফিরিয়া আসিলেন।

মঠে ফিরিয়া আসিলে গুরুভ্রাতাগণ তাঁহার যথোচিত চিকিৎসা এবং শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিলেন। তিনি তাহাদের কার্যে কোন বাধাও দিলেন না, আবার উদ্যোগী হইয়া তাঁহার সম্বন্ধে করণীয় বা অকরণীয় কোন বিষয়েই ইঙ্গিত-মাত্রও প্রদান করিলেন না। পূর্বে তিনি ছিলেন মঠের প্রাণ-পুরুষ, সর্বকর্মের উৎস। আর এখন তিনি যেন হইয়া পড়িলেন নির্লিপ্ত অতিথি। সকলের মধ্যে থাকিয়াও তিনি হইয়া পড়িলেন একাকী। তাঁহার তৎকালীন নির্লিপ্ততা ও একাকীত্ব সম্পূর্ণ ভিন্ন-প্রকৃতির। মনোময় কোষে সংঘটিত বলিয়া এই নির্লিপ্ততা ও একাকীত্বের কোনও ঘোষণা বা বহিরাড়ম্বর ছিল না। মঠের কর্ম পরিচালনাবিষয়ে বা অন্য যে কোনও বিষয়ে তাঁহার সহিত আলোচনা করিতে আসিলে তিনি যেমন সাগ্রহে তদ্বিষয়ে আলোচনা করিয়া স্বসিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিতেন, তদ্রূপ তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া কেহ তাঁহার নিকট আসিলে তিনি সমান আগ্রহে তাহার সহিত তদ্বিষয়ে আলোচনা করিতেন এবং উপদেশাদি প্রদান করিতেন। প্রসঙ্গ সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই মন যেন নিস্তরঙ্গ সরসীর রূপ ধারণ করিত। কোন প্রসঙ্গেরই অনুশয় (জের) থাকিত না।

এই সময় প্রত্যহ শত শত ব্যক্তি তাঁহার দর্শনাকাঙ্খী হইয়া উপস্থিত হইতেন। তিনি স্মিতহাস্যে সকলকেই স্বাগত জানাইতেন এবং শারীরিক অসুস্থতা ভুলিয়া বিবিধ বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। আলোচনাকালে তাঁহার রোগ-পাণ্ডুর মুখমণ্ডল অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। অপলক দৃষ্টি নিবদ্ধ হইত কখনও দূরে, কখনও বা উপস্থিত কোন শ্রোতার দিকে। কিন্তু শ্রোতাগণ অনুভব করিতেন যেন সে দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিয়াছে তাঁহার অন্তর্লোকে। এইরূপভাবে তিনি কখনও প্রশান্ত কখনও বা উদ্দীপ্ত-কণ্ঠে ধর্ম, দর্শন, রাষ্ট্র প্রভৃতি বিষয়ে অনর্গল বলিয়া যাইতেন। শ্রোতাগণের মনে হইত যেন অন্তরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তিনি নিজেই নিজকে এইসব কথা বলিয়া যাইতেছেন। শ্রোতাগণ নিঃশব্দে তাঁহার দিকে নিবদ্ধ-দৃষ্টি হইয়া বসিয়া থাকিতেন এবং অল্প-বিস্তর অভিভূত হইয়া পড়িতেন। অনেকেরই জীবনের গতি পরিবর্তিত হইয়া যাইত।

এই সময় শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহস্থ শিষ্য ভক্তপ্রবর সাধু নাগমহাশয় স্বামীজিকে দর্শন করিবার জন্য মঠে আগমন করেন। কথা-প্রসঙ্গে স্বামীজি নাগমহাশয়ের জন্মভূমি (ঢাকা জেলার দেওভোগ গ্রাম) দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। "তা যদি হয়, (আমার) দেশ কাশী হয়ে যাবে" এই কথা বলিয়া নাগমহাশয় স্বামীজিকে সাদর আমন্ত্রণ জানান।

ইতিপূর্বে ঢাকা সহরের কতিপয় ভক্ত স্বামীজির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে ঢাকায় যাইবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছিলেন। সুতরাং নাগমহাশয় ফিরিয়া যাইবার কিছু পরেই ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ স্বামীজি পূর্ববঙ্গে রওয়ানা হইয়া গেলেন, সঙ্গে রহিলেন কয়েকজন গুরুভ্রাতা ও শিষ্য।

ষ্টীমার যোগে তিনি নারায়ণগঞ্জে উপস্থিত হইলে ঢাকার অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যবৃন্দ তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন

করিয়া মাল্যভূষিত করিলেন এবং ট্রেনযোগে ঢাকা সহরে লইয়া গেলেন। ঢাকা ষ্টেশনে পৌঁছিলে বিরাট জনতা জয়ধ্বনি করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল এবং শোভাযাত্রা-সহকারে তাঁহাকে শ্রীযুত মোহিনীমোহন দাসগুপ্ত মহাশয়ের বাড়িতে লইয়া যাওয়া হইল। কয়েকদিন তথায় অবস্থান করিয়া তিনি ভক্ত, অনুরাগী ও নবাগত বহু ব্যক্তির সহিত নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করিলেন। পরে নারায়ণগঞ্জের নিকটবর্ত্তী নাঙ্গলবন্দে বুধাষ্টমী উপলক্ষে স্নানযাত্রা এবং মেলা দর্শন করিয়া পুনরায় ঢাকা সহরে ফিরিয়া আসিলেন। ৩০শে মার্চ 'জগন্নাথ হলে' এবং তৎপর দিবস 'পগোজ' স্কুল প্রাঙ্গণে আহুত জনসভায় তিনি দুইটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

ঢাকা হইতে তিনি দেওভোগ গমন করেন কিন্তু দুঃখের বিষয় তৎপূর্ব্বেই সাধু নাগমহাশয় ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন। স্বামীজি তাঁহার গৃহে আসিলে যাহাতে তাঁহার কোন অসুবিধা না হয় সেজন্য নাগমহাশয় পুকুরের ঘাট তৈয়ারী করিয়াছিলেন এবং স্বামীজির শয়ন ও বিশ্রামের জন্য বিশেষ ব্যবস্থাদি করিয়াছিলেন। স্বামীজি পরম শ্রদ্ধাসহকারে নাগমহাশয় নির্ম্মিত পুকুর-ঘাটে স্নান করেন এবং আহারান্তে তাঁহার ব্যবস্থিত স্থানে শয়ন করিয়া বিশ্রাম গ্রহণ করেন। বিশ্রামান্তে তিনি পুনরায় ঢাকা সহরে ফিরিয়া আসিলেন।

ঢাকা হইতে স্বামীজি কামাখ্যা গমন করেন এবং তথা হইতে গৌহাটি আসিয়া কয়েক দিবস বিশ্রাম গ্রহণ করেন। গৌহাটিতেও তিনি কয়েকটি বক্তৃতা প্রদান করেন। এই সময়ে তাঁহার স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি হওয়ায় চিকিৎসকের উপদেশে সম্পূর্ণ বিশ্রাম লইবার জন্য তিনি শিলং গমন করেন। কিন্তু শিলংএ উপযুক্ত চিকিৎসকের ব্যবস্থাধীন থাকা সত্ত্বেও তাঁহার শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ভক্ত ও অনুরাগীবৃন্দ সকলেই বিশেষ

উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। অবশেষে কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলে তিনি শিলং হইতে বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসিলেন।

এবার ডাক্তারের নির্দেশক্রমে তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হইল এবং কিছু দিনের মধ্যেই তিনি অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

ঐ সময়ে জাপানের দুইজন বিশিষ্ট মনীষী রেঃ ওটা এবং ডাঃ ওকাকুরা মঠে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার সহিত আলাপ-আলোচনা করেন। তাঁহারা স্বামীজিকে জাপানে যাইবার জন্য বিশেষ ভাবে আমন্ত্রণ জানান। স্বামীজিও সানন্দে তাঁহাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন।

কথাপ্রসঙ্গে রেঃ ওটা এবং ডাঃ ওকাকুরা বুদ্ধগয়া দর্শন করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। বুদ্ধগয়ার নামোল্লেখে স্বামীজি সজাগ হইয়া উঠিলেন। প্রথম জীবনের গুরুতর এক সন্ধিক্ষণে বুদ্ধগয়ার বোধিদ্রুমমূলে ধ্যানমগ্ন হইয়াই তিনি আপন কর্তব্যপথ নির্ণয় করিয়া লইয়াছিলেন। ঐ কর্তব্যপথ ছিল মানব-কল্যাণে আত্মনিয়োগ। যথাসাধ্য কর্তব্য-সম্পাদনের ফলে বোধ হয় এইকালে তাঁহার জীবনের দ্বিতীয় গুরুতর সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হইয়াছিল। সুতরাং পথনির্ণয়ের আবশ্যকতা দেখা দিয়াছিল। বুদ্ধগয়ার নামোল্লেখের মধ্যে যেন তিনি অদৃশ্য হস্তের ইঙ্গিত দেখিতে পাইলেন। পুনরায় বোধিদ্রুমমূলে ধ্যানস্থ হইবার আকর্ষণ তীব্র হইয়া উঠিল। সুতরাং শারীরিক অসুস্থতা অগ্রাহ্য করিয়া তিনি এই দুইজন জাপানী মনীষীর সঙ্গে বুদ্ধগয়া যাত্রা করিলেন ১৯০২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে।

বুদ্ধগয়ায় তিনি কয়েক দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। সেখানকার শান্ত পরিবেশে বোধিদ্রুমতলে আসন গ্রহণ করিয়া তিনি অনেক সময় আত্মচিন্তায় মগ্ন হইয়া থাকিতেন। মনে মহাসত্যের আভাস আসিয়া পড়িতেছে, তীব্রভাবে উহার আকর্ষণ অনুভূত হইতেছে

অথচ যেন কোন অন্তরাল বর্তমান থাকায় উহার সহিত একাত্মতা সম্ভব হইতেছে না। সাধকের এই অবস্থা সত্যই অসহনীয় হইয়া উঠে। সমস্ত প্রাণশক্তি একত্রিত করিয়া প্রচণ্ডবলে এই অন্তরাল ভেদ করিবার চেষ্টা উপস্থিত হয়। বুদ্ধগয়া যাওয়ার আকর্ষণ ও বোধিদ্রুমতলে আত্মচিন্তায় মগ্ন হওয়ার মূলে ছিল এই হেতু।

কয়েক দিন বুদ্ধগয়ায় অতিবাহিত করিয়া তিনি কাশী যাত্রা করিলেন। ধ্যান-ধারণায় এবং আলাপ-আলোচনায় রত থাকিয়া প্রায় একমাসকাল তিনি তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন। কাশীর জলবায়ুর গুণে তাঁহার শরীরও কতকটা সুস্থ হইয়া উঠিয়াছিল।

ফেব্রুয়ারীর শেষভাগে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম-উৎসবের পূর্বে তিনি মঠে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু মঠে ফিরিবার পরই তাঁহার অসুস্থতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল এবং তিনি শয্যাশায়ী হইতে বাধ্য হইলেন। চিকিৎসকগণের পরামর্শে গুরুভ্রাতাগণ তাঁহার একান্ত বিশ্রামের জন্য কঠোর নিয়মাদির প্রবর্তন করিলেন। বাহিরের কোন ব্যক্তির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার বন্ধ হইল। তিনি গুরু-ভ্রাতাদের কোন কার্যেই বাধা দিলেন না, কিন্তু জিজ্ঞাসুদিগের সহিত সাক্ষাৎ এবং আলোচনা করিতে না পারায় তিনি অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে এইরূপে বিবিক্ত হইতে বাধ্য হওয়ায় তাঁহার মন আরও অন্তর্মুখী হইয়া উঠিল। এইরূপে প্রায় চারিমাস কাটিয়া গেল। জুন মাসের শেষে তিনি যেন অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

কয়েক মাস যাবৎ তিনি এক প্রকোষ্ঠে নিবদ্ধ ছিলেন। এখন বাহিরে চলাফেরা করিতে পারায় তাঁহার আনন্দের অবধি রহিল না। তিনি যেন বালকবৎ প্রফুল্ল হইয়া উঠিলেন। তিনি মঠবাসী সকলের সহিত লঘু হাস্য-পরিহাস করিতে লাগিলেন এবং মিশনের নানা কার্যে অল্প-বিস্তর অংশ লইবার আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মঠবাসী সকলেই তাঁহার এই পরিবর্তনে বিশেষ উৎফুল্ল এবং তাঁহার

আরোগ্য-বিষয়ে আশান্বিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু কেহই বুঝিলেন না যে তাঁহার এই উন্নতি নিভিবার পূর্বে দীপের অস্বাভাবিক প্রজ্বলন মাত্র।

গুরুতর অসুস্থ হইয়া পড়িবার পর হইতেই তাঁহার আহারের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। তাঁহার প্রকোষ্ঠেই তিনি আহার করিতেন। কিন্তু ৪ঠা জুলাই (১৯০২) তিনি তাঁহার এই একান্তে আহারের ব্যবস্থা বাতিল্ করিয়া দিয়া সকলের সহিত একত্রে বসিয়া হাস্য-পরিহাসের মধ্যে মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপ্ত করিলেন।

অপরাহ্নে বেড়াইতে বেড়াইতে তিনি বেলুড় বাজার পর্যন্ত গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া সন্ধ্যায় মঠবাসী সকলের সহিত সস্নেহে কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে মঠবাসী সকলে তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া নিজের নিজের যায়গায় ফিরিয়া গেলেন। প্রকোষ্ঠে রহিলেন স্বামীজি এবং তাঁহার শুশ্রূষাকারী একজন ব্রহ্মচারী। রাত্রি ক্রমে গভীর হইতে লাগিল। স্বামীজি তখন ঐ ব্রহ্মচারীকে প্রকোষ্ঠের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বাহিরে যাইয়া স্বস্থানে বিশ্রাম করিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। নির্জন প্রকোষ্ঠে রহিলেন একা স্বামীজি।

অমবস্যার রাত্রি। চারিদিক গভীর অন্ধকারে আবৃত। আষাঢ়ের আকাশ গাঢ় মেঘে আচ্ছন্ন। মঠভূমির উপর গভীর নিঃশব্দতা নামিয়া আসিয়াছে। বাতাসও যেন বহিতেছে না। স্বামীজির শ্বাসকষ্ট হঠাৎ বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু তিনি শুশ্রূষাকারী ব্রহ্মচারীকে বা সুষুপ্ত মঠবাসী কাহাকেও আহ্বান করিলেন না।

চরাচর যেন সুষুপ্তিমগ্ন। ঝিল্লিরব ব্যতীত অন্য কোন শব্দই শ্রুতি-গোচর হইতেছে না। অন্ধকার এবং নিঃশব্দতা যেন জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। সমগ্র প্রকৃতি যেন রুদ্ধশ্বাসে স্তব্ধ হইয়া কোনও অভাবনীয় ঘটনার প্রতীক্ষা করিতেছে। এই শ্বাসরোধকারী নিস্তব্ধতার মধ্যে লোকচক্ষুর অন্তরালে বিবেকদীপ নির্বাপিত হইল। সাক্ষী রহিলেন শুধু মহাপ্রকৃতি। তাঁহার স্তব্ধ প্রতীক্ষার অবসান

হইল, অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। আষাঢ়ের স্তব্ধ গাঢ় মেঘপুঞ্জ হইতে মৃদু বর্ষণ আরম্ভ হইল।

যে বিবেক-দীপ সহস্র সহস্র ব্যক্তির অন্তরে দীপ প্রজ্বালিত করিয়া তাহার আলোকে সত্যের পথ আবিষ্কার করিয়া সর্ব-মানবের কল্যাণ সাধন করিবার জন্য নিয়োজিত হইয়াছিল, সকল মানবের চক্ষুর অন্তরালে চরম একাকীত্বের মধ্যে সেই দীপ নির্বাপিত হইল।

পরদিবস যখন তাঁহার মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হইল, তখন ভক্ত ও পরিচিত, এমন কি যাহারা তাঁহার নাম মাত্র শুনিয়াছে তাহাদেরও মনে অব্যক্ত হাহাকার ধ্বনিয়া উঠিল—"কেন নিভে গেল দীপ ?"

যে দীপ গতানুগতিকতার অন্ধকার বক্ষের উপর আলোকের বিক্ষোভ সৃষ্টি করিয়াছিল, সেই দীপ নিভিয়া গেল।

আজ তাঁহার শততম জন্মতিথিতে কেবলই মনে হইতেছে—যে দীপ তিনি সকলের অন্তরে প্রজ্বালিত করিতে চাহিয়াছিলেন, সেই দীপ কি আমরা সত্যই চাই ?

* *

*

"ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥"

"ভগবৎ সমীপে প্রার্থনা করি, আমার ভেতর যে আগুন জ্বলছে তা তোমাদের ভেতরে জ্বলে উঠুক। তোমাদের মন মুখ এক হোক—ভাবের ঘরে চুরি যেন একদম না থাকে, তোমরা যেন জগতের যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মত ম'র্‌তে পার—ইহাই সদা-সর্বদা বিবেকানন্দের প্রার্থনা।"